Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 9/11



আরব্য রজনীর নতুন অধ্যায়

সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ

INKLIGHT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আরব্য রজনীর নতুন অধ্যায়

সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ

অনুবাদ : চিরকুট টিম


INKLIGHT

আরব্য রজনীর নতুন অধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ২০২০

ISBN: 978-984-0309-64-1

মূল : সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ

অনুবাদ : চিরকুট টিম

facebook.com/ExileNotes0

প্রকাশক : ইঙ্কলাইট

facebook.com/inklight.edu



Arabba Rajanir Natun Oddhay based on the book 'Inside Al-Qaeda and the Taliban : Beyond Bin Laden and 9/11' by Sayed Saleem Shahzad, published by INKLIGHT, Dhaka Bangladesh. First edition, March 2020.

উৎসর্গ

৩ : ১৪৬

সূচিপত্র

আরব্য রজনীর নতুন অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নির্ভীক সত্যান্বেষী

সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ। জন্ম করাচিতে, ১৯৭০ সালের ৩রা নভেম্বর। করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে International Relation - এর ওপর মাস্টার্স করেন। তাঁর পেশা এবং নেশা ছিল সাংবাদিকতা। সফল হয়েছিলেন; কাজ করেছিলেন এশিয়া আর ইউরোপের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায়। এছাড়াও হংকংভিত্তিক এশিয়া টাইমস অনলাইনের পাকিস্তান ব্যুরো চিফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ছিল রাজনীতি এবং যুদ্ধের রহস্যঘেরা, ঝুঁকিপূর্ণ জগত। বৈশ্বিক নিরাপত্তা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইসলামি আন্দোলন, ইরাক এবং লেবাননের সশস্ত্র সংগঠনসহ লিখেছেন আরও বিভিন্ন বিষয়ে। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের বিষয় ছিল সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া মুসলিম সংগঠনগুলো, বিশেষ করে 'আল-কায়েদা' আর 'তালেবান' নিয়ে তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। সংবাদ সংগ্রহ আর গবেষণার জন্য তিনি দীর্ঘ ভ্রমণ করেছেন মধ্যএশিয়া, এশিয়া আর ইউরোপে। এই ব্যাপারে তিনি কাজ করেছেন পুরোপুরি গবেষণামূলক, নির্মোহ, বিশ্লেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে; যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য - উভয়তেই অত্যন্ত দুর্লভ।

তাঁর লিখা বক্ষ্যমাণ এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল Inside Al-Qaeda and the Taliban : Beyond Bin Laden and 9/11 নামে, তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস আগে। ২০১১ সালের মে মাসে উসামা বিন লাদেনকে অ্যাবোটাবাদ অপারেশনে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনার পর সশস্ত্র যোদ্ধারা হামলা চালায় পাকিস্তানের বিখ্যাত মেহরান এয়ারবেইসে। ধ্বংস করে দেয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিমান। সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ একটি কলামে এই হামলার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এবং প্রকাশ করেন যে এই হামলা পরিচালনা করেছে আল-কায়েদার মিলিটারি কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরির নেতৃত্বাধীন '৩১৩ বিগ্রেড'। সেলিম শেহজাদ দাবি করেন যে গ্রুপটি পাকিস্তান নেভির কিছু সেনার সহযোগিতায় এই হামলা চালিয়েছিল। তাঁর সেই কলামটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁকে ইসলামাবাদ থেকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI [1] তুলে নিয়ে যায়। দুই দিন পর ৩১ মে, মান্ডি বাহাউদ্দিন জেলার একটি ড্রেনে তাঁর বিধ্বস্ত লাশ পাওয়া যায়।

---

1. পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা Directorate for Inter-Services Intelligence; যার সাধারণ পরিচিতি হয়েছে Inter-Services Intelligence বা ISI নামে।

সাইয়্যেদ সেলিম শেহজাদ মৃত্যুর আগে ISI-এর কাছ থেকে তিনবার হুমকি পেয়েছিলেন। তখন ভগ্নিপতি আর বেশ কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুকে ব্যাপারটি জানিয়েও ছিলেন। এছাড়া বেশ কয়েকবার তাঁকে ISI-এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এর আগে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে সাবেক তালেবান কমান্ডার মোল্লা গণি বারাদারকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রেপ্তারির পর তাঁর ব্যাপারে সাইয়্যেদ সেলিম একটি কলাম লেখার কারণে ISI-এর হেড কোয়ার্টারে তাঁকে তলব করা হয়। তখন তিনি মানবাধিকার সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ISI তাঁকে গুপ্তহত্যা করে ফেলতে পারে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর কর্মকর্তা আলি হাসান বলেছিলেন, "সেলিম শেহজাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দ্রুতই তাঁর সাথে কিছু একটি ঘটতে যাচ্ছে!"

তাঁর মৃত্যুর পর সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে পীড়াপীড়ির ফলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানি হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন, যারা আদৌ কোনো সন্তোষজনক ফলাফল পেশ করতে পারেনি।

সেলিম শেহজাদ ছিলেন একজন সত্যিকারের অনুসন্ধানী সাংবাদিক। আজকের হলুদ সাংবাদিকতায় অভ্যস্ত পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে সেলিম শেহজাদ রহস্যের একেকটি স্তর খুলে খুলে সত্যকে উন্মোচন করেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন পাঠকের সামনে। আর সত্যের মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। একজন সাংবাদিকের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ যতটুকু করা যায়, তিনি তা করেছেন।

কিন্তু কী ছিল সেলিম শেহজাদের অনুসন্ধানে? কেমন বিস্ফোরক তথ্যের কারণে ISI তাঁকে হত্যা করতে পাগল হয়ে উঠেছিল? বইটিতে আলোচিত হবে অবিশ্বাস্য সেই কাহিনী, যা অনায়াসে হার মানায় আরব্য রজনীর গল্পকেও।

অনুবাদের গল্প

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

নাহমাদুহূ ওয়া নুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম।

আম্মাবা’দ।

২০১৯ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়। ফেইসবুকে স্ক্রল করতে করতে কীভাবে যেন একটি পেইজের সন্ধান পাই, নাম ‘নির্বাসনের চিরকুট’। ফেইসবুকে আগে থেকেই বিশেষভাবে যাদের ফলো করতাম, তাঁদের কয়েকজনের লাইক পেইজটির প্রতি আমাকে আগ্রহী করে তোলে। পেইজটিতে একটি ধারাবাহিক সিরিজ এগারো পর্বে এসে থেমে গেছে, তাও প্রায় বছর খানেক আগে। সর্বশেষ পোস্টের কমেন্ট সেকশনে অধিকাংশ কমেন্টই ছিল এক ধরনের আকুতি মিশ্রিত। ‘ভাই পরবর্তী পর্ব কবে আসবে?’... এই জাতীয়। একদম শুরু থেকেই পড়া শুরু করলাম এবং বলা বাহুল্য যে, প্রতিটি পর্ব পড়ছিলাম আর পুরো সত্ত্বা জুড়ে এক অনির্বচনীয় পুলক ও শিহরণ খেলে যাচ্ছিল। বিষয়টি শেয়ার করলাম একজন সহপাঠী ও বড় ভাইয়ের সঙ্গে। তারাও পড়লেন, আর তাদেরও ঠিক একই অনুভূতি হলো। এদিকে পেইজের অনূদিত অংশটুকু পড়ার পর পুরো ঘটনার প্রতি আমার আগ্রহ শতগুণ বেড়ে গেল। অনুবাদক যদিও তাঁর লেখার কোথাও মূল বইয়ের নাম উল্লেখ করেননি, তবে মূল বইয়ের লেখকের নাম এবং তাঁর একটা সুন্দর পরিচিতি লেখার শুরুতেই তুলে ধরেছিলেন ‘নির্ভীক সত্যান্বেষী’ নামে। সেই সূত্র ধরেই অনলাইনে খোঁজাখুঁজি করে মূল বইয়ের ইংরেজি ও উর্দু কপি পেয়ে গেলাম এবং যার সঙ্গে পেইজের বিষয়টি প্রথম শেয়ার করেছিলাম, তাকেও দিলাম। এভাবে একে একে আমাদের বেশ কয়েকজনের মধ্যে বইটি নিয়ে আলোচনা হতে লাগলো এবং বইটি অনুবাদ করা যায় কিনা, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হলো।

কিছুদিনের পর ঘটনাক্রমে আমরা বেশ কয়েকজন এক জায়গায় বসেছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আড্ডা। সেবার পুরো রাত আমাদের আড্ডা জমে উঠেছিল। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে বইটি নিয়ে কথা উঠলো। এক পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সবাই মিলে পুরো বইটি অনুবাদ করে ফেলবো। যেহেতু ‘নির্বাসনের চিরকুট’ নামের পেইজটিতে বইয়ের শুরুর কিছু অংশ অনুবাদ করা আছে, যা প্রায় এক

বছরের অধিক সময় যাবৎ বন্ধ, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের ভাবনা ছিল আমরা একই নামে আরেকটি পেইজ খুলে আগের পেইজের অনূদিত অংশের পর থেকে নতুন অনুবাদ করে, পর্ব পর্ব আকারে পোস্ট করে যাবো।

যেই ভাবা সেই কাজ। নির্বাসনের চিরকুট-২ নামে একটি নতুন পেইজ খুলে আমরা আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ১২তম পর্ব হিসেবে আমাদের প্রথম অনূদিত অংশটি পোস্ট করলাম। আমাদের সৌভাগ্য যে, কয়েকজন প্রসিদ্ধ ভাই পোস্টটি শেয়ার করলেন, যার ফলে তা বেশ সাড়া ফেললো। যারা বহুদিন অপেক্ষায় ছিল, তাদের অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করলো। এমতাবস্থায় অনুবাদ টিমের আমরা সবাই বেশ অনুপ্রাণিত হলাম আর এই অনুপ্রেরণার ফলে আমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক বেড়ে গেল। আমরা সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম - এভাবে একটু আধটু করে আর নয়, দ্রুত সবাই মিলে পুরো বই অনুবাদ করে বাজারে নিয়ে আসবো। সেদিন থেকেই এই উদ্দেশ্যে আমাদের সম্মিলিত পথচলা শুরু।

এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে, আমাদের অনুবাদ টিমের দুয়েকজন ছাড়া কেউই প্রফেশনাল মানের লেখক বা অনুবাদক নয়। এখানে উদীয়মান লেখক অনুবাদকও যারা রয়েছেন, তারাও নিজেদের ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারছিলেন না। অবশ্য তাদের একজন পরবর্তীতে বেশ সময় দিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, আমাদের পুরো কর্মযজ্ঞটি ছিল এক ধরনের সংগ্রাম, যেখানে অনেক সাহস আর প্রেরণার শক্তিবলেই আমরা সফল হয়েছি। আমাদের মতো একদল আনাড়ি মানুষের কাজ একটি বইয়ের রূপ নিচ্ছে, এটা আমাদের জন্য যেমন আনন্দদায়ক, তেমনই প্রেরণা-উদ্দীপক। এটা আমাদের রবের অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের এই প্রেরণার গল্প আমাদের যেমন পথ চলতে সাহস যোগাবে, আশা করি আমাদের মতো আরও অনেককেই উজ্জীবিত করবে ইনশাআল্লাহ।

স্বপ্ন প্রস্ফুটিত হওয়ার এই আনন্দঘন মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যার কথা মনে পড়ছে, বাস্তবে আমরা কেউ সেই বান্দাকে চিনি না, জানি না কী তার পরিচয়। 'নির্বাসনের চিরকুট' নামক প্রথম পেইজটির অ্যাডমিন ভাইয়ের কাছে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ, তিনি না হলে আজ বইয়ের কাজটা হয়তো শুরুই হতো না। তিনি যেখানে যেভাবেই থাকেন, আমাদের আন্তরিক দুআ - আল্লাহ যেন তাঁকে নিরাপত্তা ও কল্যাণের সঙ্গে রাখেন। তাঁর অনুবাদ করা অংশটি আমরা আর নতুন করে অনুবাদ করিনি। বলে রাখা ভাল, আমাদের

পেইজে আমরা দু-তিনটা পর্ব পোস্ট করার পর প্রথম পেইজের এডমিন তার পেইজটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমরা সেটাকে তাঁর পক্ষ থেকে অনুমোদন ধরে নিয়েছি।

সেই অজানা ভাইয়ের অনুবাদের শুরুতে তাঁর কিছু কথা ছিল। সেই কথাগুলো এখানে তুলে দিলাম —

"নির্বাসনের জীবন সহজ নয়। এই জীবন আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেয় চেনা মাটির গন্ধ আর আপনজনের সান্নিধ্য। একাকীত্বের চাদরে মুড়ে দেয়। সময়ের আর জীবনের স্রোতকে বড় অচেনা মনে হয়। বেঁচে থাকার জন্য দরকারি সবকিছু থাকার পরও কেমন যেন মনে হয় সুর কেটে গেছে, হয়েছে ছন্দপতন। নির্বাসন ভাবতে শেখায়। নিজেকে নিয়ে, নিজের কর্ম, ক্লান্তি আর স্বপ্নকে নিয়ে।

নির্বাসনের জীবন বাধ্য করে চিন্তার চেনা ঘর থেকে বের হয়ে এসে সমালোচকের চোখে নিজেকে দেখতে। আমি তাই করলাম। বাধ্য হলাম। আবিষ্কার করলাম দুটো তথ্য। এক. লেখা আমার নেশা। দুই. লেখা নিয়ে আমি সবসময় চেনা পথেই ঘুরপাক খেয়েছি। নিজেকে চ্যালেঞ্জ করিনি। যেসব লেখা আমার আশেপাশের বন্ধুরা লিখেছে, আমিও তার অনুসরণ করেছি। সাময়িক বাহবা হয়তো পেয়েছি, কিন্তু স্বার্থকতা না। সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও আজ নির্বাসনের আত্মগোপনে মনে হচ্ছে, বাহবার চাইতে লেখার স্বার্থকতা অনেক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি চেনা গন্ডি থেকে বের হয়ে অচেনা ময়দানে পরিভ্রমণ করার। এমন কিছু করার, যা আমি আগে করিনি। এমন এক জগতের ছবি তোলার, এমন এক মাধ্যমে কাজ করার — যা আমার অপরিচিত। সেই চিন্তা থেকেই হান্টের বইটা অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিষয়বস্তু চমকপ্রদ, রহস্যে ঘেরা, টানটান উত্তেজনার। এই গল্প অস্ত্র, রক্ত আর আদর্শের। কবিতা আর ভাববাদী ছোটগল্পের জগত থেকে এর হাজার হাজার ক্রোশের দূরত্ব। তার ওপর মাধ্যম হিসাবে অনুবাদের সাথে আমি অপরিচিত।

তবে তাই হোক, নিজেকে চ্যালেঞ্জ করার সূচনা হোক এই অচেনা জগতের গল্প দিয়েই। গল্পের বিষয়বস্তু যেমন বৈশ্বিক, তেমনি আঞ্চলিক। পাঠক নিজ ভূখন্ডের ঘটন-অঘটন, গোলযোগের সাথেও খুঁজে পাবেন যোগসূত্র। বেশি কিছু এখনই বলতে চাই না, তবে আশা রাখি রোমাঞ্চিত হবেন। কারণ অদ্ভুত এই গল্প আরব্য রজনীর রূপকথাকেও যে হার মানায়। আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, এই গল্প সত্য!"

সবশেষে বলতে চাই, অনুবাদে আমরা আনাড়ি ও অনভিজ্ঞ হলেও বেশ কজন বিজ্ঞ ভাইয়ের পরামর্শেই আমাদের কাজ এগিয়েছে। দুই স্তরের সম্পাদনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রথিতযশা লেখকদের হাতে মূল সম্পাদনা হয়েছে এবং আরও অনেক বিজ্ঞ ভাইয়ের বিভিন্ন পরামর্শ ও উৎসাহ আমাদের কাজকে শক্তিশালী করেছে। শেষ পর্যায়ে এসে আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও আনাড়িপনার কোনো ছাপই বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাইনি, আশা করি বিজ্ঞ পাঠকও সেটা পাবেন না ইনশাআল্লাহ।

আমাদের কাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে যেসব অপরিচিত ভাই কেবল দ্বীনের খাতিরে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ এবং তাঁদের জন্য আন্তরিক দুআ। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, এই কাজের সঙ্গে জড়িত সকলকে তিনি তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে মাজলুম এই উম্মাহকে উপকৃত করুন। আমীন! ইয়া রব্বাশ শুহাদা, ইয়া রব্বাল আলামীন।

নিদাল হাসান

facebook.com/nidal.hasan19

রজব, ১৪৪১ হিজরি

সম্পাদনার টুকরো আলাপ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান-জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাদের ওপর। অতঃপর...

আজকের জামানায় আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জিহাদি নেটওয়ার্কগুলো সম্পর্কে অধিকাংশই যথেষ্ট জ্ঞান রাখে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত কিংবা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে, ইসলামের প্রথম যুগের গাযওয়াহ আর জিহাদ সম্পর্কে বই, পুস্তক, অডিও-ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের যতটা জানার সুযোগ হয়েছে, এই যুগের জিহাদ আর জিহাদি তানজিমগুলো সম্পর্কে তার সিকিভাগও হয়নি। এর উপর এই জামানার জিহাদ আর জিহাদি দলগুলো সম্পর্কে কাফির গোষ্ঠী, মডারেট গোষ্ঠী কিংবা কোনো না কোনো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অনুগত ব্যক্তি, দল, এমনকি দরবারি আলেমদের প্রচারণায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং মুজাহিদরা সবচেয়ে বেশি অপবাদ, অপধারণা আর ষড়যন্ত্র তত্ত্বের শিকার হয়েছে। কাফিরদের মডারেট মুসলিম নেটওয়ার্ক তৈরির প্রপাগান্ডা এদিক দিয়ে অনেকটাই সফল। অথচ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আমরা জানি যে, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্তই চলতে থাকবে আর আল্লাহর রাস্তায় উম্মাহর এক দল হকের পক্ষে কিতাল করতে থাকবে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে যখন এই জামানায় জিহাদ পরিচালনা করা আল-কায়েদা কিংবা তালেবানের ইতিহাস, আকিদাহ, আদর্শ ইত্যাদির ধারণা দেওয়া কোনো বই আসে, তখন এটাই স্বাভাবিক যে আগে থেকে ধারণা না থাকা বান্দারা সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারে না। ফলে বাস্তবতার সাথে ধারণাউদ্ভূত চিন্তাভাবনার মিশেলে এক আধাসত্য-আধামিথ্যা গল্পকেই তারা সত্য ভেবে নেয়। এমতাবস্থায় যারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি সম্পর্কে খোঁজ খবর রেখে এসেছে, তাঁদের অভিজ্ঞ দৃষ্টির সাহায্য না নেওয়া হলে সেটা বেইনসাফি বৈ কিছু হয় না। আর একারণেই বক্ষ্যমাণ এই বইটিকে অলস অনুবাদ করে ছেড়ে না দিয়ে সম্পাদনার ছুঁড়ির নিচে নেওয়া হয়েছে।

এরপর আসে হলো, কোন কোন ব্যাপার কীভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে, সেই প্রশ্ন। সত্য হলো, লেখক নিজ অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি যেমন এনেছেন, ঠিক তেমনি দুয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচলিত কিন্তু অসত্য ধারণারও আশ্রয় নিয়েছেন। আমাদের প্রচেষ্টা

ছিল, সেই ব্যাপারগুলোয় লেখকের বক্তব্য ঠিক রেখে টিকা সংযোজন করে স্পষ্ট করে দেওয়ার। আর যে ব্যাপারগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন পর্যায়ে পড়ে, সেই সাথে আবার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এসেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য একবার ঠিক রেখে প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়ার পর অন্যান্য পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। যাতে প্রতিবার একই টিকা এড়ানো যায় এবং সত্যও অটুট থাকে। এছাড়া বিশ্বপরিস্থিতি ও ভূ-রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর একেবারেই নবীন পাঠকদের ব্যাপার মাথায় রেখে বেশ কিছু তথ্যমূলক টিকাও সংযোজিত হয়েছে।

সব মিলিয়ে বইটিতে পাঠকগণ লেখকের ধারণাও পাবেন, আবার বাস্তবতার ধারণাও পাবেন ইন-শা-আল্লাহ। তবে সম্পাদনার দরুণ দিনশেষে এই বইটিকে ঈষৎ সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বললেও ভুল হয়ে যায় না।

আর সর্বশেষ যে ব্যাপারটি জানানো গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো সম্পাদনা আর টিকাগুলোর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সত্য ও বাস্তবতার পক্ষেই অবস্থান নেওয়ার সর্বাত্নক চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি দীর্ঘকালের পরাজিত জাতি হওয়ার কারণে কাফির, মুশরিকদের কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতার ফিল্টারে দ্বীন নেওয়া বান্দাদের অনেকেই জিহাদি গ্রুপগুলোর আকিদাহ ও কর্মপদ্ধতির দিকে পক্ষপাতিত্বের আওয়াজ তুলতেই পারেন। সেক্ষেত্রে বলবো যে, আমাদের চেষ্টা ছিল জিহাদি দলগুলোর দলিল-প্রমাণগুলোর প্রতি ইনসাফ করা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ইনসাফ করা। এরপরও কিছু বান্দারা যে বাঁকা চোখে তাকাতে চাইবে, সেটা তো চিরন্তন বাস্তবতা। প্রকৃতপক্ষে সব কাজ তো আর সবসময় সবাইকে রাজিখুশি করে করা সম্ভব হয় না। আমাদের রব আমাদের প্রতি রাজি হলেই যথেষ্ট।

আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা এই গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বান্দাদের প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন। একইসাথে কবুল করুন গুনাহ মাফের এবং সাওয়াবে যারিয়ার উপলক্ষ্য হিসেবে। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবাগণের ওপর।

সম্পাদনা প্যানেল,
ইকলাইট পাবলিকেশন
রজব, ১৪৪১ হিজরি

লেখকের মুখবন্ধ

আমি কখনোই ভালোভাবে ফান্ড করা কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার হয়ে কাজ করিনি। মূলধারার জাতীয় কোনো মিডিয়াতেও আমি কাজ করিনি। সবসময়ই আমার সম্পর্ক ছিল বিকল্প ধারার মিডিয়ার (Alternative Media) [2] সাথে। ফলে কখনোই আমার হাতে অনেক অনেক অপশন থাকতো না। বরং খুবই সংকীর্ণ পরিসরে আমাকে কাজ করতে হতো। রাজনৈতিক ময়দানের গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ ব্যক্তিত্বরা তাদের মিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য ভালো ফান্ডিং সম্বলিত মূলধারার সংবাদ সংস্থাগুলোকে কাজে লাগিয়ে থাকে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাধারণ মিডিয়ার তুলনায় ভিন্নধর্মী মিডিয়ার লোকদেরকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয়।

তবে বিকল্প ধারার মিডিয়ার জন্য স্বাধীনভাবে রিপোর্ট করাই আমার মন-মেজাজের সাথে যায়। কারণ কাজের এই ধরনটি 'প্রচলিত ধ্যানধারণার' বাইরে এসে সত্য উদঘাটন করতে উৎসাহিত করে। ফলে আমি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হই। উদাহরণস্বরূপ, আমি আল-কায়েদার সুপরিচিত পরিমণ্ডলের ব্যক্তিদের নিয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক চিন্তার বদলে আল-কায়েদার সাংগঠনিক কাঠামোর নিচের ধাপে অবস্থিত লোকদের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। বিশ্ব সম্পর্কে তাদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের জীবন, পর্দার আড়ালে তাদের অবদান - যেগুলো বাস্তবে একটি আন্দোলনের ভাগ্য নির্ধারণ করে চলেছে, তা অন্যদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। সেই স্বল্প পরিচিত মানুষদের যাদের ব্যাপারে আমি গবেষণা করেছি এবং যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, তাদের মধ্যে রয়েছেন কমান্ডার মুহাম্মাদ ইলিয়াস কাশ্মীরি, সিরাজউদ্দিন হাক্কানি এবং কারী জিয়াউর রহমান। (তারা প্রত্যেকেই পরবর্তীতে আন্দোলনের প্রকৃত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।)

---

2. Alternative Media বা সহজ বাংলায় ভিন্নধর্মী সংবাদমাধ্যম। যেখানে মূলধারার প্রচারমাধ্যম সামগ্রিকভাবে সরকারি ও ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ উপস্থাপন করে, সেখানে বিকল্প সংবাদমাধ্যম অবাণিজ্যিকভাবে অবহেলিত, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা কমিউনিটির স্বার্থ ফোকাসে রেখে কাজ করে।

সাধারণত ভিন্নধর্মী প্রচার মাধ্যমগুলোর একেকটি নিজেদের পছন্দসই এক বা একাধিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আর নিজেদের আগ্রহ ও পছন্দের সেই কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অপরাধ, যুদ্ধ, জিহাদি সংগঠন থেকে শুরু করে মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার, এলজিবিটি অধিকার সহ বিভিন্ন চিন্তা, আদর্শও থাকতে পারে। মোটকথা, সমস্ত ভিন্নধর্মী প্রচার মাধ্যমের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এক হয় না।

উসামা বিন লাদেনকে আজকের দুনিয়া চেনে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে, যিনি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিলেন; আর আল-কায়েদা হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই আন্দোলনের কার্যকরী প্রতিরূপ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিন লাদেন ছাড়াও আল-কায়েদার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে। আল-কায়েদার এই কাহিনীতে ঠিক সেই পরিমাণ চরিত্র, ব্যক্তি এবং চমক রয়েছে যা রানী শেহেরজাদে তার স্বামী বাদশাহ শাহরিয়ারকে কিংবদন্তীতুল্য রূপকথা 'আলিফ লায়লা'-এর গল্পে বর্ণনা করেছিল। এই কাহিনীগুলোতে এমন অনেক স্বল্প পরিচিত চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজেদের সময়কার দুনিয়াকে প্রভাবিত করেছিল ঐ ধরনের ভালোবাসা অথবা বিশ্বস্ততা দ্বারা, যেগুলোকে আজও মানবতার নির্যাস হিসেবে গণ্য করা হয়।

আলিফ-লায়লা তথা আরব্য রজনী হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে প্রচলিত অনেকগুলো গল্প ও লোককাহিনী, যা ইসলামি স্বর্ণযুগে আরবিতে সংকলিত হয়েছিল। এই গল্পগুলোর লেখক এবং সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। চরিত্রহীনা প্রথম স্ত্রীর প্রতারণার স্বীকার হওয়ার পর রাজা শাহরিয়ার ছলনাময়ী নারীত্বকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিদিন একজন নতুন নারীকে বিয়ে ও বাসর রাতে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শাহরিয়ারের সেই প্রতিশোধস্পৃহায় যেন আরব্য রজনীর গল্পগুলো একসূত্রে গাঁথা। চতুর শেহেরজাদে, যাকে ভারতীয় বংশদ্ভূত বলে ধারণা করা হয় - সেটার সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। এক হাজার এক রাতব্যাপী বিস্তৃত গল্পের মাধ্যমে সে শাহরিয়ারকে বিমোহিত করে রেখেছিল যাতে করে মৃত্যু এড়ানো যায়, এবং রাজার মনে নারী জাতির প্রতি বিশ্বাস ফিরে আসে।

শেহেরজাদের এই গল্পগাঁথা জুড়ে ছিল ভারত, ইরাক, ইরান, মিশর, তুর্কি এবং খুব সম্ভবত গ্রিসের বিভিন্ন গল্প। ধারণা করা হয় যে, সেই গল্পগুলো প্রাথমিকভাবে মুখেমুখে প্রচারিত হয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে শতাব্দীজুড়ে সেগুলো এক সমন্বিত রূপ লাভ করে। গল্পগুলোর মতোই এই সংকলনের ইতিহাসও দীর্ঘ, জটিল এবং আঁকাবাঁকা। আর এই গল্পগুলোও জটিল আর চমকপ্রদ বর্ণনে পাঠককে এমন এক মনোমুগ্ধকর কাহিনীর ঘোরপাকে নিয়ে যায়, যা থেকে সহজে মুক্তি মেলে না। আমি চেষ্টা করেছি আল-কায়েদার নিজস্ব আরব্য রজনীর গল্পের কিংবদন্তীতুল্য কিছু চরিত্রের পেছনের রহস্য উন্মোচন করে সমান্তরালভাবে উস্থাপন করার। এগুলো হচ্ছে সেই সব চরিত্রের গল্প, যারা পর্দার আড়ালে কাজ করেছেন। আবার একই সময়ে তারা এমন একটি প্রেক্ষাপট তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যার ফলে ২০০১-এ আমেরিকায়

হামলার পর যাদের ব্যাপারে ধারণা করা হচ্ছিল যে তোরা-বোরা পাহাড়ের ধ্বংসস্তুপের নিচে তারা চাপা পড়ে গেছে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই কিনা সেই আল-কায়েদা উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত তাদের ডানা বিস্তৃত করেছে; পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বাস্তবমুখী ও বৈশ্বিক প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

আল-কায়েদার বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা করবার জন্য আমি ইরাক, লেবানন, উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং আফগানিস্তান ভ্রমণ করেছি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে আমার প্রকৃত অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে খুবই স্বল্প পরিচিত একজন মানুষ। পাকিস্তানের এলিট কমান্ডোদের একজন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের (SSG) সদস্য রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন খুররম আশিক [3]। যখন আমি তাঁর সাথে দেখা করি, ততদিনে ক্যাপ্টেন খুররাম সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে আফগানিস্তানে তালেবানের সাথে যোগ দিয়েছেন। আল-কায়েদাতে তাঁর অবদান ভোলার মতো ছিল না। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর বন্ধু রিটায়ার্ড মেজর আবদুর রহমান এবং তাঁর ভাই রিটায়ার্ড মেজর হারুণ, আমার সাথে দেখা করেন এবং আল-কায়েদার যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাকে আরও বিস্তৃত করেন। দুই রিটায়ার্ড মেজর আবদুর রহমান এবং মেজর হারুণ পরবর্তীতে ২৬ নভেম্বর, ২০০৮-এর মুম্বাই হামলার (যে হামলাকে ২৬/১১ বলা হয়) প্রধান দুই মাস্টারমাইন্ডে পরিণত হন এবং পশ্চিমাদের মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আল-কায়েদার যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

তাঁদের সাথে দেখা হওয়ার পর সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি আল-কায়েদার দুনিয়াকে দেখা শুরু করি – এক অতুলনীয় কর্মশক্তি যা কেবল বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতার মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল, উন্নত এবং শক্তিশালী প্রযুক্তির আমেরিকাকে (বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার) ৯/১১-এর মাধ্যমে উস্কে দিয়েছিল। তাদের এই চালের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে এমন এক অঞ্চলে যুদ্ধে টেনে আনা, যেখানকার মানুষেরা রীতিমত প্রস্তর যুগে বসবাস করতো - এমন এক যুগ, যেখানে উন্নত প্রযুক্তির কোনোই মূল্য নেই, যেখানে শুধু বেঁচে থাকার সহজাত জ্ঞানটুকুই বিদ্যমান। তাই এটি বিস্ময়কর নয় যে, এই যুদ্ধের শুরুর দিকে আল-কায়েদার অনুগত শত শত যোদ্ধা নিহত হয়েছিল; আর বেঁচে যাওয়া যোদ্ধারা দ্রুত পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল; বাধ্য হয়েছিল আমেরিকার বিজয় পর্যবেক্ষণে।

---

3. হেলমান্দ প্রদেশে তালেবানের হয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহীদ।

যখন স্থানীয় তালেবান যোদ্ধারা বিদেশি আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তখন আল-কায়েদা খুব গভীরভাবে পরিস্থিত পর্যবেক্ষণ করলেও প্রাথমিকভাবে লড়াই থেকে ছিল বিরত। বরং তারা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত ছিল অন্য এক কাজে, আর তা হলো এই স্থানীয়দেরকে রক্তের ভাইয়ে পরিণত করা, এবং আল-কায়েদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। আল-কায়েদার প্রথম লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের মাটিতে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। পরবর্তী লক্ষ্য ছিল যুদ্ধকে মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করা, যাতে মধ্যপ্রাচ্যের চূড়ান্ত যুদ্ধে যাবার আগেই (বিশ্বের বাকি থাকা একমাত্র) সুপার পাওয়ারের শক্তি সামর্থ্য ও সম্পদকে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়; যাতে পরবর্তীতে খিলাফাতের অধীনে মুসলিম রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংগত করা যায়, যা পরবর্তীতে সকল মুসলিম ভূমিগুলোকে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করবে।

এই বইটি এমনই এক সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে লেখা হয়েছে, যখন আফগানিস্তানে পশ্চিমা মিত্রশক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সময়ে অনেক বক্তাই পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনপুষ্ট এক আল-কায়েদার ছবি এঁকে, বিশ্ববাসীর জন্য একে হুমকি হিসেবে চিত্রায়িত করেছিলেন। কিন্তু বহু বছরের যুদ্ধের পর যা সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে, তা হলো কারও সমর্থন কিংবা অস্ত্রশস্ত্রই আল-কায়েদার সাফল্যের চাবি ছিল না। বরং আল-কায়েদার সাফল্যের চাবি ছিল - চলমান ঘটনাপ্রবাহকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে উন্নত-প্রযুক্তিসম্পন্ন শত্রুকে বিপর্যস্ত করার ভঙ্গির এক কৌশলী ক্ষমতা।

পশ্চিমা মিত্রশক্তি এখন আফগান যুদ্ধের ময়দান থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজছে। কিন্তু কখনও যদি পশ্চিমা মিত্রশক্তি তা করতে সক্ষম হয়ও, তবুও এর মাধ্যমে পশ্চিমের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে না। বরং এটি যুদ্ধের কেবলমাত্র একটি পর্বের সমাপ্তির সংকেত দেবে, এবং আরেকটি পর্বের সূচনা করবে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই আমি পুরো বইটি জুড়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

2011

আরব্য রজনীর
নতুন অধ্যায়

খোরাসান

৯/১১-এর হামলার লক্ষ্য ছিল আমেরিকাকে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি যুদ্ধে টেনে আনা। আর ২০০৮-এর ২৬/১১ মুম্বাই হামলা ছিল এই হুঁশিয়ারি যে — আল-কায়েদা তাদের যুদ্ধকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত করছে এবং মধ্যএশিয়ার দেশগুলো থেকে শুরু করে ভারত হয়ে বাংলাদেশের সীমানা পর্যন্ত অঞ্চলটিতে এমন আরও ঘটনাই ঘটবে। আল-কায়েদার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটি হলো 'শেষ জমানার যুদ্ধ'-এর প্রস্তুতি, যেমনটা নবি মুহাম্মাদ ﷺ হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।[4] হাদিস অনুযায়ী শেষ জমানার যুদ্ধের পটভূমি হিসেবে বর্তমান ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মধ্যএশিয়া নিয়ে গঠিত অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, যা প্রাচীন খোরাসান নামে পরিচিত। হাদিস অনুযায়ী পশ্চিমের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে, শেষ জমানার যুদ্ধের প্রথম ময়দান হবে খোরাসান। আর শেষে যুদ্ধ হবে মধ্যপ্রাচ্যে; ফিলিস্তিনসহ দখলকৃত মুসলিম ভূমিগুলোর মুক্তির জন্য।

আল-কায়েদার লক্ষ্য হলো, সেই সময় আসার আগে, বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে আফগানিস্তানের দুর্গম, কঠিন মাটিতে এক অসম্ভব যুদ্ধের ফাঁদে আটকে ফেলা। যার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো — পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দান বিস্তৃত করার আগেই তাদের শক্তিকে নিঃশেষ করতে বাধ্য করা।[5]

৯/১১-এর হামলার কয়েক বছর পর, ২০০৯-এর অক্টোবরে, লস্করে তইয়্যেবার সদস্য, এবং গ্রেপ্তার হওয়া আমেরিকান নাগরিক ডেভিড হেডলির (David Headley) দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ২০০৮-এর ২৬/১১ মুম্বাই হামলার প্রধান পরিকল্পনাকারী — কমান্ডার

---

4. হাদিসগুলোর মধ্যে একটি হলো,

تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ لاَ يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

"খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী একটি দলের আবির্ভাব হবে; কোনোকিছুই তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা জেরুজালেম বিজয় করে।" [তিরমিযি ২২৬৯, হাদিসটি যয়িফ]

5. এখানে হাদিস এবং তা থেকে লেখকের উল্লেখিত ব্যাপারটি মূলত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আল-কায়েদার কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি; কোনো শারঈ দলিল নয়। বরং আল-কায়েদার জিহাদের শারঈ দলিল হলো, পুরো বিশ্বের ভূমিগুলোতে মুসলিমদের ওপর চলমান অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার দলিলাদি, যা তারা তাদের লিখা-বক্তব্য ইত্যাদিতে অহরহ বলে থাকে।

মুহাম্মাদ ইলিয়াস কাশ্মীরি, আমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি ছবি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

“আমরা এই যুদ্ধের প্ল্যান করেছি বড় শয়তান (আমেরিকা) আর ওর মিত্রদের এই জলাভূমিতে (আফগানিস্তানে) আটকে ফেলার কথা মাথায় রেখে। আফগানিস্তান হলো বিশ্বের মধ্যে এমন এক বিরল জায়গা, যেখানে একজন শিকারীর ফাঁদ পাতার জন্য সব ধরনের সুযোগ রয়েছে। আমরা মনে করি মরুভূমি, নদী, পাহাড়, এমনকি শহরাঞ্চলেও ফাঁদ পাতা সম্ভব।

আমরা সবচেয়ে বড় শয়তানের বৈশ্বিক চক্রান্তে বিরক্ত; আর আমরা ওর মৃত্যুর লক্ষ্যে কাজ করছি, যাতে এই দুনিয়াকে শান্তি ও ন্যায়ের জায়গাতে পরিণত করতে পারি। ঔদ্ধত্যে ঠাসা এই শয়তান (আমেরিকা) আফগানদেরকে অসহায় মূর্তির মতো ভাবে, যাদেরকে কোনোরকমের পাল্টা আক্রমণ কিংবা প্রতিশোধের হুমকি ছাড়াই সহজে চারদিক থেকে থেকে আমেরিকান যুদ্ধ মেশিনারি দিয়ে আক্রমণ করা যেতেই পারে।”[6]

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ২০০১-এ শুরু হওয়া আল-কায়েদার যুদ্ধের বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে দখলদার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক দশক ধরে চলা জিহাদের সময়েই। আফগান যোদ্ধাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানে আসা আরবদের মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — ইয়েমেনি এবং মিশরীয়। নিজ দেশের আলেমদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্জলা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে আফগানিস্তানে আসা আরবদের বেশির ভাগই ইয়েমেনি ক্যাম্পে যোগ দিতো। যখন তারা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো না, তাদের সময় কাটতো ব্যায়াম আর দিনভর কঠোর মিলিটারি ট্রেনিংয়ে। তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই রান্না করতো এবং এশার নামাযের পরপর ঘুমিয়ে যেত।

আশির দশকের শেষ দিকে আফগান জিহাদ যখন সমাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছিল, এই মুজাহিদদের বেশিরভাগই নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। আবার অনেকে বিয়ে করে আফগান অথবা পাকিস্তানিদের সাথে মিলেমিশে সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আল-কায়েদার চিন্তাধারার লোকেরা শেষের এই মানুষগুলোকে বলতো দরবেশ (সহজ-সরল ধার্মিক)।

---

6. এশিয়ান টাইমস অনলাইন, অক্টোবর ১৫, ২০০৯ ইংরেজি

অন্যদিকে মিশরীয় ক্যাম্পে এমন বহু লোক ছিল, যাদের চিন্তা ছিল তীব্রভাবে রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুপ্রাণিত। যদিও তাদের বেশিরভাগই ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমিন [7] -এর সদস্য, কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার বদলে গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের ওপর জোর দেওয়ায় সংগঠনটির ওপর তারা অখুশি ছিল। আফগান জিহাদ এই সমমনা মানুষগুলোকে একত্রিত করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার; এবং অন্য অনেকেই ছিলেন মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। এবং ছিলেন ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরির [8] আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন [9] 'মিশরীয় ইসলামি জিহাদ' (Egyptian Islamic Jihad)-এর সদস্য।

১৯৮১ সালে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতের হত্যাকান্ডের জন্য ডা. আজ-জাওয়াহিরির এই সংগঠনটি দায়ী ছিল। ইসরায়েলের সাথে ক্যাম্প ডেভিডে শান্তি চুক্তি [10] করার কারণে আনওয়ার সাদাতকে হত্যা করা হয়।

---

7. ইখওয়ানুল মুসলিমিন বা Muslim Brotherhood। ১৯২৮ সালে মিশরে হাসানুল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে মুসলিম বিশ্বে খিলাফাতের একেবারে আনুষ্ঠানিক পতনের পর খিলাফাত ও শরীয়াহ শাসন ফিরিয়ে আনার মানসে কাজ শুরু হওয়ায় অল্প সময়েই ব্যাপক জনপ্রিয় এবং প্রভাববিস্তারকারী আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলিমদের সশস্ত্র রীতি জিহাদকে পরিত্যাগ করে প্যান-ইসলামিক কৌশল, পশ্চিমা ছকের গণতন্ত্র, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদিকে শরীয়াহ কায়েমের কৌশল হিসেবে নির্ধারণ করায় সংগঠনটির জিহাদি মানসিকতার লোকেরা সময়ে সময়ে সেখান থেকে সরে যায়। মিশরে দলটির ৮৫ বছরের ইতিহাসে ২০১২ সালে নানা ঘটনাপ্রবাহের পর দলটি থেকে মুহাম্মাদ মুরসি রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু মাত্র ১ বছরের মাথায় এক সেনা অভ্যুত্থানে তাদেরকে ক্ষমতা চ্যুত করে দেওয়া হয়।

8. বর্তমানে আল-কায়েদার আমির

9. Underground Organization বা গোপন সংগঠন হলো সাধারণ অবস্থায় সদস্যদের দ্বারা গোপনকৃত সংগঠন, যার সদস্যরা ক্ষমতাসীন, শাসকবর্গ বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

10. Camp David আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের বিশ্রামাগার হিসেবে পরিচিত। ওয়াশিংটন ডিসির ৬২ মাইল (১০০ কিমি) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের মেরিল্যান্ডের থারমন্টের কাছে ক্যাটোকটিন মাউন্টেইন পার্কে অবস্থিত।

১৯৬৭-তে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে ইসরায়েলের আবির্ভাবের পর গোটা আরব আর ইসরায়েলের মধ্যে দারুণ সংঘাত বিদ্যমান ছিল। এমন সংঘাতের মধ্যেই ১৯৭৮ সালে মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আনওয়ার সাদাত আর ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন এই ক্যাম্প ডেভিডে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, যা পরবর্তীতে Camp David Accords বা 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' নামে পরিচিতি পায়।

এই চিন্তাধারার সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো — আরব বিশ্বের সর্বনাশ ও হতাশার পেছনে মূল কারণ হলো আমেরিকা, আর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের দালাল সরকারগুলো। আফগান যুদ্ধের মিশরীয় ক্যাম্পটি ছিল ডা. আজ-জাওয়াহিরির অধীনে। এশার নামাযের পর তাদের সময় কাটতো আরব বিশ্বের সমসাময়িক নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনায়। এই ক্যাম্পের নেতারা সবচেয়ে শক্তভাবে যে মেসেজটি প্রচার করতো, তা হলো — মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সামরিক বাহিনীগুলোকে আদর্শিকভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আফগান প্রেসিডেন্ট প্রফেসর বুরহানউদ্দিন রব্বানি যখন উসামা বিন লাদেনকে সুদান থেকে আফগানিস্তানে আসার সুযোগ দিয়েছিল, ততদিনে মিশরীয় ক্যাম্পটি বহু লোককে নিজ অধীনে নিয়ে এসেছিল। তারা বিভিন্ন মুয়াসকার (ট্রেনিং ক্যাম্প) পরিচালনা করার মাধ্যমে আসন্ন যুদ্ধের জন্য কৌশল (এবং কর্মপন্থা) শেখানো শুরু করলো। যতদিনে আফগানিস্তানে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে তালেবানের আবির্ভাব ঘটলো, ততদিনে মিশরীয় ক্যাম্প তাদের কৌশলগুলো চূড়ান্ত করে ফেলেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কৌশলগুলো ছিল :

- দুর্নীতিগ্রস্ত এবং স্বৈরাচারী মুসলিম সরকারগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণা (দাওয়াতি কার্যক্রম) চালানো, জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং সেই অত্যাচারী সরকারদলীয় লোকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদেরকে (দাওয়াতের) টার্গেট অডিয়েন্স বানানো; যাতে করে রাষ্ট্র, শাসক এবং জাতির সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সাধারণ জনতার চোখে এই শাসকদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়।

- মুসলিমদের দুর্দশার পেছনে আমেরিকার ভূমিকার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। আমেরিকাই যে ইসরায়েলকে এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর অত্যাচারী শাসকদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে - এই সত্য সবার সামনে স্পষ্ট করে তোলা।

এই ছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের সময়কারই অবস্থা। এবং এই সময়ই মিশরীয় ক্যাম্প সারা বিশ্ব থেকে জড়ো হওয়া বহু মুসলিম যুবকের মননকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল।

পরিকল্পনা

এই বইতে ১৯৯৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ের বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। বেশির ভাগ পর্যবেক্ষকের চোখে আল-কায়েদা এবং তালেবানকে দেখতে এক রকম মনে হলেও, আসলে ব্যাপারটা এমন না। উদ্দেশ্য এবং সাংগঠনিক সদস্যের দিক থেকে আল-কায়েদা আর তালেবান কখনোই এক ও অভিন্ন ছিল না। তালেবানের একেবারে শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ আর খুব অল্প কিছু মানুষই এই বাস্তবতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখেন। আল-কায়েদা দীর্ঘদিন ধরে তালেবানকে সমর্থন করেছে এবং তালেবানের সামরিক সাফল্যের পেছনে আল-কায়েদার ভূমিকা ব্যাপক।

তালেবানের পক্ষে আল-কায়েদার সক্রিয় সামরিক সহায়তার শুরু ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে, আফগান গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে Northern Alliance[11]-এর বিরুদ্ধে। তারপর ২০০১-এ আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আল-কায়েদা সক্রিয়ভাবে তালেবানকে সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার মানে এই না যে এই দুটো দল একই, বরং তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। [12] আসলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অনন্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কের মাধ্যমে আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল তালেবানসহ সমস্ত বিশ্বের ইসলামি স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোকে নিজের আদর্শে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের সাথী করে নেওয়া।

---

11. ১৯৯৬-এ তালেবান সরকার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখল করে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করলে তৎকালীন আফগান রাষ্ট্রপতি বুরহানউদ্দিন রব্বানি এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহমাদ শাহ মাসউদ সহ আফগান জাতীয়তাবাদী সরকারের নেতৃবৃন্দ মিলে সেই বছরের শেষের দিকে Afghan Northern Alliance (যেটাকে সংক্ষেপে শুধু Northern Alliance নামে ডাকা হয়) গঠন করে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সেই সময় Northern Alliance-কে সমর্থন এবং সহযোগিতা করেছিল ইরান, রাশিয়া, তুরস্ক, ভারত এবং তাজিকিস্তান।

৯/১১-এর পর ২০০১-এর শেষদিকে আমেরিকাও আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে Northern Alliance-কে সহযোগিতা শুরু করে। ফলে ২০০১-এর ডিসেম্বরে তালেবান ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পিছু হটে যায়। এর ফলস্বরূপ জাতীয়তাবাদী Afghan Northern Alliance-এর অবসান ঘটে এবং সেখানকার নেতৃবৃন্দ হামিদ কারজাইয়ের সরকার দলে যোগ দেয়।

12. এই পার্থক্য কৌশল ও পদ্ধতিগত। আদর্শিক কিংবা চূড়ান্ত উদ্দেশ্যগত নয়। পরবর্তীতে এই ব্যাপারগুলো আরও স্পষ্ট হবে।

আল-কায়েদা তাদের এই উদ্দেশ্য গোপন রাখেনি, প্রকাশ্যেই বিভিন্ন সময় ঘোষণা করেছে। এই কারণে তালেবান সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্দোলন, যেমন উজবেকিস্তান, চেচনিয়া, চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ (পূর্ব তুর্কিস্তান নামে পরিচিত ছিল), কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোও আল-কায়েদার এই পরিকল্পনা সম্পর্কে হয়তো সজাগ ছিল। কিন্ত আল-কায়েদা খুব নিখুঁতভাবে প্রতিটি দলকে একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বৃহত্তর পরিকল্পনার অধীনে একত্রিত করতে পেরেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধরত সংগঠনগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সম্পদ ও উপকরণ যেন তার নিজস্ব চ্যানেলের মধ্য দিয়েই যায়, আল-কায়েদা সেটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে। ফলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, জিহাদি দলগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে আল-কায়েদার দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেছে।

আল-কায়েদাকে আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর বলা যায় না। বরং তাদের সমস্ত পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও পদক্ষেপের পেছনে চালিকা শক্তি হলো সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মুক্তি ও বিজয় ত্বরান্বিত করার তীব্র ইচ্ছা। আমরা যদি নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০১০ পর্যন্ত সময়কালকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব — আল-কায়েদার সন্তানেরা আত্মোৎসর্গের বেদিতে বার বার নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর আফগানিস্তানে Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে তালেবান প্রাথমিকভাবে যে সাফল্য পেয়েছিল, তা দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আল-কায়েদা সেসময় তালেবানকে আরব যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করেছিল। ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের প্রকৃত বীরেরা ছিল আরব যোদ্ধারাই। তাই যখন আরব আল-কায়েদা Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে তালেবানকে সমর্থন দিল, তখন তা তালেবানের কাছে আল-কায়েদার বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতাকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল।

সাধারণত যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরবরা আফগানদের চেয়েও বেশি দৃঢ়চেতা ও আগ্রাসী হয়ে থাকে। Northern Alliance এবং তালেবানের মধ্যকার লড়াইয়ে আরবদের অংশগ্রহণ পুরো যুদ্ধের ধরন ও গতিপ্রকৃতি পাল্টে দেয়। আহমাদ শাহ মাসউদ[13] পরিচালিত Northern Alliance (পরবর্তীকালে সে নিহত হয়ে) অতিদ্রুত উত্তর আফগানিস্তানের ওপর

13. জাতীয়তাবাদী আফগান রাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহমাদ শাহ মাসউদ। Northern Alliance গঠনকালে সে রিটায়ার্ড ছিল।

তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে, এবং ছোট এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মাসউদ এতটাই কঠিন অবস্থায় পড়ে যে, একাধিকবার তাজিকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছিল। এটা হলো সেই সময়ের কথা যখন তালেবান সেনাবাহিনী Northern Alliance আর মাসউদের মূল ঘাঁটি পাঞ্জশির উপত্যকায় ঢুকে পড়েছিল।

Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে তালেবানের প্রতি আল-কায়েদার সাহায্য ব্যাপকভাবে তালেবানকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে, তালেবানের আমির ও আধ্যাত্মিক নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ উমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে আল-কায়েদার প্রতি ঋণী মনে করতেন। এই সময় আল-কায়েদা কার্যত তালেবানের প্রতিরক্ষা নীতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, যার মধ্যে ছিল Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনা ও যুদ্ধ কৌশল তৈরি করা। এর ফলে আল-কায়েদা চেচেন, পাকিস্তানি, উজবেক এমনকি চাইনিজ স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর ক্যাম্পেও প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়।

আর এই কাজ চলাকালীন সময়ে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের পুরো প্রকৃতিই পাল্টে দেয়, তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করার জন্য সমগ্র আফগানিস্তানে যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয়, এবং অনভিজ্ঞ তালেবান শাসনকে পরিণত করে একটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টেইটে। এর মধ্যে ছিল বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার মতো বিভিন্ন কর্মকান্ড, যা তালেবানকে পশ্চিমা বিশ্বের চোখে অচ্ছুৎ-এ পরিণত করে।

সেসময় তিনটি দেশ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল: পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই দেশগুলো প্রচন্ডভাবে চেষ্টা করেছিল তালেবানকে চীন সীমান্তের দিকে ঠেলে দেওয়ার। কিন্তু তালেবান তখন চীনকে আশ্বস্ত করেছিল যে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলোকে চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেবে না। বরং পূর্ব তুর্কিস্তানের ইসলামি আন্দোলনকারীদেরকে আফগানিস্তানেই শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে দেওয়া হবে। চীন জিনজিয়াং প্রদেশে কোনো ধরনের বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাওয়ার যে ভয় করছিল, সেই সুযোগ আফগানে আশ্রয় নেওয়া পূর্ব তুর্কিস্তানের মুজাহিদদেরকে (আপাতত) দেওয়া হবে না।

সেই সুবাদে চীনও তালেবানকে আফগানিস্তানের বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এমন সময়েই বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। আর তার কিছুদিন পরেই ঘটে ৯/১১। এসব ঘটনার কারণে চীন

পিছিয়ে যায়। তালেবান সরকারকে চীন স্বীকৃতি দিয়ে দিলে তা হয়তো তালেবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে গৃহীত হওয়ার দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু আল-কায়েদা এটি চাইছিল না। আফগানিস্তান যদি পশ্চিমা জাতিসংঘ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক (কাফির) সম্প্রদায়ের অংশে পরিণত হতো, তবে সেটা হতো আল-কায়েদার সামগ্রিক উদ্দেশ্যের বিপরীত।[14]

আল-কায়েদার লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুরো অঞ্চলকে একটি যুদ্ধের ময়দানে পরিণত করা প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে আমেরিকাকে টেনে এনে আফগানিস্তানের জলাভূমির ফাঁদে আটকে ফেলা যায়। ৯/১১ যখন পুরো অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিল, তা ছিল আফগানিস্তানকে ঘিরে আল-কায়েদার পরিকল্পনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল-কায়েদার দৃষ্টিতে, ৯/১১-এর পর আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ ঠিক ততটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল, যতটা ছিল আমেরিকান আক্রমণের মুখে আফগানিস্তানে তালেবানের সাময়িক পরাজয় এবং পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় গা ঢাকা দেওয়া।

---

14. বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের ঘটনা তালেবান (ও আল-কায়েদার সম্মিলিত) আমির মোল্লা উমারের নির্দেশেই হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সাথে চীন সরকারও সেসময় বৌদ্ধমূর্তির জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা তুলেছিল। কিন্তু তালেবান তা অগ্রাহ্য করেছিল। আন্তর্জাতিক কাফির সম্প্রদায়ের অংশে পরিণত হওয়া আদৌ তালেবান কিংবা আল-কায়েদা - কারও আদর্শের সাথেই মানানসই ছিল না। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর থেকে তালেবান সবসময়ই আল-কায়েদার সামগ্রিক ও বিশ্বব্যাপী উদ্দেশ্যের প্রতি ইতিবাচক ও পূর্ণাঙ্গ সাহায্যকারী ছিল।

মোল্লা উমারের নিজ বার্তাবাহক তালেবান কমান্ডার মোল্লা দাদুল্লাহকে আল জাজিরার প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংবাদিক জায়দান জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনাদের এবং আল-কায়েদার মধ্যে কীরকম সম্পর্ক এবং বর্তমানে তাদের সাথে তালেবানের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা?"

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, *"সমগ্র দুনিয়া জানে আমরা আল-কায়েদার মুজাহিদদের জন্য আমাদের শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করেছি। এটা ছিল আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব। সুতরাং আমরা কীভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারি? আমরা এবং তারা তো একই ময়দানের সৈনিক। আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র, আমাদের শত্রুও একই এবং আমরা অভিন্নই থাকবো, যতক্ষণ না বিজয় অথবা শাহাদাত আসে বিইযনিল্লাহ। আমাদের লক্ষ্য জিহাদ জারি রাখা। আমাদের দ্বীন এক।আমাদের লক্ষ্য এক। আমাদের শত্রুও এক ও অভিন্ন। ইনশাআল্লাহ! আমরা আমাদের ভাই আল-কায়েদার সাথেই থাকবো। যতক্ষণ না আমরা আমাদের ক্রুসেডার শত্রুকে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি।"* [The return of black flags, মোল্লা দাদুল্লাহ]

পরবর্তীতে এই বক্তব্য আল-কায়েদার বর্তমান আমির ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরিও এক অডিও বক্তব্যে এনে আল-কায়েদা আর তালেবানের সম্পর্কের গভীরতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। মোটকথা হলো, এখানে তালেবানের সাথে আল-কায়েদার যেমন কৌশলপূর্ণ আচরণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তা কখনোই সেরকম কিছু ছিল না।

পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান সীমান্তে ৭টি গোত্রশাসিত (স্বায়ত্বশাসিত) এলাকা রয়েছে, যেগুলোকে এজেন্সি বলা হয়ঃ

১. খাইবার এজেন্সি
২. ওরাকযাই এজেন্সি
৩. কুররাম এজেন্সি
৪. মোহমান্দ এজেন্সি
৫. বাজাউর এজেন্সি
৬. দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এজেন্সি
৭. উত্তর ওয়াজিরিস্তান এজেন্সি

পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খান শহর দিয়ে এই এলাকাগুলোর দক্ষিণ-পশ্চিমের বালুচিস্তান প্রদেশের সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, যার সীমানা ঘেঁষেই আফগানিস্তানের হেলমান্দ এবং কান্দাহার প্রদেশ। এই এলাকাগুলো ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান জাতীয় প্রতিরোধের কেন্দ্র। এইসব এলাকার বাসিন্দাদের বেশিরভাগই জাতিগতভাবে ছিল পশতুন, বাদবাকিরা বেলুচ। আবহমানকাল ধরেই পশতুন এবং বেলুচরা জাতিগতভাবে সাহসী, যোদ্ধা প্রকৃতির হয়ে থাকে। তালেবান শাসনামলে এই পশতুন এবং বেলুচদের অনেকেই তালেবানের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ ও কাজ করেছিল। তাই আফগানিস্তানের সাময়িক পরাজয়ের পর পিছু হটা তালেবান ও আল-কায়েদার সেনাদের জন্য প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকাকে একটি নিরাপদ আবাসস্থলে পরিণত করায় তাদের কোনোই আপত্তি ছিল না।

আল-কায়েদার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি বিশ্রামের স্থান — একটি নিরাপদ ঘাঁটি — কিন্তু নিরাপদ আস্তানায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চাইছিল এই দুর্গম এলাকাকে প্রাকৃতিক দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করে ধীরে ধীরে সমগ্র অঞ্চলে যুদ্ধাবস্থা তৈরি করতে। এর ফলে আল-কায়েদা একদিকে আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তিকে আফগানিস্তানের গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী প্রাকৃতিক এলাকায় আটকে ফেলতে পারবে, এবং অন্যদিকে আল-কায়েদা তার কার্যক্রমকে উত্তরে মধ্যএশিয়া থেকে পূর্বে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারবে।

সীমান্ত পার হওয়ার সময় পাকিস্তানে জিহাদ শুরু করার কোনো পরিকল্পনা আল-কায়েদার ছিল না। কিন্তু আফগান যুদ্ধে আমেরিকাকে দেওয়া পাকিস্তানের সক্রিয়

সমর্থন এক দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করে। যদিও পাকিস্তান দ্বিধাগ্রস্তভাবে এবং আমেরিকার চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান মুসলিমদের বিরুদ্ধে (কাফির) আমেরিকা জোটের সাথেই যোগ দেয়। এর ফলে পাকিস্তানকে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের সামরিক জোটের অংশ এবং শত্রু বিবেচনা করা ছাড়া আল-কায়েদার কোনো উপায় ছিল না। আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, তাদের সামনে পাকিস্তানে সামরিক অপারেশন বিস্তৃত করার কোনো বিকল্প রইলো না।

২০০২ থেকেই আল-কায়েদা পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকাকে কেন্দ্র করে তাদের স্ট্র্যাটেজি সাজাতে মনোযোগী হয়। পাকিস্তানের এই দুর্গম এলাকা হবে আল-কায়েদার ঘাঁটি — এমনই এক প্রাকৃতিক দুর্গ যা থেকে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে তাদের বৈশ্বিক যুদ্ধের আদর্শ। আফগানিস্তানে আমেরিকার প্রতি পাকিস্তানি সহায়তা বন্ধ করার জন্য আল-কায়েদা পাকিস্তানের ভেতর ছোট ছোট কিছু অপারেশন চালায়। কিন্তু পাকিস্তানকে খোলাখুলিভাবে সম্মুখ যুদ্ধের প্রতিপক্ষ তৈরি করা থেকে তারা বিরত থেকেছিল।

গোত্রীয় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও প্রস্তুতির পর ২০০৬-এ তালেবানের বসন্তকালীন আক্রমণের সময় আল-কায়েদা আবার আফগানিস্তানে ফিরে যায়। আর ২০০১-এর আমেরিকান আগ্রাসন ও সাময়িক বিজয়ের পর, ২০০৬ সালে আফগানিস্তানে তালেবানের প্রত্যাবর্তন এবং আল-কায়েদার জন্য নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

২০০৭-এ আরেকবার, অল্প সময়ের জন্য আল-কায়েদা গোত্রীয় এলাকায় ফিরে আসে; ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য। ফিরে আসে নিজেদের দুর্গে। কিন্তু এইবার তাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে একটি যুদ্ধের ময়দান খোলা, কেননা আফগানিস্তানে আমেরিকার কর্মকান্ডের প্রতি পাকিস্তানের আনুগত্য তখন একেবারেই স্পষ্ট। আল-কায়েদা পাকিস্তানে বেশ কিছু বড় ধরনের অপারেশন চালায়। তারপর আল-কায়েদা আবারও ফিরে যায় গোত্রীয় এলাকায়, এবং আল-কায়েদার আদর্শে অনুপ্রাণিত গোত্রীয় নেতাদেরকে 'রক্তের ভাই' বানানোর এক প্রক্রিয়া শুরু করে।

এই প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই ২০০৭-০৮-এর দিকে জন্ম হয় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের (TTP)। আল-কায়েদা নেতৃত্ব ও কমান্ডারদের একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করে, এবং তাদেরকে কাজে লাগিয়ে একটি 'ছায়া সেনাবাহিনী' - লস্কর আল-যিল - গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য ছিল একদিকে বিশ্বব্যাপী মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর মধ্যে

সমন্বয় সাধন করা, বিশেষ করে কাশ্মীর ও ভারতে, অন্যদিকে ফিলিস্তিন, সোমালিয়া এবং ইরাকের ইবনুল বালাদদের (স্ব স্ব জমিনের সন্তানদের) কাজে লাগিয়ে সেইসব অঞ্চলে যুদ্ধের ময়দান তৈরি করা। কারণ আল-কায়েদার কৌশল এবং আদর্শ ততদিনে একীভূত হয়েছিল এবং ২৬/১১-এর মুম্বাই আক্রমণ ও চেচেন মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলন সমন্বিতভাবে এমন এক পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করেছিল, যার ফলস্বরূপ আল-কায়েদা ভারতে নতুন করে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে।

সারা দুনিয়া এখন (২০১১, এই বই লেখার সময়কাল) আফগান যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত এবং ২৬/১১-এর ঘটনাকে দেখছে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে। কিন্তু এই বই বাক্সবন্দি এমন ধারণার বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে চায়। ৯/১১-এর পরবর্তীতে ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আলাদা একটি ছবি ফুটিয়ে তোলে। সেই বিশ্লেষণ ও ছবির আলোকেই বইটি একটি উপসংহার টানতে চায়। আর তা হলো — পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বিস্তৃত করার জন্য আল-কায়েদার উদ্দেশ্য হলো ভারতকে যুদ্ধের ময়দান বানানো, তারপর সেই যুদ্ধকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত করা, যাতে শেষ জমানার চূড়ান্ত যুদ্ধের মাধ্যমে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

ধ্বংস ও হিজরত

৯/১১-এর পরপরই উসামা বিন লাদেন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে তাঁর বার্তা প্রচার করতে শুরু করেন, একইসাথে বন্দিত্ব থেকে বাঁচতে এক গোপন স্থান থেকে আরেক গোপন স্থানে অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকেন। ৭ই অক্টোবর ২০০১-এ আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের আগে থেকেই আল-কায়েদা এই পর্বের কৌশলের বাস্তবায়ন শুরু করেছিল। এই সময় পাকিস্তানে থাকা বিন লাদেনের প্রতিনিধি দলগুলো নিজেদের আগের নেটওয়ার্কগুলো ব্যবহার করে নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে থাকে। আল-কায়েদার যোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের স্থানান্তরের জন্য তারা পাকিস্তানে বিভিন্ন বাড়ি ভাড়া করে।

আবু যুবায়দা নামের একজন ফিলিস্তিনিকে ১ লক্ষ ডলারসহ লাহোরে পাঠানো হয় লস্করে তইয়্যেবার (LeT) প্রধান - হাফিয মুহাম্মাদ সাঈদের সাথে দেখা করার জন্য। যাতে করে মহিলা ও শিশুদের জন্য বৈধ পাসপোর্ট ও তাদের ট্রানজিটের ব্যবস্থা করা হয়। সাঈদকে এই স্পর্শকাতর কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, কারণ সে ছিল উসামা বিন লাদেন এবং আল-কায়েদা নেতৃত্বের পুরোনো আস্থাভাজন।

১৯৮৮-তে বিন লাদেনের অন্যতম ডেপুটি, সৌদি নাগরিক আবু আবদুর রহমান সারিহী আফগানিস্তানের 'কুনার' উপত্যকায় একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাকিস্তানের বাজাউর এজেন্সি থেকে লোক রিক্রুট করা। সারিহী ছিলেন জাকিউর রহমান লাখভীর বেয়াই, যিনি এখন (বই লিখার সময়, ২০০১-এ) লস্করে তইয়্যেবার কমান্ডার-ইন-চীফ এবং ২৬ নভেম্বর, ২০০৮-এ মুম্বাই হামলার প্রধান সন্দেহভাজন। (আমেরিকার ট্রেজারি এবং সিকিউরিটি কাউন্সিল তাকে লস্করের অপারেশনের প্রধান বলে দাবি করে)

ট্রেইনিং ক্যাম্পের জন্য অর্থ দিয়েছিলেন বিন লাদেন। আর সংস্থাটি কুনার উপত্যকা ও বাজাউর এজেন্সিতে বেশ প্রসার লাভ করেছিল। শত শত সালাফি ঘরানার পাকিস্তানি যুবক তাদের আফগান ভাইদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে সংগঠনটিতে যোগ দেয়। মোদ্দাকথা হলো, ১৯৮৯ সালেই বিন লাদেন তাঁর বৈশ্বিক প্রতিরোধ আন্দোলনের গন্তব্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন।

১৯৯০-এ ইরাক কুয়েতে আক্রমণ করে বসে। উসামা বিন লাদেন তখন সৌদি আরবকে আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার পরিবর্তে তার অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেবীদের কাজে লাগানোর প্রস্তাব দেয়। এসময় বিন লাদেন তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা যোদ্ধাদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের বিবরণ সৌদিতে পাঠান। সেই বিবরণিতে আফগানিস্তানের কুনার উপত্যকায় সারিহীর সেট-আপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই দিনগুলোতে কুনার উপত্যকায় লস্করে তইয়্যেবার জন্ম হয়েছিল সারিহীর সেট-আপের একটি শাখা হিসেবে, যার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হয়েছিল বিন লাদেনের হাতে।

এর কিছুদিন পরই আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে। আর তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের আগেই কুয়েতে ও সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই উপত্যকায় সালাফি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী একটি ইসলামি ইমারত গঠন করা হয়।

(৯/১১-এর পর পর) ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আমেরিকা ও তার মিত্ররা আফগানিস্তান আক্রমণ করে। টানা দুই মাসব্যাপী এক-পাক্ষিক যুদ্ধ চলে, এসময় আল-কায়েদা এবং তালেবানের সম্পূর্ণ নেতৃত্বই পিছু হটে পাকিস্তানে চলে আসে। তবে আমেরিকা যেমনটা আশা করেছিল - যুদ্ধের পরিসমাপ্তি - সেটা আদৌ তেমনটা ছিল না, বরং তা ছিল নতুন এক বৈশ্বিক সংঘাতের সূচনা।

৯/১১-এর আক্রমণ পশ্চিমা বিশ্ব ও তার স্বার্থের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জিহাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর উৎস ছিল মুসলিমদের সেই দলটি যারা আফগানিস্তানের মিলিটারি ক্যাম্পে দুই দশক আগে মিলিত হয়েছিল। সবার আগে এসেছিল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মিশরীয় যুবকেরা এবং পরবর্তীতে তাদের সাথে যোগ দেয় আরব বিশ্বের বিভিন্ন সরকার বিরোধী আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলনগুলোর সদস্যরা। এটাই ছিল আন্দোলনের সেই নিউক্লিয়াস, যা আফগানিস্তানে কমিউনিজমকে পরাজিত করার মাধ্যমে বিশাল সোভিয়েত সম্রাজ্যের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

কিন্তু শক্তিশালী আমেরিকান যুদ্ধযন্ত্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের সম্মিলিত শক্তির মোকাবেলা করা ছিল একটি ভিন্ন বিষয়। আমেরিকা এবং তার মিত্রদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ ছিল মারাত্মক, অধিকাংশ যোদ্ধাই এতে হতাহত হয়েছিল। দুই মাসের যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন, যেখানে আমেরিকান বিমান হামলায় হাজারো আল-কায়েদা সেনা এবং নিরীহ বেসামরিক জনগণ নিহত হয়েছিল। ২০০১ সালের

ডিসেম্বর মাসে, দু'মাস মেয়াদী সেই যুদ্ধের সমাপ্তির পর, ধারণা করা হয় যে কমপক্ষে তিন হাজার আল-কায়েদা যোদ্ধা তাতে নিহত হয়েছিল। এছাড়া অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিল।[15]

যখন বেঁচে ফেরা যোদ্ধারা পাকিস্তানের গোত্রপ্রধান এলাকা বাজাউর, মোহমান্দ, উত্তর এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পৌঁছে, ততদিনে তাদের সংখ্যা কমে মাত্র কয়েক হাজারে এসে ঠেকেছিল। আমেরিকান আগ্রাসনের পর ঠিক কতো সংখ্যক বিদেশি যোদ্ধা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যায় তার কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকলেও গড়-পড়তা অনুমান যে, সর্বসাকুল্যে প্রায় ১০,০০০ উজবেক, চেচেন, উইঘুর, চাইনিজ এবং আরব যোদ্ধা পাকিস্তানে এসে পৌঁছে। এদের মধ্যে সত্যিকারের আল-কায়েদা সদস্য ছিল ২,০০০-এরও কম।

যেখানে অবশিষ্ট আফগান প্রতিরোধ যোদ্ধারা এমন করুণ অবস্থায় ছিল, সেখানে এমন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে — আমেরিকান সম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো অবস্থাই তো আল-কায়েদার ছিল না। কিন্তু বাস্তবে আল-কায়েদার ক্ষতির পরিমাণ যতটা আশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম ছিল, কারণ নেতৃস্থানীয় আল-কায়েদা সদস্যরা আগ্রাসন চলাকালে যুদ্ধ করেনি বললেই চলে। শুধু ব্যাতিক্রম ছিল তোরা-বোরার অবরোধের মতো পরিস্থিতি, যেখানে আল-কায়েদার সদস্যরা আটকা পড়েছিল এবং যুদ্ধ ছাড়া তাদের অন্য কোনোই বিকল্প ছিল না। শুরু থেকেই আল-কায়েদার কৌশল ছিল — যখন আমেরিকান সেনাবাহিনী সমগ্র আফগানে ছড়িয়ে পড়বে — সেই পরবর্তী ধাপের লড়াইয়ে জন্য শক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করা। আর পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা থেকেই আল-কায়েদা তার শত্রুর শক্তি নিঃশেষ করার যুদ্ধ শুরু করে।

---

15. এদের বেশিরভাগই শহীদ হন কিল্লা-ই-জঙ্গিতে। Northern Alliance-এর সঙ্গে তালেবানের কমান্ডার-ইন-চীফ মোল্লা ফজল আখন্দের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তানে আগত মুহাজির (বিদেশি) যোদ্ধাদের স্বসম্মানে নিজের দেশে ফেরত পাঠানো। কিন্তু Northern Alliance-এর শিয়া কমান্ডার জেনারেল দাউদ তাঁদেরকে কিল্লা-ই-জঙ্গিতে আটক করে। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার ফল হিসেবে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমেরিকার বিমান আক্রমণের সহায়তায় তাঁদের উপর গণহত্যা চালানো হয়। মারাত্মক আহতদেরকে পরে কন্টেইনারে ভরে শ্বাসরোধ করে হত্যা ও বহু মুজাহিদকে গ্রেফতার করে গুয়ান্তানামো ও আফগানিস্তানের শিবারঘান কারাগারে বন্দী করা হয়। এই ব্যাপারে একটি ডকুমেন্টারি নির্মিত হয়েছিল।যাই হোক, নিহত ও গ্রেপ্তারকৃতরা সবাই আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। আবার সবাই আরবও ছিলেন না। বিভিন্ন দেশের মুহাজির যোদ্ধারা সেখানে ছিলেন। যদিও লেখক সবাইকে আল-কায়েদার সদস্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আগুন নিয়ে খেলা !

আফগানিস্তানে তালেবানের পতনের কিছুদিনের মধ্যেই দৃশ্যত আল-কায়েদার মূল স্ট্র্যাটেজিক আঙ্গিনা পাকিস্তানে তাদের নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়ে। ২০০২-এর মার্চে ধরা পড়েন শীর্ষস্থানীয় আল-কায়েদা কমান্ডার আবু যুবায়দা। এর কয়েক মাস পর, ২০০২-এর ১১ সেপ্টেম্বর আটক করা হয় রামযি বিন আস-সিহবকে। বিশেষ করে আবু যুবায়দার গ্রেপ্তার ছিল আল-কায়েদার পাকিস্তান-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার দুর্বলতার প্রতিফলন। আবু যুবায়দাকে লস্করে তইয়্যেবার (LeT) প্রধান হাফিয সাঈদের সাথে যোগাযোগ করে আল-কায়েদা সদস্যদের পরিবারের নিরাপদে অন্য কোনো দেশে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এশিয়ান টাইমস অনলাইনের ২৭ জানুয়ারি ২০০৬ সংখ্যায় আমি এ ঘটনা উল্লেখ করেছিলাম।

লস্করে তইয়্যেবার সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ২০০১-এ আমেরিকার আগ্রাসনের পর আরব মুজাহিদ ও তাদের পরিবারের দেখভালের জন্য ১ লক্ষ আমেরিকান ডলার বরাদ্দ করা হয়। আফগানিস্তান থেকে আসা আরবরা পাকিস্তানের সংগঠনগুলোর মধ্যে কেবল লস্করে তইয়্যেবার সাথেই সরাসরি কাজ করতো। এর পেছনে উভয়েরই সালাফি ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াও, আরও বেশ কিছু কারণ ছিল। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আশির দশকে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধের সময় তৈরি হওয়া বন্ধন (যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। তাই কাবুল এবং কান্দাহারের পতনের পর লস্করে তইয়্যেবা অস্থায়ীভাবে বহু আরব পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করেছিল।

পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ ছিল পাকিস্তান ত্যাগ করার জন্য জাল পাসপোর্ট ও বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা করা। কিন্তু অর্থ এবং হাফিয সাঈদের পূর্ণ সহায়তা মিলছিল না। ফয়সালাবাদে লস্করে তইয়্যেবার একটি সেইফ হাউজে আত্মগোপনে থাকা আবু যুবায়দা যখন তার সাথে কথা বলার জন্য লাহোর যায়, হাফিয সাঈদ অভিযোগ করে যে, আরবদের সাহায্য করার জন্য তার কাছে যথেষ্ট অর্থ নেই। ক্ষুব্ধ আবু যুবায়দা সেইফ হাউজে ফিরে আসে। এই ঘটনার কিছুদিন পরই বাড়িটিতে রেইড দেওয়া হয় এবং আবু যুবায়দা গ্রেপ্তার হয়ে যান।

এই ঘটনাগুলো বর্তমানে জিহাদি মিথোলজি তথা লোককথায় পরিণত হয়েছে।

যাই হোক, নতুন একটি সোর্স থেকে চমকপ্রদ কিছু তথ্য জানা গিয়েছিল। এই সোর্স প্রথমে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করে লস্করে যোগ দেন, কিন্তু তার কিছুদিন পরই লস্করের সততার ব্যাপারে তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায় এবং তিনি ব্যাবসার জন্য আফ্রিকা চলে যান। আমার সোর্সের তথ্য অনুযায়ী, আবু যুবায়দার প্রধান দেহরক্ষীর নাম ছিল আবু জাবরান। আবু যুবায়দার সাথে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আমার সোর্স আরও জানায়, "সব যুক্তি তো এটাই বলে যে, আবু জাবরানের এখন কিউবার গুয়ান্তানামো বে'র আমেরিকান মিলিটারি বেস ক্যাম্প এক্স-রে তে বন্দি থাকার কথা। কিন্তু এখন সে লস্করে তইয়্যেবার ১ নম্বর ব্যক্তি, ভারত শাসিত কাশ্মীরের লস্করে তইয়্যেবার কমান্ডার-ইন-চীফ জাকিউর রেহমান লাখভির ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে।"

এশিয়ান টাইমস অনলাইনের তদন্তে জানা গেছে, আবু যুবায়দার সাথে গ্রেপ্তার হওয়ার মাত্র ৮দিন পর FBI[16] আবু জাবরানকে ছেড়ে দেয়। মুক্তি পাওয়া মাত্রই তাকে জাকিউর রেহমানের উপদেষ্টা হিসেবে প্রমোশান দেওয়া হয়। লস্করে তইয়্যেবার ভেতর আবু জাবরান পরিচিত 'জনাব জাবরান চাচা' নামে।

জেইন মেয়ার ২০০৮-এ প্রকাশিত তার বই 'The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideal' এ লিখেছেন, একজন CIA কর্মকর্তা তাকে জানিয়েছিল - আবু যুবায়দার অবস্থান জানার জন্য আমেরিকা পাকিস্তান সরকারকে ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। আর পাকিস্তান সেই অর্থের কিছু অংশ একজন ইনফর্মারকে (তথ্যদাতা) আবু যুবায়দার অবস্থান জানার জন্য ঘুষ হিসেবে দিয়েছিল। আবু যুবায়দার গ্রেপ্তার আরও বেশ কয়েকজন আল-কায়েদা সদস্যের গ্রেপ্তারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কয়েক মাসের মধ্যে আল-কায়েদার নেটওয়ার্ক একেবারে এলোমেলো হয়ে যায় — এমনকি তা অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায়।

২০০১ সালের শেষ দিকে আফগানিস্তানে তালেবানের পতনের পর থেকেই ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে পাকিস্তান প্রচন্ড চাপে ছিল। বাড়তে থাকা চাপের মুখে, ২০০২-এর ২২ জুন আফগান বর্ডারের নিকটবর্তী দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের আজম ওয়ারসাকে তালেবানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বড় ধরনের অপারেশন পরিচালনা করে।

16. Federal Bureau of Investigation বা সংক্ষেপে FBI আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

আজম ওয়ারসাকের অপারেশন ছিল আল-কায়েদার ওপর পাকিস্তানের প্রথম আক্রমণ। আক্রমণে জড়িত ছিল ফ্রন্টিয়ার কর্পসের প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং ওয়াজিরিস্তান স্কাউট দল। অপারেশনে নিহতের মোট সংখ্যা ছিল ১৭, যার মধ্যে ১১ জন পাকিস্তান নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং ৬ চেচেন ও উজবেক মুজাহিদ। বলা হয়ে থাকে, ৫০-এরও বেশি বিদেশি যোদ্ধা এই আক্রমণের সময় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার কারণ ছিল, পরাজিত তালেবান ও তাদের বিদেশি (যোদ্ধা) বন্ধুদের প্রতি পাকিস্তানের গোত্রগুলোর সহানুভূতি। আমেরিকার আফগান আগ্রাসন তাদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী পলাতক আল-কায়েদা সসদ্যদের ধরবার জন্য চেষ্টা শুরু করে, গোত্রগুলো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চলে যায়। তাদের ক্ষোভ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল - যখন দীর্ঘদিন ধরে সরকারবান্ধব বলে পরিচিত মেহসুদ গোত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মোকাবেলা করে বিদেশি যোদ্ধাদের নিরাপদে পালানোর রাস্তা করে দেয়।

ওয়াজির নেতারা এবং অন্যান্য গোত্রের মুরুব্বিরা গোত্রগুলোর প্রতিশোধের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছিল। তারা আমেরিকার স্বার্থে ও নির্দেশনায় চালানো এই অপারেশনের নিন্দা করে ঘোষণা করলো - যদি গোত্রীয় এলাকায় আবারও এই ধরনের অপারেশন চালানো হয়, তবে এটা সকল পশতুন গোত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে ধরা হবে।

২০০২-এর ২৭ জুন, বিগ্রেডিয়ার শওকত হায়াত এবং কর্নেল সাঈদ খানসহ বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অফিসার গোত্রীয়দের 'জিরগা'-এর (অর্থাৎ পরিষদের) সাথে দেখা করে। দুই মিলিটারি অফিসার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভবিষ্যতে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে, গোত্রদের নিজেদের মধ্যেই সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়া হবে। তারা শপথ করে যে, সেনাবাহিনী শুধু তখনই লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, যখন গোত্রগুলো সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে। কিন্তু এমন চুক্তি সত্ত্বেও পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্স এবং স্থানীয় প্রশাসন ছোট ছোট অপারেশন চালিয়ে যেতে থাকে, যেগুলোতে বিদেশিদের গ্রেপ্তার করা হয়। পশতুন গোত্রগুলো সেইসব ঘটনার তীব্র আপত্তি জানালেও, যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিল, সেটা নিয়ে তারা ততটা ঝামেলা করেনি।

কিন্তু ২০০৩-এর ২রা অক্টোবর, কোনো ধরনের সতর্কবার্তা ছাড়াই আঙ্গোরাড্ডার কাছাকাছি বাগহার গ্রামে বিমান, ২৫০০ কমান্ডো আর তাদের সাপোর্টে ১২টি হেলিকপ্টার

গানশিপ নিয়ে আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সরাসরিই চুক্তি ভঙ্গ করে বসে। স্থানীয় অধিবাসীদের বর্ণনা অনুযায়ী, বেশ কিছু হেলিকপ্টার গানশিপ এসেছিল বর্ডারের ওপারে অবস্থিত, আফগানিস্তানে অবস্থিত মাচদাদ কট (Machdad Kot) আমেরিকান এয়ারবেইস থেকে। প্রতক্ষ্যদর্শীদের রিপোর্টে জানা যায়, এই আক্রমণে ৩১ পাকিস্তানি সেনা এবং ১৩ বিদেশি যোদ্ধা এবং আদিবাসী নিহত হয়। আর বিদেশি যোদ্ধাদের একটি বড় অংশ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এই অপারেশনটি পরিচালনা করেছিল মেজর জেনারেল ফয়সাল আলভী এবং এতে আবদুর রহমান কেনেডিসহ বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল আল-কায়েদা কমান্ডার নিহত হয়। ২০০৮ সালে আল-কায়েদা এই আক্রমণের প্রতিশোধ নেয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর হারুণ আশিককে দিয়ে মেজর জেনারেল আলভীকে গুলি করে হত্যার মাধ্যমে। (পরবর্তীতে এই ঘটনা এবং মেজর হারুণকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

পরিস্থিতি আল-কায়েদাকে বাধ্য করলো এক নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করতে। আর এর মাধ্যমেই আরব্য রজনীর নতুন অধ্যায়ের আরেক অন্যতম চরিত্রের আবির্ভাব ঘটলো।

২০০৩-এর অক্টোবরের সেই অপারেশন আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দকে দ্রুত একটি ফয়সালামূলক সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করে। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করে - পুরোনো তালেবান সদস্যরা এখন কেবল আল-কায়েদা সদস্যদের থাকার জায়গা আর নিরাপত্তার দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। জালালউদ্দিন হাক্কানির মতো বর্ষীয়ান কমান্ডারেরা পাকিস্তানি কানেকশনের কারণেই বাঁচতে পেরেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো অবস্থান তাঁদের ছিল না। তাই আল-কায়েদা এমন নতুন সদস্যের খোঁজ শুরু করলো, পাকিস্তানের মিলিটারির সাথে যাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। আল-কায়েদা এমনই বেশ কয়েকজন তরুণ গোত্রীয় নেতার সাথে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিল। আর শেষ পর্যন্ত আল-কায়েদার অভিজ্ঞ চোখ 'নেক মুহাম্মাদ'-কে সেই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হিসেবে বেছে নিল।

এটাই ছিল নিউ-তালেবানের সূচনা – দক্ষিণ এশিয়ান যুবকদের এমন এক নতুন প্রজন্ম, যাদের জন্মই হয়েছে আল-কায়েদার আদর্শ ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে।

নয়া প্রজন্ম, নয়া কৌশল

নেক মুহাম্মাদ ছিল দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ‘ওয়াজির’ গোত্রের এক স্বল্পশিক্ষিত গরিব যুবক। বয়স বিশের কোটার মাঝামাঝি। আল-কায়েদার নেতারা তার মধ্যে একজন সহজাত যোদ্ধা খুঁজে পায়। তাকে অর্থ এবং অস্ত্র দেওয়া হয়। আগে পাহাড়ের পাদদেশে দিয়ে তাদের হেডকোয়ার্টার ‘ওয়ানা’-তে চলাচলের জন্য গণপরিবহণ ব্যবহার করা নেক এবং তাঁর গোত্রীয় বন্ধুরা হঠাৎ করেই আধুনিক SUV জিপ ব্যবহার করা শুরু করলো। সবসময়ই তাঁর সাথে সশস্ত্র প্রহরী থাকতো। অস্ত্র, অর্থ আর লোকবলই হলো পশতুন গোত্রীয় সমাজে নেতৃত্বের পরিচায়ক। এর সব কিছু থাকায় নেক মুহাম্মাদই দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রকৃত নেতা বলে বিবেচিত হতো।

বয়স্ক গোত্র প্রধানদের পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। পুরোনো নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নেক মুহাম্মাদ কিশোর এবং সদ্য যুবকদের সংগঠিত করা শুরু করলো। কয়েক মাসের ব্যবধানে শতাব্দী পুরোনো গোত্রীয় কাঠামো একেবারেই উবে গেল। সব সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করলো যুবকরাই। গোত্রপ্রধান এবং বর্ষীয়ান ইমামরা পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। ঐতিহ্যবাহী গোত্রীয় রীতিনীতি বলতে গেলে রাতারাতিই পাল্টে গেল। তরুণ অস্ত্রধারীরা কোনোরকম বিরুদ্ধাচারণকারীদের উপস্থিতিও সহ্য করতে রাজি ছিল না। ফলে পুরোনো গোত্রপ্রধানদের বেশিরভাগই মিইয়ে গেল, আবার অনেকে শহরে পালিয়ে গেল। এভাবেই গোত্রীয় নেতৃত্ব চলে আসলো নতুন এক প্রজন্মের হাতে, যারা ছিল আল-কায়েদার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল এসব ঘটনা সাময়িক ঝামেলা মাত্র। সেনাবাহিনীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি প্রয়োগই আল-কায়েদার আদর্শের নামগন্ধ মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট। ২০০৪-এ CIA[17] প্রিডেটর ড্রোন হামলা করে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে নেক মুহাম্মাদকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর পাকিস্তানি সরকার ভেবেছিল গোত্রগুলোর ওপর আল-কায়েদার প্রভাব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমেরিকা এবং পাকিস্তান উভয়েই আল-কায়েদার ক্ষমতাকে খাট করে দেখেছিল।

---

17. Central Intelligence Agency বা সংক্ষেপে CIA হলো আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন একটি বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা, যার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং উচ্চপদস্থ নীতিনির্ধারকদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করা।

আল-কায়েদা কখনোই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। আল-কায়েদা নিজের জন্য একটি পরিবর্তনশীল কৌশল তৈরি করেছিল। নেক মুহাম্মাদের ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বের আড়ালে আল-কায়েদা এমন এক দল তরুণকে গড়ে তুলেছিল, যারা কিনা আমেরিকা-ন্যাটো বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের পাশাপাশি পাকিস্তানি চাপকেও মোকাবেলা করতেও সক্ষম ছিল।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে 'জুনদুল্লাহ' আর 'জাইশুল ক্বিবা আল-জিহাদ আস-সিরি আল-আলামী' - এই যমজ শক্তি আল-কায়েদার অধীনে ছিল। ২০০৩-০৪ সালে আল-কায়েদার হাই কমান্ডের নির্দেশনায় এই দুটো দল গঠিত হয়েছিল। জাইশুল ক্বিবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অপারেশন চালানোর। আফগানিস্তানও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে জুনদুল্লাহর কাজ ছিল পাকিস্তানের ভেতরে আমেরিকান ও অন্যান্য পশ্চিমা টার্গেটে আঘাত করা, এবং আমেরিকার পক্ষে পাকিস্তানের সহায়তা বন্ধে অপারেশন চালানো। এই জুনদুল্লাহ একই নামের ইরানি সংগঠন থেকে ভিন্ন।

মিলিটারি অপারেশনের পাশাপাশি জনসাধারণের মাঝে আল-কায়েদার মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই দলগুলো তৈরি করা হয়েছিল। পাশাপাশি এগুলো আল-কায়েদার শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। এই ছিল ভবিষ্যতের জন্য আল-কায়েদার বিনিয়োগ। এই দলগুলো বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণাও চালাতো, যেগুলোর মধ্যে ছিল ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং বিভিন্ন প্রকাশনা। 'উম্মাত' নামে তাদের একটি স্টুডিও ছিল, যা আল-কায়েদার মিডিয়া উইং 'আস-সাহাব'-এর আদলে কাজ করতো।

২০০৪-এর শেষের দিকে আল-কায়েদা উসামা বিন লাদেনের ২০০২ থেকে ২০০৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কার বিভিন্ন বক্তব্য সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক সিডি প্রকাশ করে। এই সিডিগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচে। আগেকার ছায়াবৃত রহস্যময় ভাবমূর্তি ঝেড়ে ফেলে মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের দখলদার আমেরিকা এবং বিদেশি শত্রুদের বিরুদ্ধে গণজিহাদের দিকে আহ্বান করার পথে, এটাই ছিল আল-কায়েদার আনুষ্ঠানিক প্রথম পদক্ষেপ। সিডির বক্তব্যগুলোতে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের শ্রোতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান করা হয়। ২০০২-এর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি জনগণ। ২০০৩-এ আমেরিকার উদ্দেশ্যে, ২০০৪-এ ইউরোপ এবং সবশেষে ২০০৪-এর ডিসেম্বরের বার্তায় আরব উপদ্বীপের (বিশেষ করে সৌদি আরব) জনগণকে উদ্দেশ্য করে বার্তা প্রদান করা হয়।

সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ এবং হৃদয়স্পর্শী ছিল আরব উপদ্বীপের জনগণকে উদ্দেশ্য করে উসামা বিন লাদেনের ২০০৪-এর ভিডিও বার্তা। সেই বার্তায় বিন লাদেন ব্যাখ্যা করে কেন সৌদি শাসকগোষ্ঠীকে আল-কায়েদা টার্গেট করছে। দুর্নীতি, অত্যাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সর্বশেষে প্রকৃত ইসলামি আকিদাহ থেকে বিচ্যুতিসহ বেশ কিছু কারণ বিন লাদেন উল্লেখ করেছিলেন। সেই সিডিতে ইরাক যুদ্ধ এবং ধ্বংসযজ্ঞের ভয়ঙ্কর সব ফুটেজ ও ছবি ছিল। এছাড়াও তাতে ইরাকি প্রতিরোধ যুদ্ধকে সম্মান জানানো হয়েছিল। আল-কায়েদার আগেকার মিডিয়া রিলিজের তুলনায় এই ভিডিওটি দেখে মনে হচ্ছিল - আধুনিক সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ স্টুডিওতে পেশাদার ভিডিও এডিটরদের তত্ত্বাবধানে বানানো হয়েছে। অডিও ও ভিজ্যুয়াল ইফেক্টগুলো ছিল পরিছন্ন। অনারব শ্রোতাদের জন্য ইংরেজি সাবটাইটেল দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া, আলাদাভাবে ছিল উর্দু, ফার্সি, ইংরেজী, পশতু এবং আরবিতে মূল অডিওর ট্রান্সক্রিপ্টও দেওয়া হয়েছিল।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল, আল-কায়েদা আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং তারা এখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুসলিম বিশ্বে নিজেদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। পার্থক্য হলো, আগে আল-কায়েদা তাদের প্রচার-প্রচারণায় মুসলিমদের আফগান জিহাদে যুক্ত হওয়ার আহ্বান করতো, কিন্তু ২০০৫ থেকে আল-কায়েদার বক্তব্যগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণকে একটি বৈশ্বিক প্রতিরোধে সংযুক্ত করা। তাই সিডির জন্য নির্ধারিত বক্তব্যগুলোতে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানানো বক্তব্যই ছিল না। বরং আল-কায়েদার পদক্ষেপগুলোর গভীর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং আত্মপক্ষসমর্থন ছিল। সাধারণত আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনগুলো তাদের কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য এমন বিতর্কে লিপ্ত হয় না। নতুনদের আকৃষ্ট করতে সাধারণত তারা বাগড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন একটি দল যখন মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের চিন্তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তখন কোনো এক ‘বৃহত্তর উদ্দেশ্য’ অর্জনের লক্ষ্যে মূলধারার কর্মকান্ড — যেমন গণসংহতি ও গণকর্মসূচির সাথে তাদের সংযুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ পায়।

২০০৪-০৫ সালে পাকিস্তানে আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ঠিক এটাই ছিল। জুনদুল্লাহর গঠনের একটি উদ্দেশ্য ছিল মিডিয়ার মাধ্যমে, ছবি আর ভিডিওর মাধ্যমে পাকিস্তানি যুবকদেরকে উদ্বেলিত করা, এবং তাদের আল-কায়েদায় যোগ দেওয়ার একটি পথ তৈরি করা। এটাই ছিল নতুন প্রজন্মের মুজাহিদ তৈরির মূল উপকরণ। আবার জুনদুল্লাহ গঠনের পেছনে কেবল এই একটিমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল না। আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল - এমন একদল পাকিস্তানি মুজাহিদ তৈরি করা, যারা প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান ও

আফগানিস্তানে কাজ করবে। আর তারপর আন্তর্জাতিক অপারেশনের দিকে মনোযোগ দেবে, যা বাস্তবায়িত হবে জাইশুল জিহাদ আস-সিরি আল-আলামীর পশ্চিমা টার্গেটে আঘাত হানার মধ্য দিয়ে। জুনদুল্লাহর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত শ্রোতা ছিল ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সক্রিয় থাকা বিভিন্ন পাকিস্তানি জিহাদি দলগুলো। তাই (আল-কায়েদার লক্ষ্যে ছিল) তাদেরকে বোঝানো যে একমাত্র আল-কায়েদার বৈশ্বিক জিহাদের পতাকার অধীনেই মুসলিম ভূমিগুলোর প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। আর তারপর সম্ভাব্য নতুন সদস্যদের বৈশ্বিক জিহাদের জন্য কাজ করার আহ্বান জানানো। কয়েক মাসের মধ্যেই এই নতুন কৌশলের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেল।

উর্বর মাটি

আল-কায়েদা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের আদর্শের প্রসারের জন্য পাকিস্তান এক উর্বর ভূমি। ১৯৭৯ থেকে আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে লড়াই ও প্রশিক্ষণ নিয়েছিল কমপক্ষে ৬ লক্ষ পাকিস্তানি যুবক। অন্তত ১ লক্ষ পাকিস্তানি ছিল বিভিন্ন ধরনের জিহাদি দলের সক্রিয় সদস্য। পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোর মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ লাখেরও বেশি; আর বিভিন্ন ইসলামি ধর্মীয় দলের সমর্থকও ছিল কয়েক লক্ষ। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। আর সেই সেনাবাহিনীও পুরোপুরি জিহাদি আদর্শের প্রভাবমুক্ত ছিল না।

বহু সেনাবাহিনী অফিসার চাকওয়ালের মাওলানা আকরান আওয়ানের মতো বিভিন্ন জিহাদি আধ্যাত্মিক নেতার কাছে বাইয়াতবদ্ধ (আনুগত্যের শপথ) ছিলেন। এই ধরনের অফিসাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে 'পীর ভাই গ্রুপ' নামে পরিচিত ছিল। একই ব্যক্তির কাছে আনুগত্যের শপথ করা সবাই একে অপরের কাছে আপন ভাইয়ের মতো বিবেচিত হতো। তারা পরস্পরকে 'পীর ভাই' বলতো।

৯/১১-এর পর জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে এই 'পীর ভাই'দের বের করার চেষ্টা করেছিল। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তৎকালীন 'ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ' লেফটান্যানেন্ট জেনারেল মুজাফফর উসমানিকেও সে এই কারণে পদচ্যুত করেছিল। কিন্তু ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বছর জুড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে শেকড় গেড়ে বসা এই জিহাদি প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সে ব্যর্থ হয়েছিল। আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল জুনদুল্লাহর মতো সংস্থার মাধ্যমে এই পেশাদার, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ইসলামপন্থীদেরকে নিজ প্রভাববলয়ের ভেতর নিয়ে আসা।

বিধ্বংসী লস্করে জাংভী (LJ) ছিল আল-কায়েদার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া প্রথম দল। লস্করে জাংভী ছিল একটি শিয়া বিরোধি সশস্ত্র আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন, যারা মূলত নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল সিপাহি-সাহাবা পাকিস্তান (SSP) এর একটি দলছুট অংশ। লস্করে জাংভীর অনুসারীরা বেশ কিছু শিয়া যাজক ও নেতৃস্থানীয় শিয়াকে হত্যা করেছিল। তাদের প্রত্যেক সদস্যকে রাষ্ট্র ওয়ান্টেড লিস্টে রেখেছিল। তালেবান শাসনামলে তাদের বেশিরভাগ সদস্যই আফগানিস্তানে লুকিয়ে ছিল। তালেবানের পতনের পর তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না।

এমন পরিস্থিতির সুযোগ নিতে এগিয়ে আসে সর্বদা সুযোগ-সন্ধানী আল-কায়েদা। আল-কায়েদা লস্করে জাংভীর সদস্যদেরকে বৈশ্বিক জিহাদের একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে কাজে লাগায়। পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় পুনঃসংগঠিত হওয়ার সময় লস্করে জাংভীর সদস্যদেরকে আল-কায়েদা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে স্বাগত জানায়। তাদেরকে পাকিস্তানে আল-কায়েদার বহুমুখী অপারেশনে সহায়তা করার জন্য উৎসাহও দেওয়া হয়। লস্করে জাংভীকে তার শিয়া-বিরোধী হত্যাকাণ্ডের সংকীর্ণ এজেন্ডা বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া হয়। একই সাথে কাজী জাফরের [18] মতো তাদের কিছু সদস্যও আল-কায়েদার নিজস্ব অপারেশনে নিযুক্ত হয়। যেমন, লাহোরে অবস্থিত ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির অফিসে হামলা ছিল আল-কায়েদার অপারেশন, কিন্তু এতে লস্করে জাংভীর সদস্যরাও অংশগ্রহণ করে।

পাশাপাশি কারী হুসাইনের মতো অন্যান্য নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়, আল-কায়েদার আমেরিকা বিরোধী অপারেশনের জন্য ফিদায়ি বিগ্রেড তৈরির। ধীরে ধীরে এই কৌশল ফল দিতে শুরু করে। হাজার হাজার নতুন সদস্য আল-কায়েদায় যুক্ত হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে ছিল সুপরিচিত ছিলেন দুই ভাই ডাক্তার আকমাল ওয়াহিদ এবং ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ। এর আগে তাঁরা দু'জন পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামির সাথে যুক্ত ছিলেন।

দক্ষিণ বন্দর শহর করাচির এই দুই শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক জুনদুল্লাহর মাধ্যমে আল-কায়েদার সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ডাঃ আরশাদ ওয়াহিদ পরে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ওয়ানা'তে CIA-এর ড্রোন হামলায় শহীদ হন। এর পরপরই আল-কায়েদার মিডিয়া শাখা 'আস-সাহাব' নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে তাঁর জীবনীভিত্তিক একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করে। এছাড়া পরবর্তীকালে বেশ কিছু সেনাবাহিনী অফিসারও আল-কায়েদায় যোগ দেন। পরবর্তীতে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২০১০-এর জুলাইয়ে পাঞ্জাবি তালেবানের [19] এক মুখপাত্র জানায়, আরশাদ ওয়াহিদ ও আকমাল ওয়াহিদের প্রভাব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন ইসলামি জামিয়াতে তালেবাসহ (IJT) অন্যান্য কিছু সংগঠনকে বিভক্ত করে ফেলেছিল। বিশেষ করে

---

18. ২০১০ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে শহীদ

19. তালেবানের যে অংশটি জাতিগতভাবে পশতুন না

করাচি থেকে আসা সদস্যদের। তাদের অনেকেই উত্তর ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদার সাথে যোগ দিয়ে দেয়। ১৯৪৮ সালে জামায়াতে ইসলামির একটি অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে ইসলামি-জামিয়াতে-তালেবা গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭০-এর মধ্যেই এটি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশটির বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল।

মধ্যবিত্তদের থেকে উঠে আসা পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতাদের বেশির ভাগই ছাত্রাবস্থায় ইসলামি-জামিয়াতে-তালেবার সাথে যুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন আমেরিকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসেইন হাক্কানি, মুসলিম লীগ নেতা জাভেদ হাশমি এবং ইহসান ইকবাল, আইনমন্ত্রী ডাঃ বাবর আওয়ান প্রমুখ। এছাড়াও প্রায় ৮০ শতাংশ উর্দুভাষী সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কলামিস্ট এবং পাকিস্তানের টিভি চ্যানেলগুলোর টকশোর উপস্থাপকদেরও এক অধিকাংশই ছাত্রাবস্থায় এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

২০০৩-০৪-এর দিকে আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে গঠিত হওয়া জুনদুল্লাহ এবং সমমনা সংগঠনগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় সশস্ত্র দলগুলোকে একটি সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ভেতরে হওয়া প্রতিটি হামলার পেছনে আল-কায়েদা ছিল না। পাকিস্তানের ইসলামি দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আদর্শিক বিভেদ আল-কায়েদার জন্য সমস্যা তৈরি করছিল। শিয়া-বিরোধী জিহাদি দলগুলো পাকিস্তানি শহরগুলোতে ইরাকের মতোই বেসামরিক নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করছিল, এই ব্যাপারগুলো আল-কায়েদার পরিকল্পনার অংশ ছিল না। তবে লস্করে জাংভীর মতো দলগুলোর সদস্যদের অনুপ্রেরণা সংকীর্ণ আঞ্চলিক চিন্তাধারা থেকে ধীরে ধীরে বৈশ্বিক জিহাদ ও বৈশ্বিক মুসলিম প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় হিজরতের পর আন্দোলনকে বেগবান করতে নতুন সদস্য ও মিত্র খুঁজে পেতে প্রথম দিকে আল-কায়েদার কষ্ট হচ্ছিল। তবে তুলনামূলকভাবে এটা অতটা কঠিন কাজ ছিল না; কারণ পাকিস্তানে আল-কায়েদার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মূল ভিত্তি একরকম প্রস্তুতই ছিল। এছাড়া পাকিস্তান এবং আমেরিকার মধ্যকার মিত্রতা থেকেও আল-কায়েদা লাভবান হচ্ছিল। পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক যতই গভীর হচ্ছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ততই ইসলামপন্থীদের দূরে ঠেলে দিচ্ছিল।

ফলস্বরূপ কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর বেশির ভাগকেই সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখা হচ্ছিল। চলছিল ধরপাকড় আর নির্যাতন। এর ফলে তাদের অনেকে পাকিস্তানের আনুগত্য থেকে বের হয়ে আল-কায়েদায় গিয়ে যোগ দিয়েছিল। আল-কায়েদা তাদের মধ্যে বাছাই করা এক দলকে নিজেদের কৌশল ঢেলে সাজানোর জন্য ব্যবহার করছিল। আর অন্যান্য আরও হাজারো নতুন সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করে আল-কায়েদা একটি খাঁটি জঙ্গি দল থেকে নিজেদেরকে একটি সত্যিকার ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনে পরিণত করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শান্তি এবং যুদ্ধের রাজনীতি

আল-কায়েদার নীতিমালায় আফগানিস্তানই হলো মুখ্য। পাকিস্তান আদৌ তাদের টার্গেট ছিল না। বাস্তবে ৯/১১-এর পর পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (ISI)-এর মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল মেহমুদের পক্ষ থেকে আল-কায়েদা সদস্যদের প্রতি একটি মৌন বার্তা ছিল যে, পাকিস্তান আল-কায়েদার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে না যদি আল-কায়েদা পাকিস্তানি স্বার্থে আঘাত না করে। (এটি ছিল সেই সময়কার ঘটনা যখন মেহমুদ উসামা বিন লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মোল্লা উমারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল।) আমেরিকার চাপে পাকিস্তান ২০০২-০৩-এ আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অল্প কিছু অপারেশন পরিচালনা করে ঠিকই, কিন্তু আল-কায়েদা ২০০৩-এর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শত্রুতা এড়িয়ে চলায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, যতদিন না (লস্করে জাংভীর) সশস্ত্র যোদ্ধারা জেনারেল পারভেজ মোশাররফের ওপর আক্রমণ করে বসে। এই আক্রমণের ফলে আল-কায়েদা এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও চলমান শত্রুতার সূচনা হয়।

২০০৩-এর শেষ দিকে মোশাররফের শোভাযাত্রায় পর পর দুটো আক্রমণের পরিকল্পনায় ছিল আমজাদ ফারুক, লস্করে জাংভীর প্রাক্তন নেতা। তিনি ২০০৪-এর সেপ্টেম্বরে এনকাউন্টারে নিহত হয়। সেসময় জাংভী আল-কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল, কিন্তু মোশারফকে হত্যার পরিকল্পনাটি ছিল তাদের একান্তই নিজের। মোশাররফের ওপর আক্রমণ জিহাদি দলগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করে। মাত্র কয়েক মাসের ব্যাবধানে গোয়েন্দা সংস্থা কয়েক হাজার মুজাহিদকে গ্রেপ্তার করে এবং কোনো বিচার ছাড়াই আটকে রাখে। এরপরই আল-কায়েদা পাকিস্তানে সন্ত্রাসী অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা করে; যদিও তা হয়েছিল অনেকটা অনিচ্ছাতেই।

সেই সময় পর্যন্ত, আল-কায়েদা পাকিস্তানকে নিজেদের কৌশলগত ঘাঁটি এবং নতুন সেনা ভর্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখে আসছিল; জিহাদের (কিতালের) এমন ময়দান হিসেবে নয়, যেখানে লড়াই করা হবে। যাই হোক, যখন আমেরিকার বাঁধভাঙ্গা চাপ পাকিস্তানকে আল-কায়েদা, তালেবান এবং অন্যান্য জিহাদি গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করে, এটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল যে আল-কায়েদাও পাকিস্তানে তাদের অভিযানের মাধ্যমে পাল্টা কৌশল নিতে বাধ্য হবে। কৌশলটি এই

বার্তাই দিচ্ছিল যে - আমেরিকা যদি সামরিকভাবে পাকিস্তানকে চাপ প্রয়োগে সক্ষম হয়, তবে মুজাহিদরাও সমানভাবে একই ধরনের আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানের ভবিষ্যত পরিবর্তনে সক্ষম। কৌশলটি নিশ্চিতভাবেই আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-তে পাকিস্তানের সহায়তা কমিয়ে আনতে সফল হয়েছিল। যুদ্ধ যতই সামনে গড়াচ্ছিল, মুজাহিদরা আরও বেশি করে শক্তি প্রদর্শন করছিল এবং তাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। এরপর পাকিস্তান তাদের সাথে যুদ্ধ বিরতির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনার জন্য তাদের সাথে বসতে বাধ্য হয়।

পরবর্তীতে, প্রথমদিকের এই অনিচ্ছাকৃত কৌশলই সুচিন্তিত পরিকল্পনায় পরিণত হয়, যার অধীনে আল-কায়েদা ৩টি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিত্তিতে যুদ্ধের গতিপথ নির্ধারণ করে:

- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় নিজ সদস্যদের সংঘবদ্ধ করা এবং একটি যুদ্ধকৌশল প্রস্তুত করা।

- ২০০৬-এ আল-কায়েদার প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র আফগানিস্তানে বসন্তকালীন আক্রমণে ফিরে যাওয়ার পূর্বেই এই ব্যবস্থাকে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা।

- পাকিস্তানে যুদ্ধ বিস্তৃত করা; এবং সেখান থেকে মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র - ভারত পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দান বিস্তৃত করার কৌশল তৈরি করা। এইসবের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীকে [20] পরাজিত করা।

এই কৌশল অর্জনে আল-কায়েদা তার সদস্যদেরকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করে এবং পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় একটি নতুন জিহাদি-কাঠামো তৈরি করে এবং তারপর এই কাঠামোকে সেন্ট্রাল-এশিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করে।

২০০৪-এর মার্চ মাসে, আমেরিকার প্রচন্ড চাপে হাজারো পাকিস্তানি সেনা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের 'ওয়ানা' বিভাগে 'খালুসা অপারেশন' শুরু করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস

---

20. North Atlantic Treaty Organisation বা NATO (ন্যাটো) ১৯৪৯ সালের ৪-এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত একটি সামরিক জোট। ন্যাটো জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলো একে অপরকে সামরিক সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'আটলান্টিক মহাসাগর' এর দুই পাড়ে অবস্থিত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ এই জোটের সদস্য। ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ১২টি রাষ্ট্র। ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত সদস্য হয়েছে মোট ২৯ টি রাষ্ট্র। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র তুরস্ক এবং আলবেনিয়াই হলো মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র।

ছিল যে, একটি সংক্ষিপ্ত, দ্রুতগামী এবং সার্জিকাল অপারেশনের মাধ্যমে মুজাহিদদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হবে; যা আদতে ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু ২০০২-এবং ২০০৩-এর অপারেশনগুলোর বিপরীতে আল-কায়েদা কাঠামোগুলো এবার সক্রিয় ছিল। একে তো পাকিস্তান সেনাবাহিনী এমন প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া আশা করেনি। তাছাড়াও মুজাহিদদের অ্যাম্বুশে পড়ে সেনাবাহিনীর ভয়াবহ ক্ষতি হয় এবং অপারেশন ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানি অফিসার এবং সৈন্যদের ফাঁদে টেনে আনা হয় এবং তাদেরকে আটক করা হয়। এমনকি একপর্যায়ে যখন গোত্রীয় যুবকেরা আটককৃত অফিসার এবং সেনা সদস্যদেরকে জনসম্মুখে চড়-থাপ্পর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেনাবাহিনীর গৌরব এবং সম্মান চূড়ান্ত অপমানের মুখ পড়ে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং ২৪-এপ্রিল ২০০৪-এ যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি (সাকাই চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে এটা ছিল আল-কায়েদার কৌশলের প্রথম সফলতা। মুজাহিদরা এই সুযোগকে আমেরিকা এবং তার মিত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে ব্যবহার করে। পরবর্তী মাসগুলোতে অনুরূপ অনেক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি আল-কায়েদার সামগ্রিক যুদ্ধ কৌশলের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়, মুজাহিদদের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় রণকৌশল পাল্টানোর সুযোগ প্রদান করে ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে; আর পরিশেষে তাদের ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধের সীমানা নির্ধারণের সুযোগ করে দেয়। (পরবর্তী অধ্যায়ে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)

নেক মুহাম্মাদ ওয়াজির 'ওয়ানা' অঞ্চলের বীর হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি সফলভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা থেকে আল-কায়েদা সদস্যদের উদ্ধারে সক্ষম হন এবং খালুসা অপারেশনের সময় উজবেকিস্তান ইসলামি আন্দোলনের প্রধান - কারী তাহের ইয়ালদোচিভকে উদ্ধার করেন। এই অপারেশনের মাধ্যমে বিদেশি মুজাহিদরা প্রকাশ্যে আসেন এবং তাঁদের অবস্থানের স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

ময়দানে নতুন খেলোয়াড়

সাকাই চুক্তি আল-কায়েদার আরব্য রজনীতে আরও বহু চরিত্রের আবির্ভাবের সাক্ষ্য বহন করে। তাহের ইয়ালদোচিভ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি পরবর্তীতে আবদুল্লাহ মেহসুদ ওরফে মুহাম্মাদ আলম এবং বাইতুল্লাহ মেহসুদের মতো মুজাহিদ নেতা এবং তাদের সাথে আড়াই হাজার উজবেক সেনার রিক্রুটমেন্টে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উজবেকদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি মুজাহিদদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে শত্রুর জন্য ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। তাদের কৌশলের মধ্যে অন্যতম ছিল নিয়মিতভাবে শত্রুদের শিরোচ্ছেদ করা।

চুক্তির প্রধান স্বাক্ষরকারীদের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ। তাদের প্রত্যেকেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অফিশিয়াল কাগজপত্রে নেক মুহাম্মাদের উল্লেখও ছিল একজন 'মুজাহিদ' হিসেবে। দলিলপত্র অনুসারে সাকাই চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন -

- মুহাম্মাদ মিরাজউদ্দিন
- মাওলানা আবদুল মালিক
- মাওলানা আকতার গুল
- মুহাম্মাদ আব্বাস
- নেক মুহাম্মাদ (মুজাহিদ)
- হাজী শরীফ
- বাইতুল্লাহ মেহসুদ
- নূর ইসলাম
- মুহাম্মাদ জাভেদ
- মুহাম্মাদ আলম ওরফে আবদুল্লাহ

মাওলানা মিরাজউদ্দিন এবং মাওলানা আবদুল মালিক ছিলেন তালেবান সমর্থক ৬ দলীয় জোটে MMA-এর (মুত্তাহিদা-মজলিসে-আমল) দুই পাকিস্তানি সংসদ সদস্য। মাওলানা আকতার গুল হলেন স্থানীয় তালেবান সমর্থক ইমাম। মুহাম্মাদ আব্বাস, নেক মুহাম্মাদ, হাজী শরীফ, নূর ইসলাম এবং মুহাম্মাদ জাভেদ ছিলেন মুজাহিদ কমান্ডার। মুহাম্মাদ আলম ওরফে আবদুল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত দুঃসাহসী আবদুল্লাহ মেহসুদ, যিনি পরবর্তীতে পাকিস্তানি তালেবানের নেতা হয়ে যান।[21]

21. তিনি ২০০৭-এর জুলাইতে পাকিস্তানের দক্ষিণ–পশ্চিম বেলুচিস্তানের যোহাব জেলায় শহীদ।

এই লিস্টে ক্ষণিকের দৃষ্টিপাত আমাদেরকে দেখায় যে, ২০০৪-এ তালেবান এবং আল-কায়েদার রাজনৈতিক জোট কীভাবে (পাকিস্তান) সরকার সমর্থক গোত্রীয় নেতাদের প্রতিস্থাপিত করে দিয়েছিল।

চুক্তির উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো ছিল :

- সরকার তাদের সকল বন্দীদের মুক্তি দিবে।
- অপারেশনে শহীদ / আহতদের সরকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।
- সরকার মিলিটারি অপারেশন চলাকালে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ দিবে।
- সরকার নেক মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিবে না।
- সরকার বিদেশি মুজাহিদদেরকে ওয়াজিরিস্তানে শান্তিপূর্ণ বসবাসে হস্তক্ষেপ করবে না।

এর বিপরীতেঃ

- মুজাহিদরা (স্থানীয়) দেশ এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের যুদ্ধ করবে না।
- ওয়াজিরিস্তানের মুজাহিদরা আফগানিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করবে না।

'বিদেশি যোদ্ধা'দের নিবন্ধন ধারাটির দ্ব্যার্থক ব্যাখ্যার কারণে চুক্তিটি পরবর্তীতে ব্যর্থ হয়। সরকারের দাবি ছিল যে, মুজাহিদরা এলাকাতে থাকা বিদেশি যোদ্ধাদের নিবন্ধন এবং তাদের আত্মসমর্পণ (রেজিস্টার) করাবে। মুজাহিদদের দাবি ছিল যে, চুক্তিতে এমন কোনো ধারার উল্লেখ ছিল না। এই দ্বিমতের জের ধরে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আরেকটি অপারেশন শুরুর মাধ্যমে নতুন পর্বের বিরোধিতার সূচনা হয়। কিন্তু আল-কায়েদা পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। অপারেশনের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শহর দক্ষিণ সমুদ্র বন্দর করাচিতে, কর্পস কমান্ডার আহসান সেলিম হায়াতের ওপর আক্রমণের মাধ্যমে। সে হামলায় বেঁচে যায় (পরবর্তীতে পাকিস্তান চীফ অব আর্মি স্টাফ হন); কিন্তু বেশ কিছু সেনা সদস্য তাতে নিহত হয়। এই আক্রমণের কীর্তি ছিল পাকিস্তানি জুনদুল্লাহর করাচি সেলের।

একপর্যায়ে আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০০৪ সালের ১৯ জুন আমেরিকান প্রিডেটর ড্রোন থেকে হেলফায়ার মিসাইল আক্রমণে নেক মুহাম্মাদ নিহত হলে পাকিস্তান সরকার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। চুক্তির মেয়াদ ছিল ৫০ দিন কিন্তু এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী :

- গোত্রীয় ভিন্নমত একটি শক্তিশালী জিহাদি দলে পরিণত হয়, যা শেষ পর্যন্ত গোত্রীয় এলাকার এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং এই মেরুকরণকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

- পাকিস্তান সরকার শক্তভাবে আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নীতিকে সমর্থন করা শুরু করে এবং পরিস্থিতিকে সামরিক রূপ দান করে।

- গোত্রীয়দেরকে মুজাহিদদের 'সম-মর্যাদার দল' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে, যা স্রেফ গোত্রীয় পরিচয় থেকে বেশি উচ্চস্তরে ছিল।

নেক মুহাম্মাদের মৃত্যু এক কিংবদন্তির সমাপ্তি ছিল, কিন্তু আল-কায়েদার মাধ্যমে একই রকম বৈশিষ্ট্যের নতুন অনেক চরিত্র ইতোমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল; আর পরবর্তী মাসগুলোতে তারা একের পর এক আবির্ভূত হতে থাকে। আল-কায়েদার স্বপ্নদ্রষ্টারা নিজেদের দিগন্ত বিস্তৃত করতে তাদেরকে সাহায্য করে।

পঞ্চাশোর্ধ্ব হাজী উমার, প্রথমে নেক মুহাম্মাদের উত্তরসূরী হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি একই গোত্র থেকে ছিলেন, আর আল-কায়েদা এমন গোত্রীয় নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল না - বিশেষ করে হাজী উমারের বেলায়। তিনি আল-কায়েদার কৌশলে গড়ে উঠবার জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক ছিলেন। আল-কায়েদা এমন কাউকে খুঁজে ফিরছিল, যে হবে বিশোর্ধ্ব – নেক মুহাম্মাদের মতো। শেষ পর্যন্ত আল-কায়েদার নেতৃত্ব দুই যুবক – আবদুল্লাহ মেহসুদ এবং বাইতুল্লাহ মেহসুদকে নির্বাচিত করেছিল। উজবেক যুদ্ধনেতা তাহের ইয়ালদোচিভ তাদের দুজনেরই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নেক মুহাম্মাদের মতো দুই যুবকই সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসেছিল।

ওয়াজিরিদের বিপরীতে মেহসুদ গোত্র সবসময়ই পাকিস্তান প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যান্য গোত্রের তুলনায় তারা ছিল অধিক শিক্ষিত এবং অধিক স্বচ্ছল। অবশ্য

আল-কায়েদায় দুই মেহসুদের নিয়োগপ্রাপ্তির সাথে অর্থের সামান্যই সম্পর্ক ছিল। তাহের তাঁদেরকে তাঁর ২৫০০ উজবেক মিলিশিয়া দিয়ে সমর্থন করেন এবং তারা ধ্বংসযজ্ঞের পথ অবলম্বন শুরু করেন।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের নানো শহরে ১৯৭৪-এ জন্ম নেওয়া আবদুল্লাহ মেহসুদের প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ আলম মেহসুদ। তিনি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের 'সালিমী খেল' এলাকার মেহসুদ গোত্রের একজন সদস্য ছিলেন। পেশোয়ার থেকে কমার্সের ওপর তাঁর ডিপ্লোমা ডিগ্রি ছিল। আবদুল্লাহ মেহসুদ এর আগে আফগানিস্তানে আমেরিকা এবং Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; এবং ১৯৯৬-এ 'Operation Enduring Freedom' [22] এর প্রথমদিকে ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণে একটি পা হারিয়েছিলেন। ২০০১-এর ডিসেম্বরে তিনি কুন্দুজের যুদ্ধে উজবেক যুদ্ধনেতা আবদুর রশিদ দোস্তমের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আবদুর রশিদ তাঁকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয় এবং তিনি 'গুয়ান্তানামো বে'-এর বন্দীশিবিরে ২৫ মাস বন্দী থাকেন। সেখানে তাঁর প্রস্থেটিক (কৃত্রিম) পা লাগানো হয়। আমেরিকা মেহসুদকে পরবর্তীতে ছেড়েও দেয় এবং তিনি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ফিরে আসেন।

কারাবাস আল-কায়েদা এবং তালেবানের প্রতি তাঁর আনুগত্যকে ক্ষয় হতে দেয়নি। যখন তিনি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ফিরে আসেন, তখন তাহের ইয়ালদোচিভের ঘনিষ্ঠ হন। ইয়ালদোচিভ তাঁকে পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন। এরপর তিনি আফগানিস্তানের তালেবানের সাথে হেলমান্দ প্রদেশে আগ্রাসী ন্যাটো সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। সেখান থেকে ওয়াজিরিস্তানে ফিরে আসার জন্য পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের যোহাব জেলায় আসার সময় পাকিস্তানি সিকিউরিটি ফোর্স তাঁকে ঘিরে ফেলে। তিনি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন, ফলে সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

22. Operation Enduring Freedom (OEF) হলো ৯/১১-এর আক্রমণের পর আফগানিস্তানে আল-কায়েদা এবং তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকার আক্রমণের অফিসিয়াল নাম। আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এই অপারেশন শুরু করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থা দমনের নামে শুরু হলেও মূলত এর দ্বারা আফগানিস্তানে আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করা হয়। ১৩ বছর পর ২০১৪-এর ডিসেম্বরে বারাক ওবামা এই অপারেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

কিন্তু সাথে সাথেই ২০১৫-এর জানুয়ারি থেকে নতুন নাম - Operation Freedom's Sentinel (OFS) রেখে আমেরিকা-ন্যাটো জোট আফগানিস্তানে যুদ্ধ বজায় রাখে।

বাইতুল্লাহ মেহসুদ পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া, প্রাক্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী প্রদেশের (NWFP –North-West Frontier Provice) বানু জেলার লান্ডী ডোক গ্রামে ১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মেহসুদদের সাবাইখেল উপগোত্রের ভূমিখেলের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে তিনি মিডিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে চলতেন এবং ছবি তুলতে অস্বীকার করতেন। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেননি; কিন্তু একটি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। একজন তরুণ মাদ্রাসা ছাত্র হিসেবে বাইতুল্লাহ শরীয়াহ প্রণয়ন-প্রয়োগ এবং Northern Alliance-এর বিরুদ্ধে তালেবানকে সাহায্য করবার জন্য প্রায়ই আফগানিস্তানে যেতেন। ২০০৪-এ নেক মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তিনি আরেকজন অন্যতম গোত্রীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

মোল্লা দাদুল্লাহ সহকারে পাঁচজন নেতৃস্থানীয় তালেবান কমান্ডারের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানে মোল্লা উমারের পক্ষ হতে তাঁকে মেহসুদ এলাকার গভর্ণর নির্বাচন করা হয়। তিনি এরপর উজবেক নেতা তাহের ইয়ালদোচিভের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তাহিরের আদর্শিক দৃঢ়তা তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বাইতুল্লাহ মেহসুদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আল-কায়েদার মতোপার্থক্য ছিল। কিন্তু আল-কায়েদার কাছে খুব বেশি বিকল্পও ছিল না; যেহেতু দুই ওয়াজিরিস্তানে তিনিই ছিলেন আন্দোলনের নেতা।[23]

আবদুল্লাহ মেহসুদ এবং বাইতুল্লাহ মেহসুদের মধ্যে মতোপার্থক্য তৈরি হয় এবং বাইতুল্লাহর সমর্থনে আবদুল্লাহকে কমান্ড ছাড়তে বাধ্য করা হয়। অথচ এই দুই পাকিস্তানি মুজাহিদ, গোত্রীয় মুরুব্বিদেরকে (যারা নেতা ছিল) তাদের এলাকা হতে পালাতে বাধ্য করার মাধ্যমে পুরোনো গোত্রীয় কাঠামো ধ্বংস করতে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর তাঁরা উক্ত অঞ্চলের সবচেয়ে কৌশলী কমান্ডারে পরিণত হয়েছিলেন।

পাকিস্তান সরকার এবার আরও একবার মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়; তবে এবার সেটা ছিল মেহসুদ গোত্রের কাছে। আত্মসমর্পণের চুক্তিগুলো ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারিতে 'শ্রারোঘা শান্তি চুক্তি' নামে প্রকাশিত হয়। ২০০৫-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি চুক্তিটি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শ্রারোঘাতে একটি স্থানীয় জিরগার[24] মধ্যস্থতায় তালেবান সমর্থক মুজাহিদ বাইতুল্লাহ মেহসুদ এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

---

23. বাইতুল্লাহ মেহসুদ আগস্ট ২০০৯-এ CIA-এর ড্রোন হামলায় নিহত হন

24. জিরগা হলো গোত্রীয় এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত

এই চুক্তিতে ৬টি ধারা ছিল এবং লিখিত চুক্তির মধ্যে ছিল -

- বাইতুল্লাহ এবং তাঁর দল তাঁদের এলাকায় কোনো বিদেশি যোদ্ধাদের আশ্রয় বা সহায়তা প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে।

- বাইতুল্লাহ এবং তাঁর সমর্থকেরা সরকারি ব্যবস্থাপনা অথবা সম্পদে কোনো প্রকার আক্রমণ করতে পারবে না। এবং তাঁরা (সরকারের) উন্নয়ন কার্যক্রমে কোনোরূপ বাধাও তৈরি করতে পারবে না।

- সরকার বাইতুল্লাহ এবং তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধি অতীত কর্মকান্ডের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। কিন্তু যদি, ভবিষ্যতে কোনো সন্ত্রাসী বা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে তাঁদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তখন তাদের সাথে কেন্দ্রশাসিত গোত্রীয় এলাকার বিদ্যমান আইন (FATA) অনুসারে বিচার ফায়সালা করা হবে। মেহসুদ এলাকায় যদি কোনো অপরাধীর উপস্থিতি পাওয়া যায়, তবে তাকে সরকারের হাতে সোপর্দ করা হবে।

চুক্তিটি ছিল এমনঃ

- আমরা অঙ্গীকার করছি যে, যদি কোনো অপরাধী এই এলাকায় পাওয়া যায় (বাইতুল্লাহ গ্রুপ ব্যতীত), মেহসুদ গোত্র তাকে সরকারের কাছে সোপর্দ করবে এবং 'এফসিআর' (Frontier Crime Regulation) এর অধীনে সরকার পদক্ষেপ নিতে ক্ষমতাশীল।

- যে সকল বিষয় এই চুক্তিতে উল্লেখিত হয়নি, সেগুলো মেহসুদ গোত্র এবং রাজনৈতিক প্রশাসনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

- উপরোল্লেখিত ধারার কোনো একটি ভঙ্গ করা হলে, রাজনৈতিক প্রশাসনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

এই চুক্তিটি বাইতুল্লাহ মেহসুদ এবং জিরগার সদস্যদের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয়।[25]

---

25. তখন জিরগা তথা সালিসের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন মালিক এনায়েতুল্লাহ খান, মালিক কাইয়্যুম শের, মালিক শের বাহাদুর শামাংখেল।

এই চুক্তির ব্যাপারে কিছু পর্যালোচনাঃ

- চুক্তিতে সীমান্ত পারাপার অথবা আফগানিস্তানে আক্রমণের ব্যাপারে কোনো ধারা উল্লেখ করা হয়নি।
- বিদেশি যোদ্ধাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে, এমন কোনো ধারার উল্লেখ ছিল না।
- মুজাহিদদের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনো ধারা ছিল না।
- সমঝোতা চলাকালে মুজাহিদদের অর্থ প্রদানের খবরে বিতর্কের শুরু হয়।
- ২য় গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার আবদুল্লাহ মেহসুদ চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়।

কৌশলগতভাবে ২০০৪-এর সাকাই চুক্তি ছিল আল-কায়েদার বেঁচে থাকার জন্য এক নতুন উপলক্ষ্য, যার মাধ্যমে আল-কায়েদার স্থানীয় মিত্ররা তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার সুযোগ লাভ করে এবং আল-কায়েদাকে তার যুদ্ধের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করার জন্য সুযোগ এনে দেয়। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে (ওয়াজির এবং মেহসুদ গোত্রের মাধ্যমে) আল-কায়েদার একটি বিশাল ঘাঁটি তৈরি হয়ে যায়, যেখান থেকে আল-কায়েদা নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। গোত্রীয় এলাকা এবং পাকিস্তানি শহরগুলোতে নিজ নেটওয়ার্কের প্রভাব তৈরির জন্য আল-কায়েদার ঘাঁটিকে এমন পরিমাণে বিস্তৃত করা প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে নতুন সৈন্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ তৈরি হবে, এবং ছোট ছোট সেল (যুদ্ধদল) তৈরি করা সম্ভব হবে যেগুলা আফগান যুদ্ধে পাকিস্তান এবং আমেরিকার মিত্রতার তীক্ষ্নতাকে কার্যকরভাবে নমনীয় করা শুরু করবে। ফলে আল-কায়েদা আফগান যুদ্ধে মনযোগ সহকারে জড়াবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে আল-কায়েদার কর্ম-কৌশল ভবিষ্যত যুদ্ধের রূপ দান করেছে।

আল-কায়েদা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তার শিকড় শক্ত করার পর, বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন আরব আলেমদেরকে উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ক্রসরোডে অবস্থিত রাযমাক শহরে স্থানান্তরিত করে। রাযমাকের কাছেই ছিল দক্ষিণ

ওয়াজিরিস্তানের শহর মীর আলি। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের তুলনায় উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে অভিযান পরিচালনা করা অধিকতর উপযোগী ছিল। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ছিল অনেকটা হেলমান্দ প্রদেশের তালেবান ঘাঁটির মতো, সরাসরি আফগান তালেবানের অধীনে। সেখানকার বেশিরভাগ মুজাহিদই ছিল স্বতন্ত্র যোদ্ধা। তাই দক্ষিণের বদলে উত্তর ওয়াজিরিস্তানই আল-কায়েদার আন্তর্জাতিক হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য অনেক বেশি উপযোগী ছিল।

দূর্গ নির্মাণ

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জালালউদ্দিন হাক্কানি ছিলেন এক কিংবদন্তীতুল্য যোদ্ধা। তিনি তালেবানের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৪-এ যখন আফগান যুদ্ধনেতাদের বিরুদ্ধে ছাত্র মিলিশিয়াদের তালেবান আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে তখন এর সদস্য ছিলেন না। এমনকি আমেরিকান আক্রমণের পরও হাক্কানি তালেবানের প্রতি আনুগত্যশীল থাকেন। কিন্তু ন্যাটো সেনাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর যুদ্ধ সংক্ষিপ্তভাবে চালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর দুই ছেলে নাসিরউদ্দিন হাক্কানি এবং সিরাজউদ্দিন হাক্কানি আরব যোদ্ধাদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বিপরীতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মেহসুদ গোত্র এবং ওয়াজির গোত্রের মধ্যে মিত্রতা সত্ত্বেও পারস্পরিক মতপার্থক্য ঠিকই ছিল। কিন্তু উত্তর ওয়াজিরিস্তান ছিল এককভাবে ওয়াজির গোত্রের অধীনে। দাওয়ার গোত্রও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বাস করতো; কিন্তু তারা ছিল মূল ওয়াজির গোত্রের একটি শাখা। আর এই কারণেই তারা কখনোই ওয়াজিরদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি।

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিল যে, আমেরিকার চাপ পাকিস্তানকে আরও অপারেশন চালাতে বাধ্য করবে এবং পরিশেষে যুদ্ধের ময়দান পাকিস্তানের অন্যান্য গোত্রীয় এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়বে, যেখানে আমেরিকা আল-কায়েদার অনুসারীদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাই আল-কায়েদা কতগুলো শক্তিশালী আদর্শিক দুর্গ প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে, যাতে আমেরিকা আর তার মিত্ররা যদি একটি দুর্গের পতনও ঘটায়, তবুও যেন লড়াই বন্ধ হয়ে না যায়। আল-কায়েদার কর্মকান্ডের একটি উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে এই ব্যাপারে উপলব্ধি করানো যে - পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে তাদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে জালালউদ্দিন হাক্কানি ছিলেন বিশিষ্ট তালেবান যুদ্ধনেতা (কমান্ডার ও স্ট্র্যাটেজিস্ট)। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল যে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের এই অপারেশনগুলো হচ্ছে লোকদেখানো এবং একবার পরিস্থিতি পাল্টে গেলে পাকিস্তান আবারও তালেবানকে সাপোর্ট করবে। হাক্কানি এই কথায় বিশ্বাস করেছিলেন আর তাই তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু আল-কায়েদা ২০০৩-০৪ এর পূর্ব অভিজ্ঞতা

থেকে জানতো যে, পাকিস্তানে বাড়তে থাকা আমেরিকান প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে, একদিন পাকিস্তানকে তালেবানের বিরুদ্ধে বাস্তবিক লড়াইয়েই নামতে হবে। আর এই বুঝই সত্তরোর্ধ্ব শাইখ ঈসা আল মিশরিকে (আল-কায়েদার বিশিষ্ট আলেম) উত্তর ওয়াজিরিস্তানে নিয়ে যায়। শাইখ ঈসা সেখানে কোনো বড় মুজাহিদ নেতার সাথে কথাও বলেননি। বরং তিনি দাওয়ার গোত্র থেকে দুজন ইমামকে নির্ধারণ করেন - মৌলভী সাদিক নূর এবং আবদুল খালিক হাক্কানি। অতঃপর তিনি তাদেরকে বোঝান যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং আমেরিকার মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই; বরং পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনী আরও খারাপ। কারণ যদিও তারা মুসলিম হিসেবে জন্মেছিল, কিন্তু তারা আমেরিকা ও ইসরায়েলি চক্রান্তের সহায়ক হয়েছে।[26]

মৌলভী সাদিক নূর এবং আবদুল খালিক হাক্কানি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শুক্রবারের জুমুআর বয়ান দিয়ে দিয়ে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের শহর 'মীর আলি' এবং 'দার্পা খাইল' শহরকে আল-কায়েদার শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করে ফেলে। এগুলো ছিল এক বৃহৎ পরিস্থিতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ মাত্র। পর্দার আড়ালে আরও বড় পরিস্থিতির জন্য অদৃশ্য হাতগুলো কাজ করে যাচ্ছিল। একদিকে আল-কায়েদার আদর্শবাদী আলেমগণ স্থানীয় ইমাম এবং যুদ্ধনেতাদের হৃদয় ও মন জয় করছিল, আর অন্যদিকে আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজিস্টরা গোপনে স্থানীয় যুদ্ধনেতাদেরকে মুজাহিদিন কাউন্সিল থেকে একত্রে শক্তি জড়ো করার পরামর্শ দিচ্ছিল, প্রচলিত গোত্র প্রথার বিপরীতে যার সম্পর্কের ভিত্তি হবে ইসলামি আদর্শ, প্রচলিত গোত্রপ্রথা নয়।

২০০৫-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তানি তালেবান দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে বেশ কিছু ডাকাতের মৃত্যুদন্ড ঘোষণার মাধ্যমে সারাবিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আদতে এই মৃত্যুদন্ড ঘোষণার অর্থ ছিল এই যে, তারা উক্ত এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। আগে পাকিস্তানি তালেবান নিজেদেরকে স্থানীয় সমস্যা থেকে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। যার ফলে দুই ওয়াজিরিস্তান মাদক পাচারকারী, গাড়ি চোর, ডাকাত এবং শিশু অপহরণকারীদের একপ্রকার স্বর্গে পরিণত হয়েছিল। এই অপরাধীদের বেশিরভাগই

26. অর্থাৎ, পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ নিয়ে কাফিরদেরকে সহায়তা করার কারণে মুরতাদে পরিণত হয়েছে। আর মুরতাদদের রক্তের কোনোই মূল্য নেই; এমনকি মুরতাদরা জিম্মি হিসেবেও গণ্য হয়না; তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হয়।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে 'তাওয়াল্লি' বা মিত্রতা দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণগুলোর একটি। শাইখ ঈসা মূলত এই বিধানটির প্রায়োগিক রূপ বর্ণনা করেছিলেন।

পাকিস্তানের অন্যান্য শহরগুলোতে গিয়ে নানাপ্রকার অপরাধ কর্মকান্ড করতো আর তারপর দুই ওয়াজিরিস্তানের এই গ্রামগুলোতে এসে পালিয়ে থাকতো।

কিন্তু একপর্যায়ে ওরা গোত্রীয় এলাকাতেও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়, বিভিন্ন গ্রামে লুটতরাজ ও ভাংচুর চালায় এবং রাস্তায় রাস্তায় চেক-পয়েন্ট বসিয়ে যাত্রীদের থেকে অর্থ আদায় শুরু করে। কিন্তু পাকিস্তানি তালেবান এতদিন এই সমস্ত কর্মকান্ড দেখেও না দেখার ভান করে ছিল; কেননা তারা আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আল-কায়েদা এবার চাইছিল যে, পাকিস্তানি তালেবান স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক, যা গোত্রীয় এলাকাকে পাকিস্তানি তালেবানের স্ট্র্যাটেজিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করবে। আর সেটা হবে আল-কায়েদার সামগ্রিক কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এভাবেই পাকিস্তানি তালেবান প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, এখন থেকে উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়াদি তারাই দেখভাল করবে; পাকিস্তানি আর্মড ফোর্স নয়, ডাকাতের দলও নয় এবং গোত্র প্রধানরাও নয়। তারা সর্বসম্মুখে প্রায় ৩০ ডাকাতের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। মৃত্যুদন্ডের পূর্বে সারা শহরব্যাপী ওই ডাকাতদেরকে রাস্তায় হিঁচড়ানো হয়। তারা এই সব ঘটনার ভিডিও ফুটেজও তৈরি করে এবং প্রাথমিকভাবে এশিয়া টাইমস অনলাইনে তা প্রচার করে। প্রেসিডেন্ট বুশের পাকিস্তান সফরের মাত্র এক মাস আগে ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এ যখন ছবি ও দৃশ্যগুলো প্রকাশ করা হয়, তখন সেগুলো সারা বিশ্বজুড়ে ঝড় তুলে ফেলে। মিডিয়া আউটলেটগুলো আমার (এই বইয়ের লেখক) কাছ থেকে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজগুলো সংগ্রহ করে এবং সেগুলো বড় বড় আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়। আফগানিস্তান থেকে পিছিয়ে আসার খুব বেশি দিন পরে নয়, তালেবান এবং আল-কায়েদা উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তাদের ইসলামি ইমারাতের ঘোষণা দেয়, যেখানে তালেবান অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশি তদারকির দায়িত্ব পালন করবে।

বর্হিবিশ্ব এই পুরো ঘটনাকে শুধুমাত্র উত্তর ওয়াজিরিস্তান ইসলামি ইমারাহ হিসেবেই দেখেছিল। কিন্তু আল-কায়েদা ইতোমধ্যেই উক্ত অঞ্চলকে ইসলামি ইমারাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই অংশটিকে পুনরুজ্জীবিত করে ফেলেছিল। আল-কায়েদার বৃহত্তর পরিকল্পনা এটাই ছিল যে, একই প্রক্রিয়ায় সকল গোত্রীয় এলাকাগুলোকে পুনর্গঠন করা – যাতে তারা পরিপূর্ণভাবে আল-কায়েদার দুর্গ হিসেবে কাজ করে, বেলুচিস্তান এবং

এবং প্রাক্তন NWFP (North-West Frontier Province) পরিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগেই। ফলে আল-কায়েদা পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে যাওয়া ন্যাটোর সবকটি সাপ্লাই লাইন কেটে ফেলতে পারবে; আর এভাবেই পশ্চিমা পরাশক্তিকে এক সুদীর্ঘ নিঃশেষকারী যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে।

কিন্তু সবসময় আফগানিস্তানই ছিল যুদ্ধের মূল ময়দান। আর ২০০৫-এ দুই ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদার যা কিছু অর্জন, তার সবটাই ছিল আমেরিকা এবং ন্যাটো পরাশক্তির বিরুদ্ধে আফগান তালেবানকে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে। যে গল্পের শুরু হয়েছিল ৯/১১-এর পর আল-কায়েদার পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় চলে আসা দিয়ে, যাতে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যাপক আয়তনের আদর্শিক প্রচারণা চালানো যায়। এই সবকিছুর মূল টার্গেট ছিল আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশে বিজয় অর্জন; আর তারপর পুরো দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে বিজয় অর্জন।

আল-কায়েদা এটাই নিশ্চিত করেছিল যে, তালেবান আফগানিস্তানে ফিরে যাবে অর্থ, কৌশল, নতুন রিক্রুটকৃত সৈন্য এবং এক পুনর্গঠিত কমান্ড ব্যবস্থা নিয়ে। ২০০৬-এর গ্রীষ্মে তালেবানের পুনর্জাগরণ পশ্চিমা পরাশক্তিকে সতর্ক করে তোলে। ২০০৬-এর বসন্তকালীন লড়াই তাদেরকে আক্ষরিক অর্থেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, কারণ পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকার ছায়ায় গড়ে ওঠা অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমা পরাশক্তির কোনো ধারণাই ছিল না। তারা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল যে, তালেবান আর আল-কায়েদার মেরুদন্ড চিরতরের জন্য ভেঙ্গে গেছে। ২০০৬-এ আল-কায়েদার সাহায্যে তালেবানের প্রত্যাবর্তন মুজাহিদদেরকে একটি আঞ্চলিক খেলোয়াড়ে পরিণত করে। এই সময়টা প্রমাণ করে যে, তালেবানের সফল ২০০৬ বসন্তকালীন আক্রমণ ছিল আল-কায়েদার বীজতলা। এরপর আল-কায়েদা স্পষ্টভাবেই ২০০৭-এবং ২০০৮-এ পাকিস্তানে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল; ২০০৮-এ আল-কায়েদা তার অপারেশনকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। আর ২০১০-এ তারা চেচনিয়াতেও যুদ্ধের ময়দান খুলে বসে। এইভাবেই ২০০৬-এর বসন্তকালীন আক্রমণের সময় ও এর পূর্বে আল-কায়েদা, আফগান তালেবানকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছিল এবং অনেকটা প্রত্যাহার কৌশলে ফিরে গিয়েছিল। অথচ বাস্তবে তা ছিল শীঘ্রই (২০০৬-এর বসন্তকালীন) আক্রমণের পরিকল্পনা, যাতে তারা আমেরিকার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে। আর আল-কায়েদা এই উদ্দেশ্যে ময়দানকে ভালোভাবেই প্রস্তুত করেছিল।

২০০৬-এর বসন্তকালীন আক্রমণ

উত্তর এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ওপর আল-কায়েদার অভাবনীয় নিয়ন্ত্রণ এসে পড়েছিল। তারা গোপনে গোপনে এখানে নিজেদেরকে নতুন করে সংগঠিত করে নিয়েছে। আর তার ফায়দা আফগান তালেবান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। যাতে তারা ন্যাটোর কার্যপরিধি ও অপারেশন এরিয়া সংকীর্ণ করে দিতে পারে। যারা আফগানিস্তানকে এক সহজ শিকার ভেবেছিল।

এটা সেই পথের প্রথম মাইলফলক ছিল, যা আল-কায়েদা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অতিক্রম করেছিল। আল-কায়েদা এই অবস্থা ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর সময়ব্যাপী সৃষ্টি করেছিল, যাতে ২০০৬ সালের মধ্যে তালেবান আফগানের ভিতর একটি প্রভাবশালী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্জাগরণ তৈরির যোগ্য হতে পারে। এই প্রত্যাবর্তন ২০০৬ সালে তালেবানের 'বসন্তকালীন আক্রমণ' নামক এক প্রকম্পিত ও ঝড়ো উত্থানের গল্প শোনায়; যেখানে বেশ কিছু নতুন চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। তালেবান পুরো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তাদেরকে, যারা এই ধারণা করে বসেছিল যে - তালেবান তো এক অতীত ইতিহাস মাত্র!

২০০৬ সালে সবকিছুই ছিল আল-কায়েদার হাতে, কিন্তু তারা নিজেরা ছিল পর্দার অন্তরালে। যেন 'আল-কায়েদা' সুতোয় তৈরি চাদর ছিল 'তালেবান'। আল-কায়েদার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল, আফগানে তালেবানের জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যুত্থান। আর এই উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর নতুন ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল সামনে আনার প্রয়োজন দেখা দিল।

২০০৫-এর পুরো সময়টা পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকাগুলোতে তালেবানের নতুন অবকাঠামো তৈরি এবং ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করার সাথে সাথে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে তালেবান ও আল-কায়েদার নেতৃত্বে আসন্ন বসন্তকালীন আক্রমণের প্রস্তুতিতে অতিবাহিত হয়েছে। এই প্রস্তুতির মধ্যে একটি ছিল ইরাকি দলসমূহের (ইরাকি আল-কায়েদা ও অন্যান্য জিহাদি দল) নেতৃস্থানীয়, অভিজ্ঞ, পোড়খাওয়া যোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে স্থানীয় যোদ্ধাদের হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র। ইরাকি এবং এবং পাকিস্তানি যোদ্ধারা মিলে এই কৌশলগত কর্মপদ্ধতি স্থির করেছিল, যা পরবর্তীতে তালেবান যোদ্ধারা ওয়াজিরিস্তানের

ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। এই যুদ্ধকৌশল বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্রবাজ পশতুন গোত্র ও আদর্শবাদী সৈনিকদের মাঝে বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে আরব, উজবেক, চেচেন ও আফগান লড়াকু সৈনিকেরা কান্দহারের পতনের পর (অর্থাৎ, ৯/১১ পরবর্তী আমেরিকান হামলার শুরুর দিকে), নতুন করে ছোট ছোট বিভিন্ন অস্থায়ী ক্যাম্পে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে গিয়েছিল। আর এই ক্যাম্পগুলো ছিল উত্তর এবং দক্ষিণ ওজিরিস্তানের একদম প্রাণকেন্দ্রে।

আফগানদেরকে কারজাই সরকার ও পশ্চিমা জোটগুলোর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধে নামানোর পরিবর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে তালেবান গ্রুপগুলোকে সুসংগঠিত করা ছিল আসলেই এক বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। আর এর ফলাফল ছিল ২০০৬ সালের বসন্তকালীন হামলার সফল আত্মপ্রকাশ। যদিও সর্বপ্রথম সেই দুষ্ট দলটিকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন ছিল, যারা বারংবার তালেবানের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে কলহ সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করে চলছিল।

এই দুই গোত্রীয় এলাকার (উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান) সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটো দলকে নতুনভাবে বিন্যাস্তকরণ ও ঐক্যবদ্ধকরণ ছিল আল-কায়েদা, মোল্লা উমার ও তালেবানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রধান লক্ষ্য। ফলাফল হিসেবে তারা চাইছিলেন - এই কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানের শক্তিশালী আমেরিকান যুদ্ধযন্ত্রের ওপর জানবাজ হামলা করা এবং পশ্চিমা মিডিয়া প্রভাবিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে দক্ষিণ আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী গোত্রীয় এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা; যার দ্বারা তালেবানের সফল প্রত্যাবর্তন এবং আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হওয়াটা সহজতর হবে। তবে ব্যাপক হৈচৈ পড়ে যাওয়া এবং প্রসিদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ২০০৬ সালের প্রত্যাবর্তন প্রথমদিকে আসলে সাধারণ একটি অপারেশন ছাড়া আর তেমন কিছু ছিল না। সাধারণের মাঝে এমনটাই গেঁথে গিয়েছিল যে - তালেবানের ২০০৬ সালের আক্রমণ অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বে, তাদের চলমান হামলা গরমের মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে, আর মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠাতা আল-কায়েদা ও তালেবান খুব শীঘ্রই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাবে।

এইসব কিছুর শুরু ছিল ২০০৬ সালের মে মাসের শেষের দিকে, যখন তালেবান সেন্ট্রাল কমান্ডের পক্ষ থেকে বাহ্যিকভাবে দেখতে অগুরুত্বপূর্ণ একজন দূতের ওয়াজিরিস্তান সফর করলেন। এই দূত ছিলেন কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় প্রসিদ্ধ, এক পা ওয়ালা একজন

ফৌজি কমান্ডার। এই অঞ্চলে (ওয়াজিরিস্তানে) তাঁর আবির্ভাব যেন তালেবানের ভাগ্য পরিবর্তনের অসিলা ছিল। তিনি আর কেউ নন, মোল্লা দাদুল্লাহ। আফগানিস্তান, এমনকি দক্ষিণ-পশ্চিমের গোত্রীয় এলাকাগুলোর সেনা কমান্ডারদের মাঝে এখনও তাঁর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

২০০৬ সালে তালেবানের বসন্তকালীন আক্রমণের প্রস্তুতি এক বছর আগ থেকেই চলছিল। তালেবান কাবুলের [27] বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা এটা লক্ষ্য করেনি কে আমেরিকার পক্ষে, আর কে তাদের বিপক্ষে। পুরো আফগানিস্তানের প্রায় অর্ধেক সেচ্ছাপ্রণোদিত যুদ্ধবাজ দলনেতার কাছে দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল, মুজাহিদদের সামরিক দলগুলোর মধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দলের সঙ্গে কৌশলগত মিত্রতা (strategic alliance) তৈরি হয়ে গেল। সেই দুই দলের একটি ছিল গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের ‘হিযবে ইসলামি আফগানিস্তান’, আর অন্যটি ছিল মৌলভি ইউনুস খালেস [28] এর জিহাদি দল। এই দুটো দলেরই ছিল এক বিশেষ অর্জন। তারা সোভিয়েত রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে তাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু যেহেতু এই দুই দলের মাঝে এক ধরনের রেষারেষি চলে আসছিল, তাই মুজাহিদদের এই দল দুটোকে হামিদ কারজাই (তৎকালীন আফগান সরকার) বিরোধী একক শিবিরে ঐক্যবদ্ধ করাটা তালেবানের উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক বিজয়ই ছিল বলা যায়। একইসাথে পশতুন কমান্ডারগণ এবং তাদের উজবেক ও তাজিক শত্রু দলগুলোকে কারজাই বিরোধী শিবিরে একত্রিত করাও ছিল তালেবানের এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক লক্ষ্য।

অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তালেবান গ্রুপগুলোর নিজেদের মধ্যে বৈরিতা এই বিস্তর কর্মকান্ডের জন্য আলাদা এক সমস্যা ছিল। ব্যাপক রিক্রুট-সম্ভাব্য এই এলাকাগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে, তালেবানের প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাপক সহযোগিতা এবং

27. পূর্ব-মধ্য আফগানিস্তানের একটি শহর এবং আফগানিস্তানের রাজধানী। আফগানিস্তানের যুদ্ধে সমস্ত পক্ষের জন্যই কাবুল এক গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে বিবেচিত হয়।

28. মৌলভি ইউনুস খালেসের তালেবান এবং আল-কায়েদা - উভয়ের সঙ্গেই খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি ২০০৬-এর জুলাইয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছেলে আনওয়ারুল হক মুজাহিদ ছিলেন আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ পদধারী একজন, যিনি ২০০৯ সালে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ISI-এর হাতে বন্দি হন; এবং তিন বছর পর ২০১২ সালে ছাড়া পান। ২০১৬-এর আগস্টে তালেবান মুখপাত্র যবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান যে, তিনি তালেবানের আমির হিব্বাতুল্লাহ আখন্দজাদের নিকট বাইয়াতবদ্ধ হয়েছেন।

লোকবলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে একপ্রকার ব্যর্থই ছিল। এমনই এক প্রেক্ষাপটে মোল্লা দাদুল্লাহর ওয়াজিরিস্তান সফরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা দক্ষিণ-পশ্চিমে তালেবানের উত্থান ব্যর্থ হওয়ার অর্থ ছিল, পরবর্তীতে তালেবানের সফল প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসা। তাই মোল্লা দাদুল্লাহ এই বসন্তকালীন উত্থানের সফলতাকে নিশ্চিত করার জন্য নিজের সমস্ত চেষ্টাই ঢেলে দিয়েছিলেন।

মোল্লা দাদুল্লাহ তখন চল্লিশ বছরের একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। ঘন কালো দাড়ি, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন কান্দাহারি আকৃতির এই তালেবান নেতার আগ থেকেই উক্ত অঞ্চলে বেশ প্রভাব ছিল। তালেবানের এই বসন্তকালীন উত্থানের মাধ্যমে স্পষ্টতই তাদের জীবনে পরিবর্তনের আশা দেখা যাচ্ছিল। তাই বৈরী গ্রুপগুলোর মাঝে সফল সন্ধি প্রতিষ্ঠা মোল্লা দাদুল্লাহর কূটনৈতিক দূরদর্শিতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিল।

তাঁর সম্পর্ক ছিল কান্দহারের পাশেই হেলমেন্দ প্রদেশের সঙ্গে। ১৯৯৪ সালে তিনি কোয়েটার এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তালেবানের জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে আন্দোলনের শুরুতেই তালেবান শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে কাবুলের নিকটতম এক শহরের যুদ্ধক্ষেত্রে চরমভাবে আহত হন। আর পরে তাঁর একটি পা-ও কাটা পড়ে। অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে দক্ষিণের যুদ্ধক্ষেত্রে বারো হাজার বাহিনীর কমান্ডার বানিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৯০-এর শেষদিকে এসে মোল্লা দাদুল্লাহ কুন্দুজ শহরে হেকমতিয়ারের হিযবে ইসলামির শক্তিশালী যোদ্ধাদেরকে এক বিস্ময়কর বিজয়ের মাধ্যমে হটিয়ে দিয়েছিলেন। আগে ধারণা করা হতো, মোল্লা দাদুল্লাহ পাঞ্জশিরের যুদ্ধবাজ নেতা আহমাদ শাহ মাসউদের সহযোগী। কিন্তু তালেবান শাসনের শেষ বছরে (২০০১) আহমাদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে তাঁর সফল যুদ্ধ পরিচালনা সেই ধারণাকে পাল্টে দেয়। ২০০১-এর ডিসেম্বরে দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনাদল ও পশ্চিমা জোটের আক্রমণের মুখে মোল্লা দাদুল্লাহ কুন্দুজে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। স্থানীয় তালেবান কমান্ডারগণ রশিদ দোস্তামের [29] কাছে আবেদন করলেন - দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাদের সৈন্যদের জন্য যেন

29. রশিদ দোস্তাম ছিল একজন কমিউনিস্ট যুদ্ধনেতা। ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময়, দোস্তাম আফগান জাতীয় সেনাবাহিনীর হয়ে অংশ নিয়েছিল এবং উত্তরাঞ্চলের কমান্ডার হিসেবে ছিল। তখন প্রায় ২০,০০০ উজবেক সেনার দায়িত্ব নিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। রশিদ দোস্তাম খ্যাত হয়েছিল সময়ে সময়ে যুদ্ধের জয়ী দলের সাথে ভিড়ে গিয়ে।

নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে দেয়। কিন্তু রশিদ দোস্তাম তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে। আত্মসমর্পণকারী মুজাহিদদেরকে সে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন আজও (২০১১) গুয়েন্তানামা কারাগারে বন্দি। মোল্লা দাদুল্লাহ তাদের অবরোধ থেকে যেভাবে বের হয়ে এসেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ যুদ্ধকৌশল, অসামান্য বীরত্ব এবং চৌকস প্রতিভার নিদর্শন ফুটে ওঠে। তিনি কুন্দুজ শহরের প্রান্তে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে দোস্তামের একজন অফিসিয়াল কমান্ডারকে বোকা বানিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। এরপর তাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে করতে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। শেষে কান্দাহারের এক নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে তাকে ছেড়ে দেন। পরবর্তী তিন বছর উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তানে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে দেওয়া যুদ্ধে তিনি ভয়ঙ্কর সব অপারেশন পরিচালনা করতে থাকেন।

২০০৬ সালে ওয়াজিরিস্তানে মোল্লা উমারের ব্যক্তিগত দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মোল্লা দাদুল্লাহ অতি দ্রুত তালেবানের মধ্যে উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে গেলেন। তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আসলেই এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যেমনটা তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছিল।

আত্মগোপনে থাকা মোল্লা উমার তাঁর এই ঝুকিপূর্ণ মিশনের জন্য এই অভিজ্ঞ, এক পায়ের কমান্ডারকে বাছাই করার কারণ কী ছিল? এই পছন্দ কি শুধুমাত্র তাঁর ওপর মোল্লা উমারের আস্থার কারণেই ছিল, নাকি তালেবান নেতৃবৃন্দের কাছে কোনো প্রমাণ ছিল যে এমন ঝুঁকিপূর্ণ মিশনের জন্য মোল্লা দাদুল্লাহ বিশেষভাবে উপযুক্ত? নাকি শুধু তিনিই হাতের নাগালে ছিলেন, বা তাঁর বিকল্প ছিল না বিধায় তাঁকেই নির্বাচন করা হয়েছিল? কারণ যাই হোক না কেন, ফলাফল তাঁর ওপর মোল্লা উমারের আস্থারই সত্যায়ন করেছিল। এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, বহু যোগ্যতাধারী এই বার্তাবাহকের ওপর ভরসা করাটা যথাযথই ছিল।

২০০২ এবং ২০০৬ সালে তালেবানের বসন্তকালীন আক্রমণের মাঝের সময়টাতে তালেবানের শক্তিমত্তায় ক্রমবর্ধমান উন্নতির বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এদিকে সেই সময়টাতেই কারজাই সরকারের জাতীয় বোঝাপড়া এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমন সময়ে ইসলামাবাদের সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দের কাছে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ওয়াজিরিস্তানে তালেবানের সামরিক

বেইস ওয়াজিরিস্তানের পরিবেশকে পুরোপুরি পাল্টে দিচ্ছে। ডুরান্ড লাইনের [30] উভয় প্রান্তের শক্তির ওঠানামাকে তালেবান আপন স্বার্থে ব্যবহার করছে।

আফগানিস্তানের তালেবান হাইকমান্ড প্রকাশ্যে দাবি করছিল, তিন লাখ যোদ্ধা মোল্লা উমারের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছে। বাস্তবতা ছিল, অজ্ঞাত তিন লাখ আদর্শবাদী যোদ্ধা (একত্রে নয়, বরং) কারজাই শাসনাধীন বিভিন্ন শহরে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আর তালেবানের ভবিষ্যত যুদ্ধের বিজয় আদতে কয়েক হাজার তালেবান যোদ্ধা এবং ওয়াজিরিস্তানের চার হাজার বিদেশি যোদ্ধার ওপর নির্ভর করছিল। এই যোদ্ধারাই তালেবানের রাজনৈতিক এবং সামরিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমমনা গোত্রীয় জনবসতিগুলোকে তালেবানের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছিল।

ওয়াজিরিস্তানের গোত্রগুলো মনে প্রাণে তালেবানের সহযোগী ছিল। একশ বছর পূর্বে 'দ্য গ্রেট গেইম' [31] এর সমরবিদরা তাদেরকে নেকড়ের উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আর তাদের মিত্র মেহসুদ গোত্র ভূষিত ছিল চিতার অভিধায়। মেহসুদরা পাক-সেনাবাহিনীর প্রতি অনুগত ছিল। এভাবে কৌশলগত ভারসাম্য (strategic balance) বজিয়ে ছিল।

২০০৪ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের মুখে (যা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) যখন বহু সংখ্যক মেহসুদ মারা গেল, তখন পাক-সেনাবাহিনীর পরিবর্তে তালেবানের সঙ্গে তাদের মিত্রতা তৈরি হয়ে যায়। আবার ব্যবসা বাণিজ্য মন্দা যাবার কারণে ব্যবসায়ীদের গোত্র 'দাওয়ার'ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে ২০০৫ সালের সূচনার পূর্বেই ওয়াজিরিস্তানের সব গোত্র তালেবানের মিত্র হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে অনেক আরব পরিবার নিজ নিজ দেশে চলে যায়। কিন্তু আল-কায়েদার বিদেশি যোদ্ধাদের বিরাট একটি অংশ পাকিস্তানের সেইসব ঘনবসতিপূর্ণ শহরের দিকে চলে যায়, যেখান থেকে তারা পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের পাকিস্তানি দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে পারে। তাদের কিছু সংখ্যক যোদ্ধা এখনও (২০১১) গুয়ান্তানামোর কারাগারে বন্দি।

---

30. ডুরান্ড লাইন (Durand Line) হলো আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে ২,৪৩০ কি.মি. দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা।

31. 'The Great Game' হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ জুড়ে আফগানিস্তান ও মধ্য-দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলগুলোর আধিপত্য নিয়ে ব্রিটিশ ও রাশিয়ান সাম্রাজ্যের কূটনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব।

আগেই বলা হয়েছে, বসন্তকালীন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তালেবানের দুটো শাখা তখনও সক্রিয় ছিল। তারা তালেবানের একতা, উদ্যম ও কর্মকৌশলের মৌলিক তদারকি করতো। প্রথম শাখাটির নাম 'জাইশুল ক্বিবা আল-জিহাদ আল-আলমী আস-সিরি'। তাদের কাজ ছিল নতুন প্রজন্মের মুজাহিদদের মাঝে আদর্শিক চেতনা ও সামরিক শিক্ষার বিস্তার করা। এই শাখা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান স্বদেশী ও বিদেশি যোদ্ধাদের সাথে সাথে সেখানকার আপামর জনতার প্রাথমিক চেতনাগত শিক্ষা ও দীক্ষার দায়িত্ব নেয়। আর অপর বিপ্লবী শাখাটির নাম ছিল 'জুনদুল্লাহ', যারা ওয়াজিরিস্তান ও পাকিস্তানঘেঁষা এলাকাগুলোর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দাওয়াতের দায়িত্বে ছিল।

কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে করাচির এক জেনারেলের হত্যাভিযান কৌশলগতভাবে ব্যর্থ হলে জুনদুল্লাহর ভবিষ্যত একপ্রকার অন্ধকারই হয়ে যায়। এই ঘটনায় জুনদুল্লাহর হাইকমান্ড প্রশাসনের সামনে চলে আসে। ফলশ্রুতিতে জুনদুল্লাহর প্রধান গ্রেপ্তার হয়ে যান। তালেবানের বিপ্লবী ইতিহাসে এই ঘটনা যেন এই সংগঠনটির পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত ছিল।

যদিও ওয়াজিরিস্তানে পরবর্তীতে জাইশুল ক্বিবা এবং জুনদুল্লাহর অস্তিত্ব খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়, তবুও নতুন প্রজন্মের মুজাহিদদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত আদর্শিক বীজ বপন, সামরিক প্রশিক্ষণ, সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মশৃঙ্খলা তৈরিতে তারা অনেকটাই সফল হয়েছিল। এই দুই উপসংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষিত মুজাহিদরা পরবর্তী এক বছর ওই এলাকায় তালেবানের মধ্যস্তরের পথনির্দেশক হিসেবে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

এসময়েই, ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে, CIA-এর অধীনে থাকা গানশিপ হেলিকপ্টার ও পদাতিক সেনারা মিলে একটি ভারী অপারেশন শুরু করে। উক্ত অপারেশনের ফলে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা আল-কায়েদা ও তালেবান নেতাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রায় দশেরও অধিক আল-কায়েদা নেতা, যারা কিনা ওয়ানাতে নির্বিঘ্নে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল, তারা বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে আত্মগোপন করেন। এই অপারেশন তালেবানের বড় ধরনের ক্ষতিসাধন করে। নেক মুহাম্মাদের মতো কমান্ডার শহীদ হন। আল কায়েদার অনেক ট্রেনিং ক্যাম্প ধুলোয় মিশে যায়। প্রায় দেড় বছর পাহাড়ের কন্দরে লুকিয়ে কাটাতে হয় তাদের।

সেসময় আফগানিস্তানের তালেবান এবং আল-কায়েদার সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আল-কায়েদা দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। এক গ্রুপের দায়িত্ব থাকে উসামা বিন লাদেনের হাতে।

আর দ্বিতীয় গ্রুপের দায়িত্ব ছিল আইমান আজ-জাওয়াহিরির হাতে। উভয় গ্রুপই পরস্পর থেকে দূর-দূরান্তে অবস্থান করছিল। উসামা বিন লাদেন এবং আইমান আজ-জাওয়াহিরি কয়েকশত ফিদায়ি (প্রাণ উৎসর্গকারী) সাথীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। উভয়েই তখন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়েছিলেন। অন্যান্য জায়গার আল-কায়েদা ও তালেবান নেতাদের সাথে তাদের আপাত কোনো যোগাযোগ ছিল না।

শাইখ ঈসা ছিলেন আপসহীন ধরনের একজন আদর্শবাদী যোদ্ধা। এই সময় তিনি কিছু লোক নিয়ে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে অবস্থান করছিলেন। স্থানীয় আলেমদের ওপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল। আবদুল খালেক এবং সাদিক নূর নামে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রসিদ্ধ দুই আলেম তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। তখন শাইখ ঈসা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আওয়াজ তোলেন। কারণ তিনি জানতেন, আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই সফলতার পেছনে মূল হলো ভূমিকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর। ওয়াজিরিস্তানের দুরাবস্থার জন্যও তিনি পাকিস্তানকে দায়ী করেন। তিনি একথাও বলেন, যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আফগানিস্তানে যায় কিন্তু আমেরিকার সহযোগী ও মিত্র পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে ছেড়ে দেয়, তারা আসলে ভুলের ওপর আছে।[32] কারণ এখানকার মূল যুদ্ধ তো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধেই।

তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা শক্তি অর্জন করার পরপরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। বস্তুত তাদের এই কর্মকাণ্ড ছিল স্বপ্রণোদিত এবং আল কায়েদার প্রাথমিক মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাতে এতটা ভাবনারও কিছু ছিল না। কেননা অনেক অভিজ্ঞ কমান্ডার, আদর্শ প্রচারক দাঈ ও কয়েকটি গ্রুপ এখানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। অপরদিকে আল-কায়েদার মূল উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীকে পরাজিত ও পরাস্ত করা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানে আল-কায়েদার জিহাদি কার্যক্রম ও অপারেশন পরিচালনা কেবল এজন্যই ছিল, যেন আমেরিকার তথাকথিত ‘War on Terror’ তথা ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’-তে পাকিস্তান নিজ সহযোগিতা কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

এখানে উজবেক নেতা তাহের ইয়ালদোভিচ নেতৃত্বে যে শক্তিশালী যুদ্ধবাজ দলটি কাজ করছিল, তাদের কথা না বললেই নয়। তাহের ইয়ালদোভিচ আল-কায়েদা এবং

32. অর্থাৎ পাকিস্তানি বাহিনী কাফির আমেরিকার সাথে মিত্রতা করে ইরতিদাদে লিপ্ত হয়েছে। তাই তাদের বিরুদ্ধেও সমানভাবে জিহাদ করতে হবে।

তালেবানের মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে খানিকটা কট্টরপন্থী মানুষ ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কয়েকশত উজবেক সেনা কাজ করছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তাঁর কঠোরতার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। ইয়ালদোভিচ নিজে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে থাকতেন, কিন্তু তাঁর অধীনস্থ কিছু সেনা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মীর আলিতে ছিল।

এক পর্যায়ে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সেনারা ইয়ালদোভিচের সাথে সম্পর্ক না রাখার সিদ্ধান্ত নিল। কেননা তিনি আফগানিস্তানের চেয়ে উজবেকিস্তানকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। এছাড়াও তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানের আবদুল্লাহ মেহসুদের মতো একজন দক্ষ কমান্ডারের নিয়মিত সাহায্য পাচ্ছিলেন। মেহসুদ আমেরিকার হামলার সময় গ্রেপ্তার হয়ে ২০০৪ পর্যন্ত বন্দি ছিলেন। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকের এক লড়াইয়ে তাঁর একটি পা কাটা পড়ে। আবদুল্লাহ মেহসুদ নেক মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে সফলতার সাথে তালেবান সেনাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। নেক মুহাম্মাদের শেষ অভিযানে তিনি বহু কষ্টে গ্রেপ্তারি থেকে কোনোভাবে রেহাই পান এবং ঘোরতরভাবে আহত হন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তাহের জানের (তাহের ইয়ালদোভিচ) সাথে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো জনসম্মুখে উপস্থিত হন।

আফগান কমান্ডার জালালউদ্দিন হাক্কানির ছেলে সিরাজউদ্দিন হাক্কানি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এবং বাইতুল্লাহ মেহসুদ দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ছিলেন। যাদেরকে তাঁরা কমান্ড করছিলেন, তারা শুধু আফগানিস্তানের প্রতিরোধযোদ্ধাদের সহযোগী ছিল। ওয়াজিরিস্তানের পাহাড়ি খানা খন্দকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা তালেবানের এই বিক্ষিপ্ত গ্রুপ বিরমাল, শাওয়াল, সাকাই এবং অঙ্গোরাডায় লুকিয়ে ছিল। বলা যায়, এদিকের পাহাড়গুলো বৈশ্বিক মুজাহিদদের উপস্থিতিতে জমজমাট ছিল। এই প্রাকৃতিক দুর্গতূল্য অঞ্চলটি পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তাদের জন্য অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিল। তাদের হিট এন্ড রান (hit and run) তথা 'আক্রমণ করেই সরে যাও' ধরনের যুদ্ধকৌশল [33] পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে একদম ক্লান্ত করে ছেড়েছিল। ইরাকি প্রতিরোধযোদ্ধাদের থেকে তারা দুটো অস্ত্র, রিমোট কন্ট্রোল বোমা - শুধু এই হালকা অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল, যা ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি পুতুলসেনাদেরকে তাদের হেড কোয়ার্টারে আটকে রাখার জন্য এই সামান্য অস্ত্রবারুদই যথেষ্ট ছিল।

---

33. এই ধরনের যুদ্ধকৌশলকে 'গেরিলা' যুদ্ধকৌশল বলা হয়।

এই সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয় ছিল মুজাহিদদের প্রথম সফলতা। আর এই সাফল্য ও বিজয়ের ফলে দৃঢ়চেতা আদর্শবাদী যোদ্ধাদের জন্য সেখানে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব পুরোপুরিভাবে নিঃশেষ করে দেওয়াটা অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর পরবর্তী সময়ে মুজাহিদরা এই সাফল্যের যথাযথ সদ্ব্যবহারও করতে সক্ষম হয়। এই সফলতার সূত্র ধরেই ২০০৫ পর্যন্ত তারা ওয়াজিরিস্তান এলাকা পরিপূর্ণভাবে শাসন করে।

কিন্তু ২০০৫ সালের শেষ দিকের একটি ঘটনা পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে দেয়। আফগানিস্তানের এক ডাকাত - হাকিম খান যারদান - আর তার একদল সশস্ত্র দস্যুর সাথে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তালেবানের একটি গ্রুপের যুদ্ধ হয়েছিল। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তালেবান সেখানে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বেঁচে যাওয়া দস্যুদের গ্রেফতার করে তাদের কর্তিত মাথা ও মাথাবিহীন ধরগুলো দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ডান্ডে দারপা খেল এলাকার আশেপাশে লটকে দিয়েছিল; যাতে তাদের ভীতি সবখানে ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালেবানের ইসলামি ইমারাহ ঘোষণার পরপরই স্থানীয় উলামা ও গোত্রপ্রধানদের নিয়ন্ত্রিত শতাব্দীরও বেশি সময়ের পুরোনো প্রাশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। এরপর উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্থায়ী জনবসতিগুলোতে পাকিস্তানি তালেবানে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। সেসময় কাশ্মীরের জন্য ক্যাম্পিং করে থাকা বেকার যোদ্ধারা তালেবানে যোগ দেওয়ার জন্য হাজারে হাজারে এসে জড়ো হয়। কিছুদিন পর পাকিস্তানি তালেবান যোদ্ধারা মিরান শাহের দিকে মার্চ করতেই পাকিস্তানি সিকিউরিটি ফোর্স কোনোপ্রকার গোলাগুলি ছাড়াই রণে ভঙ্গ দেয়। তারা পেশোয়ারে নিয়োজিত (পাকিস্তানি) গ্যারিসন কমান্ডারকে জানায়, যুদ্ধবিরতি ছাড়া তারা কোনো ধরনের হামলায় জড়াতে রাজি না। এর পরপরই যখন পাকিস্তানি সেনারা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিশাল বহর নিয়ে তালেবানের বিরুদ্ধে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য আসে, তখন তালেবান যোদ্ধারা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু এর আগেই তালেবান দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আদালত ও পুলিশের নিয়মনীতি চালু করে রেখেছিল। অথচ তখন পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্স তাদের হেড কোয়ার্টারে বসে বসে আরাম করছিল; আর পাকিস্তানি তালেবানও পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে কোনো ধরনের অপারেশন না করে সতর্ক অবস্থান বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এদিকে দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালেবানের ইসলামি ইমারাহের ঘোষণা দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। পাকিস্তানের শহর করাচি, লাহোর, কোয়েটা,

পেশোয়ার, বান্নু, মিরদান এবং দির থেকে দশ হাজার মুজাহিদ উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এসে পৌঁছোয়। তাদের সাথে ছিল বারো হাজারের বেশি স্থায়ী যোদ্ধা, যার মধ্যে তিন হাজারের বেশি আফগান, দুই হাজারের মতো উজবেক, চেচেন ও আরব যোদ্ধা ছিল।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তালেবানের অধিকাংশ গ্রুপ ছিল স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা গঠিত। কয়েকশ উজবেক ও কিছু আরব যোদ্ধাসহ সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় ১৩ হাজার। আর উত্তর ওয়াজিরিস্তানের ২৭ হাজার যোদ্ধাসহ তাদের সংখ্যা ছিল মোট চল্লিশ হাজারের মতো; যাদেরকে স্বয়ং মোল্লা উমার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন বসন্তকালীন আক্রমণের জন্য। কিন্তু তিনি এই পরিমাণ সৈন্যকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট মনে করেননি। তাই মোল্লা উমার মোল্লা দাদুল্লাহকে এই বার্তা নিয়ে পাঠান যে, সমস্ত যোদ্ধা যেন ওয়াজিরিস্তানে সমস্ত ধরনের ব্যস্ততা মুলতুবি রেখে আফগানে এসে তালেবানের সাথে যোগ দেয়।

পুরো ওয়াজিরিস্তানে মোল্লা উমারের বার্তাবাহকের আগমনের সংবাদ দেওয়া হলো। তাহের জান, শাইখ ঈসা, আবদুল্লাহ মেহসুদ, আবদুল খালেক হাক্কানি ও অন্যান্য স্থানীয় উলামা ও জিহাদি কমান্ডারদেরকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে একত্রিত হওয়ার আহ্বান করা হলো। মোল্লা দাদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ মোল্লা উমারের চিঠির অনুলিপি বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করলেন এবং কোথাও কোথাও নিজেই তা পড়ে শোনালেন।

চিঠিতে এরকম লেখা ছিল —

> *“এক্ষণি যেন পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্সের ওপর আক্রমণ বন্ধ করা হয়। এর দ্বারা কেবল বিশৃঙ্খলাই তৈরি হবে, ইসলামের জন্য জিহাদে যেটার কোনোই অংশ নেই। জিহাদ চলছে আফগানিস্তানে।*
>
> *অতএব, আপনারা নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে আমেরিকা ও তার কাফির মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আফগানিস্তান পৌঁছে যান।”*

নির্জনপ্রিয়, এক চোখের অধিকারী [34] মোল্লা উমার তালেবান কমান্ডারদের পারস্পরিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও সকলের ঐক্যের মানদন্ড ছিলেন। বার্তাবাহক মারফত তাঁর

34. মোল্লা উমার আফগানিস্তানে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জিহাদে ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন।

পাঠানো চিঠি সকলের ওপর জাদুর ন্যায় প্রভাব ফেলেছিল; এবং এর দ্বারা পরবর্তীতে ওয়াজিরিস্তানের জিহাদি গ্রুপগুলোর সাথে পাকিস্তানি বাহিনীর শান্তিচুক্তির পথ তৈরি হয়েছিল। মোল্লা উমারের সেই চিঠির ফলস্বরূপ, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের চল্লিশ হাজার সৈন্যের অধিকাংশই পাকিস্তানি সিকিউরিটি ফোর্সের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে, এবং ওয়াজিরিস্তানের তালেবান যোদ্ধারা আরেকবার আফগানিস্তানে হিজরত করবার প্রস্তুতি নেয়। এর পূর্বে তারা সবাই ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল, বিরমাল ও সাকাইয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলেন। মোল্লা দাদুল্লাহ যখন তাদের কাছে বার্তা নিয়ে আসেন, তখন তাদের কর্মব্যস্ততা কমে যায়।

মোল্লা দাদুল্লাহ ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের থেকে প্রাপ্ত অডিও, ভিডিও সিডিগুলোর প্রদর্শনী করেন। আবু মুসআব যারকাউয়ির প্রতিনিধি হিসেবে ইরাকি যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ২০০৬-এর মার্চ মাসে উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি এবং মোল্লা উমারের সাথে সাক্ষাতের জন্য আফগানিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানে আসেন। এবং ওই প্রতিনিধি দল যারকাউয়ির পক্ষ থেকে মোল্লা উমারের হাতে বাইয়াত প্রদান করেন। এই প্রতিনিধি দল তাদের সাথে কিছু উৎসাহ জাগানো, ফিদায়ি (আত্মোৎসর্গী) হামলার প্রশিক্ষণমূলক ভিডিও সিডি ক্যাসেট সাথে নিয়ে এসেছিল।

মোল্লা দাদুল্লাহ যখন ওয়াজিরিস্তানে আসেন, তখন তাঁর কাছেও এই জাতীয় কিছু সিডি ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর কাছে এমন কিছু বয়ান ও চিঠিপত্র ছিল, যেগুলোয় আরব উলামায়ে কেরাম এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, কীভাবে এবং কেন ফিদায়ি হামলা করা জায়িজ। এর পূর্বে আফগানের ইতিহাসে ফিদায়ি হামলার তেমন ধারণা ছিল না। কেননা, এই অঞ্চলে তখনও পর্যন্ত ইসলামে ফিদায়ি হামলাকে জায়েয মনে করা হতো না। সেজন্যই কট্টর আফগান সমাজকে ফিদায়ি হামলাকে একটি যুদ্ধকৌশল হিসেবে ব্যবহার করার ওপর সন্তুষ্ট করানো মুশকিল ছিল। তবে এর কিছুদিন পূর্বে থেকেই আফগানে কিছু কিছু ফিদায়ি হামলার ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল একপ্রকার বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মোল্লা দাদুল্লাহ ফিদায়ি হামলাকে বৈধ আখ্যা দিয়ে অডিও ও ভিডিও বার্তাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই বার্তাই দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, কীভাবে ইরাকি যোদ্ধারা ফিদায়ি হামলাকে যুগ যুগান্তর ধরে একটি প্রভাব বিস্তারকারী রণকৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে।

যুদ্ধবিদ্যার তুলনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তালেবান এবং ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতিনিধিদের মাঝে ২০০৫ সালে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহু তালেবান কমান্ডাররা ছাড়াও ইরাকি বাহিনী থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোল্লা মাহমুদুল্লাহ হক ইয়ারও জানতেন যে, ফিদায়ি হামলাকে কীভাবে একটি আক্রমণের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর পূর্বে যদিও তালেবানের জানা ছিল যে - অন্যরা ফিদায়ি অপারেশন করে থাকে, কিন্তু তাদের নিকট এমন লোকের সংখ্যা খুব কম ছিল, যারা স্বেচ্ছায় ফিদায়ি হামলায় অংশগ্রহণে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে। মোল্লা দাদুল্লাহর মিশন এই ক্ষেত্রেও সাফল্য বয়ে আনলো। তিনি উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, ওয়াজিরিস্তান এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগমনকারী দলসমূহের মাঝে ফিদায়ি হামলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সফলতার সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ফিদায়ি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভাব্য প্রথম দলটি প্রশিক্ষণের জন্য কুনার উপত্যকায় পৌঁছে গেল। মোল্লা দাদুল্লাহ সত্তরজন নারীসহ সাড়ে চারশত ফিদায়ি হামলাকারীর একটি গ্রুপ তৈরি করে ফেললেন।

আফগানিস্তানে আগ্রাসী শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, কিন্তু নারীদের কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে কোনোরকম কৃতিত্ব ছিল না। ফিদায়ি অপারেশনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করা নারী দলটির বেশিরভাগ সদস্যরাই ছিলেন আফগানিস্তান এবং ওয়াজিরিস্তানে শহীদ হওয়া আরব এবং মধ্যএশীয় যোদ্ধাদের স্ত্রীরা। এছাড়াও ওয়াজিরিস্তানের কিছু নারীরাও তাদের ভাই এবং পিতামাতার অনুপ্রেরণায় সেই দলে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। [35]

ফিদায়ি হামলাকারীদের এই প্রথম দলটি কেবল একটি নমুনা স্বরূপ ছিল। আগত দিনগুলোতে ক্রমশ ফিদায়ি হামলাকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াটা ওয়াজিরিস্তানে তালেবান মুখপাত্রের সুস্পষ্ট সফলতার লক্ষণ ছিল।

এদিকে যখন এই ঘটনা চলছিল, তখন তালেবান কয়েক হাজার সৈন্য এবং স্থানীয় যুদ্ধবাজ সরদারদের সহযোগিতায় আফগানিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় আত্মপ্রকাশ শুরু করে দিয়েছে। যদি ওয়াজিরিস্তানে বিদ্যমান চল্লিশ হাজার যোদ্ধাকেও তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হতো, তাহলে তখনই বড় ধরনের অভিযান শুরু করে দেওয়া যেত।

35. কিন্তু উলামা এবং মুজাহিদ কমান্ডারদের পরামর্শে তালেবান এবং আল-কায়েদার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো নারী ফিদায়ি হামলায় অংশগ্রহণ করেনি।

তালেবান এই হামলার সুপ্রিম কমান্ড ন্যস্ত করেছিল অভিজ্ঞ জালালউদ্দিন হাক্কানির হাতে। জালালউদ্দিন হাক্কানিকে সুপ্রিম কমান্ডার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত তালেবানের এমন এক কৌশল ছিল, যার দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগেই উত্তরদিকে কাবুলের সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য ছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা স্থির করে এরপর কাবুলের দিকে অগ্রসর হবে।

এই সময়ে বিভিন্ন এলাকার দশজন কমান্ডারের সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। মোল্লা উমারের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাহ আখন্দকে এই দলের মুখপাত্র নিয়োগ করা হয়, যেন তিনি সরাসরি মোল্লা উমার থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে অন্যান্য কমান্ডারদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন, এবং তাদের খবরাখবর মোল্লা উমারের কাছে পৌঁছাতে পারেন। যাতে যেকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়। সকল কমান্ডারদের, বিশেষ করে মোল্লা দাদুল্লাহর মূল দায়িত্ব এটা ছিল যে, আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা থেকে সরকারি রিট (বিচার ব্যবস্থা) উৎখাত করে দেওয়া।

জালালউদ্দিন হাক্কানির দায়িত্ব ছিল এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শত্রুদেরকে পরিপূর্ণ ভীতসন্ত্রস্ত করে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব, পশ্চিমে তাড়িয়ে দেওয়া। যাতে করে তালেবানের অন্যান্য দলগুলো আসার আগেই কারজাই ব্যবস্থাপনা ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়।

বৃদ্ধ, হালকা-পাতলা ও ছোট গড়নের অধিকারী কমান্ডার জালালউদ্দিন হাক্কানি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অর্জন করা সকল জয়ের রেকর্ড সংগ্রহে রেখেছিলেন। তাঁর সর্বপ্রথম বিজয় ছিল সেটি, যেখানে মুজাহিদরা ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট সরকারকে পরাজিত করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডক্টর নাজিবুল্লাহর পিতৃ এলাকা খোস্তের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। খোস্ত বিজয় কাবুল বিজয়ের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল।

এরপর যখন তালেবানের উত্থান হলো, তখন আফগানিস্তানের অন্যান্য নীতিনির্ধারক ও কমান্ডারদের বিপরীতে একমাত্র জালালউদ্দিন হাক্কানিই এমন একজন কমান্ডার ছিলেন, যিনি নিঃশর্তে তালেবানের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। হাক্কানি কোনো তালেব ছিলেন না। আর না তিনি এই আন্দোলনে কোনো অংশ নিয়েছিলেন। তাই তালেবান প্রথমদিকে তাঁকে তেমন একটি গুরুত্ব দেয়নি। তিনি সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়াবলির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণের কোনো বিষয়ে তাঁর সাথে কখনো পরামর্শ করা হয়নি। এতকিছু সত্ত্বেও যখন তালেবান ২০০১ সালে পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল,

তখন এই অভিজ্ঞ কমান্ডার তাঁদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন - খোস্ত, পাকতিয়া, এবং পাকতিকার প্রদেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ যেন না ছাড়ে, এবং আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে গারদিজকে নিজেদের অগ্রগামী মোর্চা বানায়। কিন্তু তালেবান নেতৃত্ব সে সময় তাঁর পরামর্শ সত্ত্বেও সকল প্রদেশ খালি করে পিছু হটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তারপরও জালালউদ্দিন হাক্কানি সবসময়ই মোল্লা উমারের অনুগত ছিলেন। এমনকি ওই সময়ও, যখন পাকিস্তান এবং আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণের পূর্বে তাঁকে ইসলামাবাদ ডেকে নিয়ে তালেবান যোদ্ধাদের একাংশ নিয়ে মধ্যমপন্থী একটি গ্রুপ তৈরি করে এর নেতা হতে এবং মোল্লা উমারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ফুঁসলিয়েছিল।

সকল বিদেশি যোদ্ধা যারা তোরা-বোরা, কাবুলসহ যুদ্ধের অন্যান্য ময়দান থেকে পিছু হটেছিল, তারা হাক্কানির নিকটে আশ্রয় নিয়েছিল। হাক্কানি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে নিজের ঘরে তাদের সবাইকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যারা তাঁর সাথে থাকতে চেয়েছিল, তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর যারা চলে যেতে চেয়েছিল, তাদের জন্য নিরাপদ রাস্তার ব্যবস্থা করেছিলেন জালালউদ্দিন হাক্কানি।

হাক্কানি ২০০৬-এ আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এলেন, যখন মোল্লা উমার তাঁর প্রকৃত ওজন সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে যথার্থ মূল্যায়ন করলেন। তাঁকে অর্থ, জনবল এবং প্রয়োজনীয় সকল উপায় উপকরণ সরবরাহ করা হলো এবং আফগানিস্তানের যেকোনো এলাকায় কাজ করার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলো। এখনও তালেবানের মাঝে, মোল্লা উমারের পর তিনিই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

জালালউদ্দিন হাক্কানি চেহারায় যৌবনের দীপ্তি ফুটিয়ে তোলার জন্য দাঁড়ি এবং চুলে সুন্নাহ অনুযায়ী মেহেদি ব্যবহার করতেন। আফগানিস্তানের সকল তালেবান কমান্ডারদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল - সে উজবেক হোক, হোক তাজিক কিংবা পশতুন।

সকল ফিদায়ি যোদ্ধারা তাঁর কমান্ডে ছিলেন। তাঁদের আত্নত্যাগে তিনি আফগান রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হেরাত, কাবুল, কান্দাহার, কুন্দুজ এবং জালালাবাদকে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন করে চলছিলেন। যখন দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে তালেবানের আক্রমণের সূচনা হলো, তখন তিনি ফিদায়ি হামলার জন্য সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সময়ের অভিজ্ঞ কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করার কর্মপরিকল্পনা ঠিক করছিলেন।

২০০৬ সালে তালেবানের বসন্তকালীন হামলার জন্য তালেবান কমান্ডারদের নতুন অবকাঠামোর মাধ্যমে আফগানিস্তানের ভূমিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের অভ্যুদয় ঘটে —

• মোল্লা দাদুল্লাহ —

মোল্লা দাদুল্লাহ ওয়াজিরিস্তানে সফলতা অর্জনের আগেও মোল্লা উমারের পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে 'কমান্ডার ইন চীফ' হিসেবে নির্বাচিত ছিলেন। সেখানকার গোটা শহর ও অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। এক পায়ের হওয়া সত্ত্বেও তিনি মিডিয়ার ব্যাপারে শিথিল ছিলেন। অন্যান্যদের বিপরীতে নিজের ছবি তোলার ব্যাপারে বাধা দিতেন না। তাঁর যখন ইচ্ছা হলো, আফগান বাহিনীকে সফলভাবে পরাজিত করলেন এবং ঐক্যবদ্ধ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। ২০০7 সালে হেলমান্দে বিমান হামলায় মোল্লা দাদুল্লাহ শহীদ হন।

• মৌলভি আবদুল কবির —

তালেবান সরকারের আমলে নাঙ্গাহার জেলার গভর্নর মৌলভী আবদুল কবির নিজেকে প্রথমে অন্তরালেই রেখেছিলেন। মোল্লা দাদুল্লাহ এবং জালালউদ্দিন হাক্কানির তুলনায় তাঁর অধীনে তেমন শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল না। তালেবানের যুগে বা এর আগেও খুব বড় ধরনের কোনো কৃতিত্বও তাঁর ছিল না। এরপরও তিনি মোল্লা উমাররের একান্ত আস্থাশীল ও অনুগত হিসেবে পাকতিয়া জেলার একদল তালেবানের কমান্ডার ছিলেন।

• কমান্ডার মুহাম্মাদ ইসমাঈল —

তিনি ছিলেন কুনার জেলার চীফ কমান্ডার। কুনার জেলা তালেবানের জন্য কখনোই শান্তিপূর্ণ অঞ্চল ছিল না। কুনার এবং এর পাশের জেলা নুরিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল সালাফি মতাদর্শের। ইসমাঈলের অধীনের ঘাঁটি ছিল সীমাবদ্ধ। তিনি কুনারের পেচদারা এলাকায় নিজ ঘাঁটি পেতেছিলেন এবং আরব ও চেচেন যোদ্ধাদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলেন। ফিদায়ি হামলা এবং IED [36] ছিল তাঁর প্রধান হাতিয়ার।

---

36. Improvised explosive device বা IED হলো এমন এক ধরনের বোমা যা প্রচলিত সামরিক কৌশল থেকে ভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়।

• কাশ্মীর খান —

৯/১১-এর পরে হেকমত ইয়ার এবং তালেবান সেনাবাহিনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগে হেকমত ইয়ারের বিশ্বস্ত কমান্ডার হিশেবে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। বর্তমান কাশ্মীর খান একজন স্বাধীন কমান্ডার হিসেবে শিগালের পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

• মোল্লা গুল মুহাম্মাদ ঝাঙ্গোভী —

মোল্লা গুল মুহাম্মাদের [37] বয়স ছিল তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। তালেবান সরকারের আমলে তিনি ছিলেন পোল খোমিরির কমান্ডার এবং এখন (২০১১) আরগুন, কালাত এবং কান্দাহারের সেনাদের কমান্ড করছেন। ২০০৩ সালে আমেরিকান বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে কাবুলের নিকটতম বাগরাম কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তিনি অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে জোর করে জাইশে মুসলিমে নিবন্ধিত করে দেওয়া হয়। জাইশে মুসলিম ছিল এমন একটি নকল বাহিনী, যেটাকে আমেরিকা মোল্লা উমারকে তালেবানের নেতৃত্ব থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে তালেবানের মাঝেই সৃষ্টি করেছিল। গুল মুহাম্মাদ যখন মুক্তি লাভ করেন, তখন জাইশে মুসলিমের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তিনি প্রায় ১৬০০ সদস্যের একটি বহিনী নিয়ে তালেবানের শিবিরে দ্বিতীয়বারের মতো যোগ দেন। এখন (২০০১) তিনি তালেবানের একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার এবং তালেবান আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

37. তাঁর কাছ থেকে এই বইয়ের লেখকের সেলিম শেহজাদের ২০০৬ সালে পাক-আফগান সীমান্তে একটি ইন্টারভিউ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

তালেবানের নতুন কর্মপন্থা

তালেবানের নতুন কৌশল এক ভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। বিশেষ করে সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে। আজকে তালেবানের গেরিলা অপারেশনগুলো পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। ন্যাটো সেনাবাহিনী দক্ষিণ ও পূর্ব আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অপারেশন চালিয়েছে, কিন্তু তালেবান তাদের যথাযথ মোকাবেলার সাথে সাথে শক্তভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিতও রেখেছে।

৯/১১-এর পর আল-কায়েদা ও তালেবানের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ২০০৫-এ এসেই পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে, যখন আল-কায়েদা ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করে এবং হাজার হাজার গোত্রীয় যুবক, আফগান, পাকিস্তানি ও বিদেশি যোদ্ধাদের একতাবদ্ধ করতে সফল হয়।

পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা ‘জাট’-কে আফগান যুদ্ধের জন্য সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তালেবান কুনার, নানগারহার, খোস্ত, পাকতিকা, পাকতিয়া, গারদিজ, উরজুগান, যাবেল, কান্দাহার ইত্যাদি অঞ্চলে বিজয় অর্জন করে। এমনকি তাঁদের সফল কর্মকাণ্ডের কারণে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের নিজেদের আধিপত্যও বজায় ছিল। এতে তাদের এই সুবিধা হয়েছিল যে, সেখানে থেকে হেলমান্দ প্রদেশে সফল অপারেশন পরিচালনা করতে পারছিল। হেলমান্দে ন্যাটো জোটের বিরুদ্ধে আল-কায়েদা তালেবানের ভয়াবহ লড়াই চলছিল।

২০০৬-এর বসন্তকালীন আক্রমণের পর হেলমান্দের অনেক এলাকাই তালেবানের দখলে চলে আসে। আমি যখন ২০০৬-এর নভেম্বরে হেলমান্দ যাই, তখন এর গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চলগুলো তালেবানের অধীনেই দেখতে পাই। হেলমান্দের পাশেই পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা ‘গ্রামসির’। সেখান থেকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের হাজার হাজার যোদ্ধা হেলমান্দে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। গ্রসাখ, লস্করগাহ ইত্যাদি কয়েকটি শহর ছাড়া পুরো উত্তর হেলমান্দ-ই তালেবানের অধীনে ছিল। সেখান থেকে তারা বাদগীস, ফারাহ, হেরাত, নিমরোজ ইত্যাদি প্রদেশে আসা-যাওয়ার নিরাপদ রাস্তা পেয়েছিল। যে কর্মপদ্ধতি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে শুরু হয়ে হেলমান্দ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তালেবান যোদ্ধারা সেটা পুরো আফগানিস্তানে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন

ন্যাটো সৈন্যদের লাশ বহনকারী কফিনগুলো যখন পশ্চিমে তাদের দেশসমূহে পৌঁছাতে শুরু করলো, তখন তালেবান আর আল-কায়েদার উত্থানের সংবাদ নিজ থেকেই ওয়াজিরিস্তানকে তাদের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে আখ্যা দিল, যেখান থেকে তালেবান দ্বিতীয়বারের মতো জেগে উঠেছে এবং আফগানিস্তানে আমেরিকান ও ন্যাটো সৈন্যদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। তখন আমেরিকার পাকিস্তান ভিত্তিক তালেবানের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার পরিকল্পনা তৈরি করার প্রয়োজন হলো। যখন এই সংবাদ এল যে, পাকিস্তানের ওপর গোত্রীয় অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনার জন্য আমেরিকান চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন মিরানশাহ এলাকায় একটি গোত্রীয় সভা আহ্বান করা হলো। এই বিষয়ে সবাই একমত ছিল যে, মুজাহিদরা সবগুলো রণাঙ্গনে একই সময়ে সমানভাবে যুদ্ধ চলমান রাখতে পারবে না। তাই প্রথম পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে অস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প ছিল না।

অষ্টম শতাব্দীর অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একবার তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের এক সভায় তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল, "আমি এই পাগড়ি আর দাড়িগুলোর নিচে কর্তিত মস্তকগুলো দেখতে পাচ্ছি।" ঠিক এমনই একটি ধারণা ২০০৬-এর আগস্টে আমার মনেও এসেছিল, যখন আমি মিরানশাহে পাকিস্তানি তালেবান, গোত্রপ্রধান আর রাজনীতিবিদদের সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক সমাবেশে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাতেও ওয়াজিরিস্তানের আকাশে বাতাসে রক্ত ও বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। যোদ্ধারা তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে নিরাপত্তা চুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা আদতে নিরাপত্তা ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং প্রথম টার্গেট বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা কেবলই একটি অস্থায়ী কৌশল ছিল। তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের একটি অস্থায়ী কৌশলের আওতায় চলে আসার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদদের সামনে রাখা হয়েছিল।

গোত্রীয় সমাবেশে যোদ্ধারা যেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করলো। তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সব ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ একটি নিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো। যেন পূর্ববর্তী

চালগুলোর মতো এটাও তাৎক্ষণিক ঝড় মোকাবেলার কৌশল হিসেবে কার্যকর হয়। এবারের এই চুক্তি সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধি, উসমান জাঙ্গ গোত্র, অন্যান্য গোত্রীয় নেতাগণ এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তানের ধর্মীয় উপদেষ্টাদের মাঝে সংগঠিত হয়। এই চুক্তির ষোলটি প্রধান ও চারটি শাখাগত অনুচ্ছেদ ছিল। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছিল -

ক. উসমান জাঙ্গ ওয়াজিররা, স্থানীয় তালেবান, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মুরুব্বিগণ এবং গোত্রীয় জনগণ এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে,

১. আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও সরকারি সম্পত্তিতে কোনো হামলা করা হবে না। কোনো টার্গেট কিলিংও করা হবে না।

২. কোনো সমান্তরাল প্রশাসন (parallel government) [38] প্রতিষ্ঠিত করা হবে না এবং সরকারের রিটকে বহাল রাখা হবে। যেকোনো সমস্যা হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা গোত্রীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতি এবং এফসিআর (FCR- Feed Conversion Ratio) অধ্যাদেশ অনুযায়ী উসমান জাঙ্গ গোত্রের সাথে পরামর্শ করে বিষয়টি সমাধান করবে।

৩. আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে কোনো সীমান্তবর্তী সামরিক কার্যক্রম থাকবে না। তবে, স্থানীয় রীতি অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সীমান্ত পারাপারে কোনোরকম বাধা থাকবে না।

৪. উত্তর ওয়াজিরিস্তানের সংলগ্ন এলাকা ও জেলাগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতামূলক কোনো কার্যক্রম থাকবে না।

৫. উত্তর ওয়াজিরিস্তানে বসবাসকারী সকল বিদেশিগণ (মুজাহিদরা) - হয় পাকিস্তান ত্যাগ করবে, অথবা প্রচলিত আইন এবং বর্তমান চুক্তি অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে থাকবে। উপরোক্ত বিবরণগুলো সমস্ত বিদেশির জন্য কোনো ব্যবধান ছাড়া প্রযোজ্য হবে।

৬. যুদ্ধকালীন বাজেয়াপ্ত সকল সরকারি সম্পদ (যেমন: যুদ্ধযান, সাধারণ গাড়ী, অস্ত্রশস্ত্র, ওয়্যারলেস ইত্যাদি) ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

---

38. Parallel Government বা সমান্তরাল প্রশাসন এমন এক বা একাধিক সংগঠনের সমষ্টি, যা রাষ্ট্রের কাঠামোয় (আইনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা) নির্দিষ্ট অঞ্চল পরিচালনা করে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধ রাষ্ট্র বা সরকারের অংশ নয়। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও নিজেরা সমান্তরালে আলাদাভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার মতো করে বলেই এই নামে ডাকা হয়। আর এমন রাষ্টকে বলা হয় Parallel State বা সমান্তরাল রাষ্ট্র।

খ. (পাকিস্তান) প্রশাসন এই চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে যে,

১. যুদ্ধকালীন গ্রেপ্তারকৃত সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, এবং পূর্বোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হবে না।

২. প্রশাসন সকল রাজনৈতিক সুবিধা ছেড়ে দিবে।

৩. রাস্তায় নতুন প্রতিষ্ঠিত চেকপোস্টগুলো প্রশাসন সরিয়ে ফেলবে। আর অতীতের মতো পুরোনো চেকপোস্টগুলোতে লেভিস ও খাসসাদার নিয়োগ দিবে।

৪. প্রশাসন যুদ্ধকালীন সময়ে জব্দকৃত সকল অস্ত্র ও গাড়ি ফিরিয়ে দিবে।

৫. এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রশাসন সব ধরনের পদাতিক ও আকাশপথে আক্রমণ বন্ধ করে দিবে, এবং সকল সমস্যার সমাধান গোত্রীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতি অনুযায়ী করবে।

৬. সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের সকল সম্পূরক ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে।

৭. গোত্রীয় ঐতিহ্য অনুসারে অস্ত্র বহন করার ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না। তবে ভারী অস্ত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ অব্যাহত থাকবে।

৮. চুক্তির বাস্তবায়ন চেকপোস্টগুলো থেকে ব্যারাকে সেনাবাহিনী ফিরে আসার মধ্য দিয়ে শুরু হবে।

গ. বিবিধ

১. চুক্তি অনুযায়ী দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। যেখানে আলেম উলামা ও রাজনৈতিকদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। এই কমিটির দায়িত্ব হবে —

ক. সরকার ও উসমান জাঙ্গী গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা।

খ. এই চুক্তিপত্রকে দ্বিতীয়বার দেখে এর প্রয়োগকে কার্যকর করা।

২. যদি কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ (স্থানীয় হোক বা বিদেশি) যদি এই চুক্তির অনুগত না হতে চায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্ববর্তী চুক্তিগুলোর বিপরীতে, এই চুক্তিটি 'মুজাহিদিন' বা 'তালেবান' এই জাতীয় শব্দের উল্লেখ ছাড়াই ছিল। আর যদিও এই চুক্তিটিতে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কমান্ডারগণ - হাফিজ গুল বাহাদুর, মাওলানা সাদেক নূর এবং মাওলানা আবদুল খালেক স্বাক্ষর করেছিলেন, তবুও এটি ছিল মূলত পাকিস্তান সরকার ও উসমান জাঈ গোত্রের মধ্যেই।

এটি এজন্য করা হয়েছিল যে, যোদ্ধারা আমেরিকাকে দেখাতে চেয়েছিল যে, তাদের ভূখণ্ডে যে কোনো নতুন সামরিক অভিযান অপ্রয়োজনীয়। কারণ গোত্রীয় নেতারা শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।

এই শান্তিচুক্তির ফলস্বরূপ পাকিস্তানি সরকারের পক্ষ থেকে যোদ্ধাদের কাছে অজানা পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছিল। চুক্তিতে উল্লেখিত 'বিদেশি' দ্বারা আল-কায়েদা এবং অন্যান্য বিদেশি যোদ্ধারা উদ্দেশ্য ছিল। চুক্তি মেনে পাকিস্তান সরকার প্রায় একশত তালেবান ও আল-কায়েদার সাধারণ সৈনিক ও কমান্ডারকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

মিরানশাহের ফুটবল স্টেডিয়ামে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোদ্ধারা সুরক্ষা কভার সরবরাহ করেছিল। আর তখন আল-কায়েদার কালো পতাকা স্টেডিয়ামের স্কোরবোর্ডের ওপর পতপত করে উড়ছিল।

শেষমেশ এই শান্তিচুক্তিটি ২০শে মে, ২০০৭-এ ভেঙ্গে যায়, কেননা আমেরিকা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছিল এবং যোদ্ধারাও তাদের নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিল।

৯/১১-এর পরে জন্ম নেওয়া কর্মপন্থাটি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও হেলমান্দে প্রসারিত হওয়ার পর যুদ্ধ তখন পরবর্তী স্তরে এসে পৌঁছেছিল। আমেরিকা ও পাকিস্তান গোত্রীয় অঞ্চলগুলোতে সামরিক অভিযান চালানোর দিকে মনোনিবেশ করার কারণে যোদ্ধারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল পাকিস্তানের শহরগুলোর দিকে। আর ২০০৭ সালের শেষের দিকে এসেই যুদ্ধের পরিধি পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকার ক্রোধ

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৭-এ বিচলিত অবস্থায় ডিক চেনি (তৎকালীন আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট) ইসলামাবাদে আগমন করেন, এবং তালেবানের বসন্তকালীন আক্রমণের ফলশ্রুতিতে ওয়াশিংটনের ক্রোধের বর্ণনা দেন; কেননা আমেরিকা এমন আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলনা। ২০০৬ সালের শেষদিকে আমেরিকা বুঝতে পেরেছিল যে, আল-কায়েদা আর তালেবান পাকিস্তানের গোত্রীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করছে, কিন্তু তাদের চলমান নতুন বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তান তো তাদের হাত থেকে ছুটেই গিয়েছিল। তালেবান আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশ এবং কান্দাহার প্রদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা শাসন করছিল। এছাড়া উরুজগান এবং কাবুলের পরিস্থিতি আমেরিকার জন্য গুরুতরভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছিল। প্রথমবারের মতো জোটের সেনারা অনুভব করেছিল যে, তালেবান একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যই ডিক চেনি জেনারেল মোশাররফকে সতর্ক করেছিলেন যে, যদি তিনি পাকিস্তানি গোত্রীয় অঞ্চলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু না করেন, তবে এর ভয়াবহ পরিণতির পূর্ণ দায়ভার তার দেশ পাকিস্তানকে বহন করতে হবে।

এই সফরের সময় ডিক চেনি পাকিস্তান সরকার এবং তালেবানের মধ্যে পূর্ববর্তীতে হওয়া সমস্ত চুক্তিই দেখলেন। সেখানে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তালেবান যোদ্ধাদেরকে (সামরিক অভিযানের সময় তাদের ক্ষতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে) অর্থ দেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ ছিল। এর ভিত্তিতে তিনি হাক্কানি নেটওয়ার্কের মতো কিছু তালেবান গোষ্ঠীর সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক থাকার অভিযোগ করলেন।

পরদিন ডিক চেনি কাবুল সফর করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠে। তিনি যখন বাগরাম বিমানঘাঁটিতে ছিলেন, তখন একটি ফিদায়ি হামলায় (আমেরিকা ও ন্যাটো জোট সেনাদের) ২৩ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছিল। CIA পরে জানিয়েছিল যে, সেই হামলার পরিকল্পনা হয়েছিল উত্তর ওয়াজিরিস্তানে, আর তা করেছিল আবু লাইস আল-লিব্বি, ইতোপূর্বে যার আল-কায়েদার সাথে এতটা গভীর সম্পর্ক ছিল না।[39]

39. কিন্তু পরবর্তীতে আবু লাইস আল-লিব্বি আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আল-কায়েদার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

ডিক চেনির এই সফর দক্ষিণ এশিয়ার পরবর্তী ঘটনাবলির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হলো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলগুলো পুরোপুরিই আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণ কবলিত এবং তালেবানের শক্তির প্রধান উৎস। আর এই নতুন তথ্য পশ্চিমা দেশগুলোর চিন্তাভাবনার গতি আমূল বদলে দিয়েছিল। এর আগে পশ্চিমারা বিশ্বাস করতো যে, তালেবান ও আল-কায়েদা জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর জন্য পাকিস্তান স্রেফ নিরাপদে একটু গা ঢাকা দেওয়ার জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেসময় তাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হলো যে, এই সমস্যার মূল গোড়াই পাকিস্তান; তাই সমস্যার সমাধান করতে হলে পাকিস্তান থেকেই তা শুরু করতে হবে। আর এই নতুন উপলব্ধি মোশাররফ প্রশাসনের ওপর পাকিস্তানকে গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে আমেরিকার চাপ সৃষ্টিকে আরও জোরদার করলো।

আমেরিকা তখন পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন অব্যাহত রেখেছিল, একইসাথে সেখানে এমন একটি সরকার ব্যবস্থা চাইছিল, যা তার কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। এই চিন্তার প্রক্রিয়াটি আসলে ২০০৬ সালের তালেবানের বসন্তকালীন আক্রমণের পরে বিকশিত হয়েছিল। এবং অবশেষে ২০০৮ সালে সেটিই ওয়াশিংটনের ‘আফ-পাক’ (Af-Pak - Afghanistan-Pakistan) নীতিতে রূপান্তরিত হয় - যেখানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সমগ্র অঞ্চলকে ‘একক যুদ্ধ ময়দান’ হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলকে সমস্যার প্রধান কেন্দ্র সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

বিস্তৃত পরিসরে আমেরিকা ২০০৪ সালের জানুয়ারির পর থেকেই পর্দার আড়ালে থেকে তার ‘War On Terror’ তথা ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’-কে পুরো বিশ্বে ব্যাপক ও জনপ্রিয় করার পলিসি নিয়ে ভাবতে থাকে। আমেরিকা ভেবেছিল, পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংস্কার তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি তৈরি করে দেবে। এভাবেই ডিক চেনির পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সফর চিন্তাগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাইলফলক প্রমাণিত হয়েছিল। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে একক যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করার পর, গণতান্ত্রিক প্রচারণা ও সেটার উন্নতি সাধন ছিল আমেরিকার পরবর্তী প্রধান লক্ষ্য।

২০০৬-এর শেষ নাগাদ মোশাররফ পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার আমেরিকান ফর্মুলায় সম্মত হয়ে যান এবং ২০০৮ সালের শুরুতে, পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি-PPP) নেতৃত্বে একটি সেকুলার ও লিবারেল রাজনৈতিক জোটের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়। রাজনৈতিক জোটটির অন্যান্য সদস্য ছিল — সেকুলার পশতুন

সাবনেশনালিস্ট আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি তথা ANP, মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট (ইউনাইটেড ন্যাশনাল মুভমেন্ট) তথা MQM, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (ফজলুর রহমান গ্রুপ) তথা JII, এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ তথা PML।

নতুন এই ব্যবস্থার অধীনে মোশাররফ রাজি হয়েছিল ইউনিফর্ম ছেড়ে দিতে, পাকিস্তানে আমেরিকা অনুমোদিত চীফ অব আর্মি স্টাফ বানাতে, নিজে দেশে বেসামরিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকতে এবং 'Wan On Terror'-এর পূর্ণ তদারকি করতে। সেসময় বেনজির ভুট্টোর ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তার শাসনামলে পার্লামেন্ট খুব সহজেই ইসলামি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে আইন পাস করে ফেলতো এবং দেশে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করাও সহজ হতো। ANP এবং MQM তার ডান হাত হিসেবে কাজ করতো, আর JII তার কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় রঙ চড়িয়ে দিতো।

পরবর্তী সময়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন মিলে মোশাররফ ও বেনজির ভুট্টোর মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তি দাঁড় করায়, যার ফলে ২০০৭-এর কুখ্যাত 'এন আর ও' কর্মযজ্ঞের সময় আসে। এই 'এন আর ও' চুক্তির মাধ্যমে বেনজির ভুট্টো এবং আসিফ আলি জারদারির ওপর আরোপিত হওয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের সকল অভিযোগ উঠিয়ে নেওয়া হয়, এবং তাদেরকে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে দেশে ফিরিয়ে এনে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এই 'এন আর ও' পরিকল্পনা তৈরি করা হয় ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারিতে; আর ২০০৭-এ তা বাস্তবায়ন করা হয়। আর এর ফলশ্রুতিতেই গোত্রীয় অঞ্চলে পাকিস্তান প্রশাসনের সাথে হাফেজ গুল বাহাদুর, মাওলানা সাদেক নূর, মাওলানা আবদুল খালেকদের ২০০৬-এর সেপ্টেম্বরে করা চুক্তি ২০০৭-এর মে মাসে এসেই ভেঙ্গে যায়।

আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার আক্রমণের পরবর্তীতে হওয়া সমস্ত ঘটনার ওপর যদি পর্যবেক্ষণ চালানো হয়, তাহলে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর ব্যর্থতাই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। আল-কায়েদার পুনর্গঠন পরবর্তী রূপ ও তার সামরিক বিচক্ষণতা বুঝতে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো বারবারই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আল-কায়েদা এখানে আমেরিকার প্রতিটি চালের সফল মোকাবেলা করেছে এবং পাকিস্তানকে তালেবানের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বিজয়সূচক সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। ২০০৬-এ তালেবানের আক্রমণ ছিল এরই ফলাফল, যা আফগানে তালেবানের জন্য এক নতুন এক দিগন্ত খুলে দেয়।

নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

আল-কায়েদা এই সময় দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে চলমান ঘটনাগুলোর ওপর খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বের করলো যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আল-কায়েদার নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে আমেরিকা ঠিক কী ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক চাল চেলে যাচ্ছে। এখান থেকেই আল-কায়েদার আরব্য রজনীর আরও একটি সত্য কাহিনীর সূচনা।

আল-কায়েদার পরিকল্পনা ছিল আফগানিস্তানে বিজয় অর্জন করা এবং হেলমন্দ প্রদেশেকে পুরো রাজ্যের সামরিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য পাকিস্তানি গোত্রীয় এলাকাগুলোতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখা। কিন্তু তাদেরকে ২০০৭-এ আমেরিকান প্রতিরোধের এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এতদিনে আমেরিকা আল-কায়েদার ঠিকানা সমূহ বের করে ফেলেছে, এখন কেবল তাদেরকে ধ্বংস করার পথ খুঁজছে। আর আল-কায়েদা চাইছিল যে কোনো মূল্যে নিজের ঘাঁটি বাঁচিয়ে রাখতে। এভাবে আল-কায়েদা এবং আমেরিকার মাঝে এক স্ট্র্যাটেজিক খেলা শুরু হয়ে গেল।

পরবর্তী পর্যায়ে আল-কায়েদা পাকিস্তানের শহরগুলোতে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করা শুরু করলো, যাতে নিজেদের আস্তানাগুলোকে আমেরিকান এবং পাকিস্তানি আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়। এদিকে ২০০৭-এ আমেরিকা পাকিস্তানি বাজাউর এজেন্সির কয়েকশত মিটার দূরত্বে কুনার প্রদেশে একটি ঘাঁটি নির্মাণ করা শুরু করে দেয়। এমনিভাবে আফগানিস্তানে পাকিস্তানি গোত্রীয় এলাকাগুলোর আশপাশে আমেরিকার কয়েকটি চৌকিও নির্মাণাধীন ছিল। এর পাশাপাশি আমেরিকা পাকিস্তানের সাথে গোপনে এই চুক্তি করলো যে, গোত্রীয় এলাকার যোদ্ধাদের আস্তানায় ড্রোন হামলার জন্য পাকিস্তানি বিমানঘাঁটি ব্যবহার করবে।

কিন্তু যখন আমেরিকা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে নিজ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য শতকোটি ডলার খরচ করছিল, তখন আল-কায়েদা এই যুদ্ধকে পাকিস্তানের শহরগুলোতে টেনে নিয়ে এল। মূলত এই যুদ্ধকে পাকিস্তানের শহরগুলোতে টেনে নেওয়ার পরিকল্পনা আল-কায়েদার অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু সেই পরিকল্পনা ২০০৭-এ এসে বাস্তবায়িত হলো। এভাবেই পাকিস্তানে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে আল-কায়েদা আমেরিকা থেকে সর্বদাই এক ধাপ এগিয়ে ছিল।

এই অঞ্চলে আমেরিকান মিশনের তত্ত্বাবধানে ছিল ডিক চেনি। অন্যদিকে পাকিস্তানে আইমান আজ-জাওয়াহিরির নির্দেশনা মোতাবেক আল-কায়েদার মাস্টারপ্ল্যানের প্রধান ছিলেন শাইখ ঈসা। ইতোপূর্বে ২০০৩-এ শাইখ ঈসাকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দূত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। তখন তাঁর ইচ্ছা ছিল আল-কায়েদার শক্তিশালী সাপোর্টের জন্য পাকিস্তানের শহুরে এলাকায় একটি ইসলামি রাজনৈতিক জোট প্রতিষ্ঠা করা। শাইখ ঈসা সেসময় যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন —

• পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি দল ও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দক্ষিণ এশীয় সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত জামায়াতে ইসলামির (JI) তৎকালীন প্রধান কাজী হুসেন আহমাদ।

• জামায়াতুদ দাওয়া (JuD) এর প্রধান হাফিয মুহাম্মাদ সাঈদ, যিনি ইতোপূর্বে সালাফি ও ওয়াহাবি মতাদর্শী নিষিদ্ধ সামরিক সংগঠন লস্করে তইয়্যেবার সাবেক প্রধান ছিলেন।

• ইতোমধ্যে তালেবানকে সমর্থন দেওয়া মুসলিম উলামা ও দেওবন্দি চিন্তাধারার প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (JUI) এর প্রধান - মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব।

• ইহইয়া-এ খিলাফাতে ইসলামির (পুনরায় ইসলামি খিলাফাত প্রতিষ্ঠার) দাঈ ড. ইসরার আহমেদ সাহেব।

তবে যারা একদম সাচ্চা দিলে আল-কায়েদার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন দুই ভাই — ইসলামাবাদের লাল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আবদুল আজিজ ও আবদুর রশিদ গাজী।

পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ইসলামাবাদে লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে দুটি মাদ্রাসা ছিল। মসজিদ সংলগ্ন 'জামিয়া হাফসা' ছিল মেয়েদের মাদ্রাসা, আর রাজধানীর E-7 এ অবস্থিত 'জামিয়া ফরিদিয়া' ছিল ছেলেদের মাদ্রাসা।

উভয় মাদ্রাসাতে ৭,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতো।

লাল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন প্রবীণ মুজাহিদ মাওলানা আবদুল্লাহ, যিনি ইতোপূর্বে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাই মোল্লা উমার, ডা. আইমান আয-যাওয়াহিরি, তাহের ইয়ালদোচিভ এবং উসামা বিন লাদেনের মতো ব্যক্তিদের সাথে লাল মসজিদ প্রতিষ্ঠানটির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নব্বইয়ের দশকে মাওলানা আবদুল্লাহর শাহাদাতের পরে তাঁর দুই ছেলে মাওলানা আবদুল আজিজ ও আবদুর রশিদ গাজী যথাক্রমে লাল মসজিদের ইমাম ও নায়েবে ইমাম হন। উভয় ভাই-ই তাঁদের বাবার মতো জিহাদের ফারজিয়্যাতের (আবশ্যকতা) ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২০০৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান তীব্র করে তুলেছিল, তখন সেই অভিযান প্রথম থেকেই কেউ ভালো চোখে দেখছিল না। এমনকি সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের পক্ষে সমর্থন জানাতে তখনও প্রস্তুত ছিল না। জনসাধারণের দৃষ্টিতে তালেবান ছিলে এমনই এক গোষ্ঠী, যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানকে জনগণ নব্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতা হিসেবে দেখছিল।

কাজী হুসেইন আহমেদ, ইমরান খান এবং নওয়াজ শরীফের মতো রাজনীতিবিদরা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মোশাররফকে দোষী সাব্যস্ত করছিলেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের মেয়াদকে দীর্ঘায়িত এবং নিজের সামরিক শাসনকে শক্তিশালী করতে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায় করার জন্য নিরীহ পাকিস্তানি গোত্রীয় মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছেন।[40] ২০০৩-এর রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের ওপর দুটি আক্রমণ সেই অভিযানের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেয়। হাজার হাজার লোককে জিহাদি সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। আমেরিকা তখন পাকিস্তানকে কাশ্মীরে অবস্থিত পাকিস্তানের সামরিক ক্যাম্প বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এর ফলে পাকিস্তানে আমেরিকা বিরোধিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়। পরিস্থিতির ফায়দা ওঠাতে আল-কায়েদার জন্য খুব সামান্য কৌশলী পদক্ষেপই (Small Spin) যথেষ্ট ছিল।

---

40. পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাজনীতির অনেক চড়াই উতরাইয়ের পর ইমরান খান ২০১৮ সালের আগস্টে এসে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো, ওয়াজিরিস্তানের গোত্রীয় এলাকা কিংবা লাল মসজিদ, জামিয়া হাফসা এরপরও আক্রমণ, অবরোধ ইত্যাদি থেকে রেহাই পায়নি। অথচ মোশাররফ সরকারের সময় এই ব্যাপারগুলো নিয়েই রাজনীতি করতে কেউ ছাড়েনি।

লাল মসজিদ: আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজিক ময়দান

আল-কায়েদার দিকনির্দেশনায় ২০০৪ সালে মাওলানা আবদুল আজিজ একটি ফাতওয়া জারি করেন যে, 'দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ অনৈসলামিক ও শরীয়াহ বিরোধী।' সেখানে পাঁচশত মুফতিয়ে কেরামের সাক্ষ্য ছিল।

ফাতওয়ায় আরও বলা হয়, 'অভিযানে অংশগ্রহণকারী সেনাদেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মুসলিম যোদ্ধাদের ওপর হামলা করতে গিয়ে যে সকল সেনাসদস্য নিহত হবে, তাদের জানাজা পড়া যাবে না।'

এই ফাতওয়া পুরো দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এবং এতে পাঁচশত জন বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের দস্তখত বিদ্যমান ছিল। এই ফাতওয়া পাকিস্তানে আমেরিকা বিরোধী উন্মাদনায় জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অপদস্থ করার জন্য যোদ্ধাদের সমস্ত অস্ত্রও ততটা ফলদায়ক ছিল না, যতটা এই একটি ফাতওয়া ছিল।

বিষয়টি এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। মিডিয়া এমন কয়েকটি ঘটনার রিপোর্ট করেছিল যে, এই ফাতওয়ার কারণে অনেক বাবা-মা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে লড়াইয়ে নিহত নিজেদের সন্তানের লাশ নিতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ধর্মীয় আলেমগণ তাদের জানাজার নামাজ পড়াতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলাফল এই হলো যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সকল সৈন্য এবং জেনারেলদের বাহাদুরি সংকীর্ণ হয়ে গেল। নিচুস্তরের বেশকিছু অফিসার, যাদের তখনও পদন্নোতি হয়নি, তারা নিজেদের অফিসারদের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে বসলো; আর তাদের কোর্টমার্শাল করে দেওয়া হলো। এছাড়াও বিশাল সংখ্যক সেনা কর্মকর্তা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তাদের পোস্টিংয়ের আদেশ পেয়ে চাকরি থেকে পদত্যাগ করলো।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২০০৪ সালে মুজাহিদদের পরাস্ত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু লাল মসজিদ ফাতওয়াটি হয়ে গিয়েছিল আল-কায়েদার সেই সময়োপযোগী পদক্ষেপ, যা পাকিস্তানি সমস্ত সুযোগের ডানাগুলো কেটে দিল। লাল মসজিদের উভয় ভাই শাইখ তাহের ইয়ালদোভিচ ও শাইখ ঈসা সহ আল-কায়েদার প্রধান নেতৃবৃন্দের সাথে ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতেন।

তাছাড়া জিহাদি নেতৃবৃন্দের সাথে এই সখ্যতা মাওলানা আবদুল আজিজের পিতা মাওলানা আবদুল্লাহর সময় থেকেই। ফলে তারা সার্বক্ষণিকই পরবর্তী কৌশল সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা পেতে সক্ষম হতেন।

২০০৭ সালের দিকে ইসলামাবাদের লাল মসজিদ পাকিস্তানি গোয়েন্দাসংস্থা ISI এবং রাওয়ালপিন্ডির সেনাবাহিনী হেডকোয়ার্টারের নাকের ডগায় আল-কায়েদার পাওয়ার-হাউজ হয়ে উঠেছিল।

এই সময়টাতে পুরো দেশে বিদ্রোহীদের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছিল। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে, অতঃপর বাজাউর, মোহমান্দ এবং ওরাকযাই এজেন্সি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে তাদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ হাজার।

'তেহরিকে আযাদিয়ে কাশ্মীর' (TAJK — Tehreek-e-Azaadi Jammu and Kashmir) এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কারণে এই সংগঠনের সশস্ত্র মুজাহিদরা ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করে, তাই তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এই হিজরতে 'তেহরিকে আযাদিয়ে কাশ্মীর' তথা কাশ্মীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবশালী ও বীর কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরি এবং আবদুল জাব্বারের মতো সাহসী কমান্ডাররাও ছিলেন।

লাল মসজিদ ম্যাসাকার

বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমেরিকার CIA এবং পাকিস্তানের ISI রিপোর্টের পর রিপোর্ট করে চলছিল; আর ভবিষ্যতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান সরকারকে বারংবার অপারেশনে যাবার পরামর্শ দিচ্ছিল। পাকিস্তান সরকার কয়েকবার বড় ধরনের অপারেশন পরিচালনার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে লাল মসজিদ ছিল যেন আল-কায়েদার পক্ষে তুরুপের ত্রাস। তাই তারা সরাসরি যুদ্ধে জড়াতে পারেনি। বরং পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল 'সিয ফায়ার লাইন' চুক্তি করতে।

মোশাররফ আর তার মিত্ররা বারবার লাল মসজিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছা করেছিল ঠিকই। কিন্তু মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স প্রতিবারই বাগড়া দিয়ে আসছিল। কেননা পাকিস্তানের সাধারণ জনতা আগ থেকেই আমেরিকার বিরোধিতায় ফুঁসে ছিল। সেই মুহূর্তে লাল মসজিদ ও এর সাথে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অর্থ ছিল অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলা। এদিকে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, এবং সরকারি আমলাদের অনেকের কন্যা সন্তানরাই লাল মসজিদের অধীনস্থ মাদ্রাসায় (জামিয়া হাফসা) শিক্ষারত ছিল। গোত্রীয় এলাকায় অপারেশনের কারণে সেখানকার সেনাদের সম্ভাব্য বিদ্রোহের ভয়ে শঙ্কিত মোশাররফ সরকার তার ফেডারেল রাজধানীতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

এই ব্যাপারগুলো জানা কোনোই বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না যে, তখন আমেরিকা আর ব্রিটেন মিলে পাকিস্তানকে এমন পদক্ষপ নেওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করছিল, যাতে করে বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এটা ঐ সময়েরই কথা, যখন আমেরিকা মোশাররফকে বেনজিরের সঙ্গে ডিল করতে চাপ দিচ্ছিল; আর মুজাহিদদের জনসমর্থন প্রতিরোধ করতে সেক্যুলার-লিবারেলদের ঐক্যবদ্ধ করে যাচ্ছিল। আর ওই সময়েই পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তানে আল-কায়েদার অবস্থানসমূহের পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরি করে নিয়েছিল, যা ইসলামাবাদের লাল মসজিদ থেকে শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মোল্লা ফজলুল্লাহর আকারে মালাকান্দ (খাইবার পাখতুনখোয়ার একটি জেলা) হয়ে সোয়াত উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়।

এছাড়া এটাও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, ‘তেহরিকে নেফাযে শরিয়তে মুহাম্মাদি’ (Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi) এরও বাজাউর এবং উত্তর-দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের যোদ্ধাদের সঙ্গে শক্ত নেটওয়ার্ক রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের কর্মকর্তারা পাকিস্তান সফর করলো এবং জঙ্গিবাদকে সমূলে উৎখাত করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পাকিস্তানের ওপর একের পর এক চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো।

এই সমস্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে আল-কায়েদা পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল। তারা আমেরিকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই তা বানচাল করে দিল। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানি তালেবান পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে অবস্হিত তাদের আস্তানাগুলোকে টার্গেট করে একের পর এক হামলা শুরু করে দিল। পাকিস্তানের জেনারেল হেডকোয়ার্টার (GHQ) এই হামলায় বিস্মিত ও হতচকিত হয়ে পড়লো।

অন্যদিকে এই বিষয়টি বুঝে উঠবার আগেই লাল মসজিদের শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমে পড়লো। তারা ইস্যু হিসেবে পাকিস্তান প্রশাসন কর্তৃক কিছু মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে সামনে আনলো, যে মসজিদগুলো কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই নির্মাণ করা হয়েছিল। পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য সরকার তৎক্ষণাৎ তাদের দাবি মেনে নিল যে, সামনে এভাবে আর মসজিদ ভাঙ্গা হবে না। এছাড়াও প্রশাসন ভেঙ্গে ফেলা মসজিদগুলোর পুনঃনির্মাণের জন্য বিকল্প ভূমি দেওয়ারও আশ্বাস দিলো। এতদসত্ত্বেও লাল মসজিদের আন্দোলনকারীরা এই দাবিতে অনড় রইলো যে, মসজিদ যেখানে যেখানে ভাঙ্গা হয়েছে, সেখানেই নির্মাণ করতে হবে।

মাওলানা আবদুল আজিজ এবং গাজি আবদুর রশিদের এই আচরণে ইতস্তত মোশাররফ সরকার এতদিন এটা আঁচও করতে পারেনি যে, তারা দুই ভাই মূলত আমেরিকার স্বার্থের ওপর আঘাত হানতে চাচ্ছে। আর তারা এই দৃশ্যপট মঞ্চায়িত করছে আল-কায়েদার পরিকল্পনা অনুযায়ীই। এদিকে মসজিদ সংলগ্ন চিলড্রেন লাইব্রেরি মাদ্রাসার ছাত্রীরা দখল করে নিলে পুরো বিশ্ব মিডিয়ার নজর এই দিকে এসে পড়ে।

ছাত্রীরা ঘোষণা দেয় যে, “পুরো দেশে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত লাইব্রেরি তাদের দখলে থাকবে।”

পাকিস্তান এবং বহির্বিশ্বের আলেমগণ লাল মসজিদ ইস্যুতে আঙ্গুল কামড়াতে লাগলেন। লাল মসজিদের সংশ্লিষ্টদের আধ্যাত্মিক রাহওয়ার, প্রসিদ্ধ ইসলামি অর্থনীতিবিদ মুফতি তকি উসমানি সাহেব এই ভাইদের এহেন ইসলামি এজেন্ডার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য করাচি থেকে ইসলামাবাদে আসেন। মাওলানা আবদুল আজিজ মুফতি তকি উসমানির সাথে কোনোরকম বাহাসেই (ইলমি বিতর্ক) গেলেন না। শুধু এতটুকুই বললেন — "পাকিস্তানে ইসলামি শরীয়াহ বাস্তবায়িত করার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক।"

মিডিয়ায় মোশাররফ-বেনজিরের গোপন সাক্ষাতের কথা উঠে আসলে লাল মসজিদের আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। জামিয়া হাফসার ছাত্রীরা এক দালাল মহিলাকে (আন্টি শামিম) অপহরণ করলে লাল মসজিদ সঙ্কট আরও প্রকট আকার ধারণ করে।

২০০৭ সালের ৯ই মার্চে প্রধানমন্ত্রী পারভেজ মোশাররফ চীফ জাস্টিস ইফতেখার মুহাম্মাদ চৌধুরিকে বহিষ্কার করে। এর ভিত্তিতে উকিলদের আন্দোলন শুরু হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মিডিয়া, সুশীল সমাজ এবং কিছু রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। লাল মসজিদের ইস্যুর পাশাপাশি এই নতুন বিপদ মোশাররফ সরকারকে ওয়াজিরিস্তানে শক্তিশালী হামলা করার সামান্য সক্ষমতাও বাকি রাখলো না। ওদিকে উকিলদের আন্দোলন যতই জোরদার হতে লাগলো, লাল মসজিদের বিপ্লবী কর্মকান্ডও ততই বেগবান হতে চললো। লাল মসজিদ কমিটি কেন্দ্রীয় ইসলামাবাদের সকল অডিও মিউজিকের দোকান জোর করে বন্ধ করে দিল। এই সময়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কিছু শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তারও করলো।

বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মুক্তির জন্য অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সরকারি কিছু ব্যক্তিকে অপহরণ করলো, যাতে সরকার বাধ্য হয়ে তাদের মুক্তির বিনিময়ে গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে দেয়। এর ফলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবদুল আজিজ এবং গাজি আবদুর রশিদের নাম কালো তালিকাভুক্ত করে নিল। পুলিশ লাল মসজিদ ঘিরে অবস্থান গ্রহণ করলো। কিন্তু লাল মসজিদের শিক্ষার্থীরা এতটাই ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখলো যে, পুলিশকে নিরাপদ দূরত্বেই থাকতে হলো। এই অবস্থায় মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবের জুমার অগ্নিঝরা বয়ান জনসাধারণের আত্মমর্যাদায় আঘাত করতে লাগলো, যাদের মধ্যে লাল মসিজিদের বাহিরে ডিউটিরত কিছু পুলিশও ছিল।

অন্যদিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দর সামনে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, খুব দ্রুতই লাল মসজিদ কীর্তির অবসান ঘটবে। একসময় সরকারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে এবং লাল মসজিদের বিরুদ্ধে নিশ্চিত কোনো ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উত্তর ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক বসলো। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হলো যে, লাল মসজিদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলা পরিচালিত হলেই আল-কায়েদার চূড়ান্ত বাজিমাত শুরু হবে। তাই হামলার জবাবে পাকিস্তান-আমেরিকান জোটের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকলো না।

২০০৭ সালের জুলাই মাসে সেনাবাহিনী লাল মসজিদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করে। কয়েকদিন অবরোধের পর সেনাবহিনী মসজিদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। মাওলানা আবদুল আজিজ বোরকা পরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে গ্রেপ্তার হন। গাজি আবদুর রশিদ, তাঁর মাতা এবং আবদুল আজিজ সাহেবের ছেলে সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে শহীদ হন। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীও নিহত হয়। এভাবে প্রথম পরিকল্পনায় আমেরিকা সফলতার মুখ দেখে। ইসলামাবাদে আল-কায়েদার ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে গেল। এই পর্যায়ে পাকিস্তান-আমেরিকা জোটকে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে পুরোদমে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতই মনে হলো।

এদিকে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ভিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে গেল। মোশাররফ-বেনজির ডিল সম্পন্ন হলো এবং বেনজির ভুট্টো অক্টোবরে দেশে ফেরার কথা জানালো। পাকিস্তানও সোয়াত [41] এবং ওয়াজিরিস্তানে সশস্ত্র হামলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো। কিন্তু মোশাররফ সরকারের জন্য সময়টা প্রতিকূল ছিল। লাল মসজিদ ম্যাসাকারের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ শুরু হলো। মোশাররফ ফেডারেল সরকারের একনিষ্ঠ দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কিউ) তথা PML-Q এই অপারেশনের দায়ভার নিতে নারাজ ছিল। অন্যদিকে গণআন্দোলন দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্ট চীফ জাস্টিসকে পুনর্বহাল করে রায় প্রকাশ করলো। বিরোধী নেতা নেওয়াজ শরিফের দেশে ফেরার খবরও শোনা যেতে লাগলো। কিন্তু লাল মসজিদের গল্পের ইতি হলো। গাজি আবদুর রশিদ শহীদ হলেন এবং আবদুল আজিজ হলেন গ্রেপ্তার। ঘটনা যা হওয়ার তাই হলো।

41. সোয়াত হচ্ছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের একটি উপত্যকা এবং প্রশাসনিক জেলা।

কিছুদিন পর আল-কায়েদা একটি ভিডিও প্রকাশ করলো, যেখানে আল-কায়েদার পক্ষ থেকে গাজী আবদুর রশিদকে 'সত্যবাদী ইমাম' উপাধি দেওয়া হলো। আল-কায়েদা স্পষ্ট ঘোষণা করলো - লাল মসজিদ গণহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবেই। [42] আর এরই মধ্য দিয়ে আল-কায়েদার আরব্য রজনীর গল্পে আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

লাল মসজিদের ঘটনার পর আমেরিকান জোট পাকিস্তানকে চাপ দিতে লাগলো যে, আল-কায়েদাকে চিরতরে মিটিয়ে দেবার জন্য খুব দ্রুত বড় ধরনের অপারেশন পরিচালনা করা হোক। এদিকে আল-কায়েদাও অসম্ভব দ্রুততার সাথে যেকোনো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। যদিও আল-কায়েদা আমেরিকার দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক পলিসিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নস্যাৎ করতে সক্ষম ছিলনা, কিন্তু শক্ত একটি আঘাত করার ক্ষমতা অবশ্যই তাদের ছিল।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করতে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো যখন আল-কায়েদার উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, তখন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, পাকিস্তান-আমেরিকা জোট এখন এতটাই শক্তিশালী অবস্থানে আছে যে, ছোট-খাটো যুদ্ধে আর কাজ হবে না। পাকিস্তান সরকার (অর্থাৎ আমেরিকান জোটের শরিক ও তার প্রকাশ্য মদদদাতা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও প্রশাসন) এখন একটি কাফির (মুরতাদ) সরকারে পরিণত হয়েছে এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত হয়ে গেল।

লাল মসজিদের আলেমগণ আসন্ন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আল-কায়েদার জন্য ফ্রন্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন। কেননা, লাল-মসজিদের রক্তাক্ত ঘটনা আল-কায়েদা আর পশ্চিমের মধ্যকার এই যুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থানকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিয়েছিল।

ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী 'শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' তখনই বৈধ হয়ে যায়, যখন শাসকরা ইসলামের নীতি ও গন্ডির সীমানা লঙ্ঘন করে ফেলে। ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই ধরনের বিদ্রোহ করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতি হুসাইন বিন আলি رضي الله عنه। উমাইয়া শাসক ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিল। আর এই

42. সেই ভিডিওতে উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি, আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বি সহ আল-কায়েদার বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতাদের বার্তা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

পদ্ধতি ছিল ইসলামি নীতিবিরোধী। ইসলামি সমাজে একজন শাসক কেবল জনগণের পূর্ণ সমর্থনেই নির্বাচিত হতে পারে।[43]

আল-কায়েদা প্রখ্যাত ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ -এর নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সময় ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। মঙ্গোলরা ছিল রাজ্যহীন এক পরাশক্তি। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু ইসলামি শরীয়তকে আইনের একমাত্র উৎস মানতে নারাজ ছিল। পক্ষান্তরে তারা এমন সব আইন চালু করেছিল, যা ইসলাম এবং মঙ্গোলীয় রীতিনীতির এক মিশ্রণ ছিল। এভাবে রাজ্যে ভিন্ন দুটো আইনি ব্যবস্থা সমান্তরালভাবে চালু হয়ে যায়। বাগদাদে মঙ্গোলীয়দের দখল আগ থেকেই ছিল। তাদের দৃষ্টি ছিল অন্যান্য ইসলামি ভূখন্ডের দিকে; শাম এবং মিশরের শাসক নাসিরুদ্দিন এতটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন যে, তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন তার সেনারা তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অক্ষম। তাই তাতাররা দ্বিতীয়বার বাগদাদ আক্রমণকালে নাসিরুদ্দিন নিরপেক্ষ থাকার কথা জানিয়ে মঙ্গোলদের আশ্বস্ত করলেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ ﷺ -এর মতে একটি মুসলিম ভূখণ্ড কাফিরদের আগ্রাসনের শিকার হলে তার প্রতিরক্ষাকল্পে জিহাদ পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা একজন শাসকের জন্য ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের নামান্তর। তিনি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এই দলিলকেই যথেষ্ট মনে করলেন। তাই তিনি নাসিরুদ্দিনকে হুঁশিয়ার করলেন যে, বাগদাদ দখলের সময়ে তিনি যদি মঙ্গোলদের সাথে করা চুক্তি ভেঙ্গে না ফেলেন, তাহলে তিনি তাতারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ স্থগিত করে আগে তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করবেন। তিনি তাকে শাসালেন যে, আগে তার গদি দখল করা হবে। এরপর মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে মুক্তভাবে জিহাদ পরিচালোনা করা হবে। ইবনু তাইমিয়্যাহর এই ধমকিতে নাসিরুদ্দিন জিহাদি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে হাত মেলালেন। তাকে বাধ্য হয়েই তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলো।

আল-কায়েদা লাল মসজিদ ট্রাজেডির পর এই নীতিই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। উসামা বিন লাদেন 'আবদুল হামিদ ওরফে আবু উবায়দা আল-মিশরি'কে পাকিস্তানে বিদ্রোহের নেতা ঘোষণা করলেন। এর মাধ্যমে আল-কায়েদার হাজার রজনীর গল্পে নতুন ভূমিকার অভ্যুদয় হলো।

---

43. এটি একান্তই লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। ইসলামে খলিফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের সমর্থন আদৌ কোনো আবশ্যক বিষয় নয়। গণতন্ত্রের সাথেও ইসলামের সম্পর্ক নেই। বাস্তবতা হল, খলিফা নির্বাচন করে থাকেন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ।

আফ্রো-পাক বিন্যাসে তৈরি যুদ্ধমঞ্চ

লাল মসজিদ ট্র্যাজেডি শেষ হতে হতেই ঘটনা নতুন মোড় নিল। পাকিস্তানকে নিয়ে আমেরিকানদের লক্ষ্য আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল। আমেরিকা তার আল-কায়েদা বিরোধী মিশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য একটি ছক আঁকলো। এই ছকের ক্রীড়ানক ছিল 'War on Terror' তথা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার সমর্থনকারী সেনাবাহিনী চীফ এবং সেক্যুলার-লিবারেল শক্তিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত পার্লামেন্ট, যা এই যুদ্ধকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ঢোল পিটিয়ে যাচ্ছিল। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরও ছিলেন একজন সিভিল সুপ্রিম কমান্ডার, যিনি চলমান ঘটনাগুলোর ওপর গভীর দৃষ্টি রেখে নিয়মিত আমেরিকা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট করছিলেন। সামরিক ও বেসামরিক সাহায্যের সমন্বয়ে পরিচালিত এই পুরো প্যাকেজটির মূল দেখাশোনার ভার ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতেই।

এদিকে এই সব প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা মিত্র জেনারেল আশফাক পারভেজ কায়ানী, যিনি আমেরিকার মিলিটারি কমান্ডের খুব আস্থাভাজন লোক ছিলেন, তাকে ভাইস চীফ অব আর্মি স্টাফ বানিয়ে দেওয়া হলো। এবং ভবিষ্যত চীফ অব আর্মি পদের জন্য মনোনীত করা হলো। কায়ানী অবশ্য পারভেজ মোশাররফের পছন্দের লোক ছিল না। মোশাররফের ইচ্ছা ছিল জেনারেল তারেক মাজিদকে চীফ অব আর্মি স্টাফ বানাবে। কিন্তু কায়ানী আমেরিকার নির্বাচিত ছিল।

তবে আমেরিকার এই নির্বাচন পাকিস্তানের সামরিক ঐতিহ্য ও নীতির বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। কেননা পাকিস্তানের সামরিক ইতিহাসে ISI-এর কোনো ডাইরেক্টর কখনোই জেনারেল সেনাবাহিনী চীফ মনোনীত হননি। এর কারণ এই ছিল যে, ডিজি ISI-এর সম্পর্ক থাকে ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যার সম্পর্ক রাখতে হয়। রাজনীতিবিদরা সামরিক দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় এবং পররাষ্ট্রীয় পলিসি সামলাতে তার দারস্থ হয়ে থাকে। আর ইন্টেলিজেন্স প্রধানদের বহির্বিশ্বের ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। কোনো কোনো সময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণও করতে হয়। তাই একজন ইন্টিলিজেন্স চীফকে সেনাবাহিনী চীফ বানিয়ে দেওয়া হলে সর্বদা এমন আশঙ্কা থেকেই যায় যে, কখনও না আবার দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কারও সাথে আপোষ করে ফেলে।

আশফাক কায়ানীর অতীত রেকর্ড থেকেই ধারণা করা হয়েছিল, সে নিষ্ঠুর ও নির্দয় প্রকৃতির হবে। ২০০৭ সালের অক্টোবরে ভাইস চীফ অব আর্মি হিসেবে কায়ানী পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে 'মীর আলি' এবং 'সোয়াত'-এ বাছবিচারহীন বোম্বিংয়ের জন্য ব্যবহার করে। শতশত বেসামরিক মানুষ নিহত হয়। মোশাররফের বিপরীতে কায়ানীর আভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতিরও কোনো পরোয়া ছিলনা। এভাবে ২০০৮-২০০৯-এর মিলিটারি অপারেশনে উত্তর ওয়াজিরিস্তান, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, বাজাউড়, মোহমান্দ এবং সোয়াতে লাখো মানুষ বাস্তুহারা হয়ে যায়। এতকিছুর পরও কায়ানীর মধ্যে কোনোরকম উপলব্ধি ছিল না।

বেনজিরের রাজনীতিতে ফেরার পরই দেশে আল-কায়েদার বিস্তৃত জাল ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য পাকিস্তানের সামরিক অভিযান পরিচালনার কথা ছিল। আর শুরুটা হওয়ার কথা ছিল সোয়াত উপত্যকা থেকে। এর আগেই সোয়াতে মিলিটারি পজিশন শক্তিশালী করে নেওয়ার কথা। বিদ্রোহী যোদ্ধারা ২০০৬ সালের 'মিরান শাহ চুক্তি' ভঙ্গ করে লাল মসজিদ ট্রাজেডি শেষ হওয়ার আগেই উত্তর এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্সের আস্তানাগুলোতে হামলা শুরু করে দেয়। ২০০৭ সালের ২৪ জুলাই থেকে ২৪ আগস্টের যুদ্ধে সরকারি হিসেব মতে ২৪০ জন মুজাহিদ শহীদ হয় এবং ৬০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ২রা সেপ্টেম্বর বাইতুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে বেশ কিছু মুজাহিদরা অ্যাম্বুশ অভিযান পরিচালনা করে এবং কোনো গুলি খরচ না করেই ২৪৭ জন সেনাসদস্য ধারণকারী প্রায় ১৭ টি গাড়ির একটি সেনাবহরকে আটক করে ফেলে। এই ঘটনা পুরো দেশকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অফিসারও ছিল। কাঁটা ঘায়ে লবণ ছিটানোর জন্য মুজাহিদরা বিবিসিকে এই মর্মে খবর প্রচারের জন্য ডাকে যে, অফিসাররা এখন তাদের সমর্থনে চলে এসেছে। তারা নিজেরাই এই কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনার পর পাকিস্তানি সেনারা ওয়াজিরিস্তানের হেড কোয়ার্টারে ফিরে গেল। তারা জায়গায় জায়গায় ছাউনি স্থাপন করে পুরো এলাকাকে ছাউনিময় করে ফেলল। কিন্তু এতে বিদ্রোহীরা সামান্য মনোবলও হারালো না।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে পাকিস্তান তালেবান (TTP) পুরো ওয়াজিরিস্তানের সেনা চৌকিতে হামলা করে। এই হামলা এতদাঞ্চলে পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্স এবং পাকিস্তান তালেবানের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধের সূচনা করে। পাকিস্তান তালেবান যোদ্ধারা সেনা চৌকিসমূহে প্রথম হামলার সূচনাটা করে ২০০৭-এর ১২ই সেপ্টেম্বরে বারো জন সেনাসদস্যকে আটক করার মধ্য দিয়ে। এর পরদিন গাজি তারবিলায় অবস্থিত একটি সেনাবাহিনী মেসে একজন বিদ্রোহী ফিদায়ি হামলা করে, যার ফলে মিলিটারি

মেসের কেন্দ্রীয় হলোরুম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এই হামলায় এসএসজির বিশজন কর্মকর্তা নিহত হয়, আহত হয় উনত্রিশ জন। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলমান এই সিরিজ হামলায় বেশ কিছু চৌকি ধ্বংস হয় এবং আরও বহু সেনা নিহত হয়। মোট নিহতের সংখ্যা ৬৫-তে গিয়ে দাঁড়ায়। আহত হয় প্রায় একশরও বেশি। বিদ্রোহীদের বেশিরভাগ হামলাই ছিল লাল মসজিদ ম্যাসাকারের তাৎক্ষণিক প্রতিশোধমূলক, যেখানে প্রশাসনকে পরিস্থিতি সামলানোর সুযোগই দেওয়া হয়নি।

প্রায় দু সপ্তাহ পর সেনাবাহিনী পাল্টা অ্যাকশনে নামে। গানশিপ হেলিকপ্টারের বহর, ফাইটার জেট এবং পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'মীর আলি'-তে অপারেশন শুরু করা হলো। ৭ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই হামলায় ২৫৭ নিহত হয়। এদের মধ্যে ১৭৫ জন বিদ্রোহী, ৪৭ জন সেনাসদস্য ও ৩৫ জন ছিল সাধারণ নাগরিক।

NRO ঘোষণা ও বেনজির ভুট্টো হত্যাকাণ্ড [44]

এই অঞ্চলে আল-কায়েদা পুনরায় আমেরিকার লক্ষ্য পন্ড করতে আরও শক্তিশালী ও উন্নত প্ল্যান তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল। একদিকে পাকিস্তানের শহরগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছিল, অপরদিকে মোশাররফ সেক্যুলার-লিবারেল জোটকে বিজয়ী করার দায়িত্ব ISI-এর ওপর ন্যস্ত করলো। ISI তখন আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি তথা ANP, মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট তথা MQM, এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ তথা PML দলগুলোর মাঝে একতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো।

আর ৫ই অক্টোবর ২০০৭ সালে মোশাররফ এনআরও (NRO - National Reconciliation Ordinance) ঘোষণা করলো। এর ফলে ঐ সমস্ত রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক কর্মকর্তা এবং সরকারি আমলার সাধারণ ক্ষমা নিশ্চিত করা হলো, ১৯৮৬-এর ১লা জুন থেকে ১৯৯৯-এর ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, মানি লন্ডারিং, হত্যা বা সন্ত্রাসের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই বিশেষ আইনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, বেনজির এবং আসিফ আলি জারদারিকে সকল দুর্নীতির মামলা থেকে বেকসুর খালাস প্রদান করা। NRO ঘোষণা বেনজিরের দেশে ফেরার সমস্ত বাধা দূর করে দিল। আর তিনি প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাও দিয়ে দিলেন।

এটা ছিল আল-কায়েদার দুঃসাহস প্রদর্শনের এক সুবর্ণ সুযোগ। বেনজির ভুট্টো ছিলেন একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ। জনপ্রিয়তার কারণে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে নামলে তাকে সহজেই টার্গেটে পরিণত করা যেত। আল-কায়েদা তার হত্যার লাভ-ক্ষতি নিয়ে

---

44. বেনজির ভুট্টোর হত্যাকান্ডের পরই আল-কায়েদা দায় স্বীকার করেছে দাবি করে একটি ফরাসি সংবাদ সংস্থা Adnkronos সংবাদ প্রচার করে। আর কিছু বিশ্বমিডিয়া তা তড়িৎ গ্রহণ করে নেয়।

কিন্তু ২৯ ডিসেম্বরে ওয়াজিরিস্তানের (গোত্রীয়) আল-কায়েদা নেতা সেই হামলার দায় অস্বীকার করেছিল।

["Al- Qaeda denies killing Bhutto" by India Today (online), December 29, 2007]

আর পরবর্তীতেও আল-কায়েদার পক্ষ থেকে দায় স্বীকারমূলক কোনো বিবৃতি আসেনি। কিন্তু তবুও এই হত্যাকান্ড পাকিস্তান তালেবান কর্তৃক হয়েছিল বলেই প্রবল ধারণা করা হয়। লেখকও সেইরকম ধারণা থেকেই এই অধ্যায়টি লিখেছেন আর এই হত্যাকান্ডের ফলে আল-কায়েদার ফায়দাগুলো উল্লেখ করেছেন। তবে শেষকথা হলো, এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে যে যেরূপ অবস্থানই নিয়ে থাকুক কিংবা যেরূপ বিশ্লেষণই করে থাকুক না কেন, এটি কারা করেছিল, তা কারও অফিসিয়াল বিবৃতি ছাড়া একেবারে শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না।

চিন্তা ও আলোচনা পর্যালোচনা করতে লাগলো। তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, ভুট্টোকে হত্যা করা গেলে রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত পাল্টে যাবে। আল-কায়েদার এটা ভালোভাবে জানা ছিল যে, বেনজির হত্যার মাধ্যমে শুধু যে তাদের স্বার্থ উদ্ধার হবে তা নয়, বরং এটা দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার লক্ষ্যে এক শক্তিশালী আঘাত হিসেবে কাজ করবে। বেনজির হত্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল ২০০৮ সালের আমেরিকার নির্বাচনের আগেই। আল-কায়েদার ধারণা ছিল যে, ডেমোক্রেট প্রার্থী বারাক ওবামা বিজয়ী হবে, এবং এটা নিশ্চিত যে, ক্ষমতার পালাবদলের এই সময়টাতে বেনজির হত্যা পাকিস্তানে আমেরিকার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট করে দিবে।

দেশজুড়ে আল-কায়েদার সাথে যুক্ত কয়েকটি গ্রুপকে সক্রিয় করে দেওয়া হলো। বেনজির করাচি এয়ারপোর্টে পৌঁছলে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামলো। র্যালি চলাকালীন ফিদায়ি হামলা হলো। বেনজির বেঁচে গেলেও ১৩৬ জন মানুষ নিহত এবং ৪৫০ জন আহত হলো। এই হামলা মোশাররফ-বেনজির একতায় বড় ধরনের ফাটল সৃষ্টি করলো। নিরাপত্তার ত্রুটির কারণে মোশাররফ সরকার প্রচুর পরিমাণ নিন্দিত হলো। বেনজিরও শক্ত হয়ে গেল। সে খাইবার পাখতুনখোয়া সহ পুরো দেশে সভা-সেমিনারে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বলতে লাগলো। বেনজির ছিলেন সেই একজন রাজনীতিবিদ, যিনি লাল মসজিদ গণহত্যার প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছিলেন।

নিজের রাজনৈতিক জীবনে প্রথম (এবং শেষ) বারের মতো বেনজির নির্বাচনী প্রচারণায় জাতীয় রাজনীতিকে তেমন গুরুত্ব দিলো না। তাঁর সমস্ত ভাষণই ছিল সন্ত্রাসবাদ এবং আল-কায়েদার বিরুদ্ধে। ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, প্রত্যেকটি সভায় আল-কায়েদার একটি অংশ ছায়ার মতো তার পিছু পিছু চলতে লাগলো। তাদের কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি মিলেছিল ২০০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডির সভায়। বেনজির হত্যাকাণ্ডের অল্প সময়ের ভেতরে পুরো দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে গেল। দেশজুড়ে পিপলস পার্টির লোকেরা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করলো। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীও খুঁজে পাওয়া গেল না। সিন্ধে বেশ কিছু ট্রেনে হামলা হতে লাগলো। এতে প্রচুর রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সম্পদ নষ্ট হলো। ২৭শে ডিসেম্বরের ঘটনায় প্রথমবারের মতো দেশে নিরাপত্তার অভাব প্রমাণিত হলো। আল-কায়েদা শহরে শহরে সঙ্কট সৃষ্টি করতে সফল হলো। এই সঙ্কট তৈরির পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামি বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকার পরিকল্পিত লক্ষ্য পূরণে পাকিস্তানের সহায়তাকে বাধাগ্রস্ত করা।

এক্ষেত্রে আল-কায়েদাও কিছুটা সঙ্কটের সম্মুখীন হলো। সৃষ্ট গোলযোগ থেকে আল-কায়েদা নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হলো। আসলে আল-কায়েদার বিদ্রোহের আমির আবু উবাইদাহ হেপাটাইটিস সি ব্যাধিতে ভুগছিলেন। এই রোগ তাঁকে এতটাই কাবু করে ফেলেছিল যে, ২৭ ডিসেম্বরের পরে চলমান অরাজকতা থেকে ফায়দা হাসিল করার সুগোগ পাননি। বেনজির হত্যার কিছুদিন পর আবু উবাইদাহ আল-মিশরিরও মৃত্যু হলো। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন খালিদ হাবিব। কয়েক মাস পর খালিদ হাবিবও ড্রোন হামলায় নিহত হলেন।

বিপাকে মোশাররফ: গাদ্দারের চিরায়ত পরিণতি

২০০৮ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে সংগঠিত ফিদায়ি হামলার সংখ্যা আফগানিস্তান ও ইরাকে সংগঠিত ফিদায়ি হামলার সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আবু উবাইদাহর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে আল-কায়েদার পারস্পরিক যোগাযোগে কিছুটা ভাটা পড়েছিল, তাই এইসব হামলার ফলাফল আল-কায়েদার জন্য তেমন সুখ বয়ে আনলো না। তবে আল-কায়েদার প্রধান লক্ষ্যটুকু ঠিকই অর্জিত হয়েছিল। ২০০৮ সালের ৮ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বেনজির হত্যার মাধ্যমে আমেরিকার চেষ্টায় সেক্যুলার, লিবারেল এবং মিলিটারির যে জোট হওয়ার কথা ছিল, তা ঠিকই পন্ড হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনায় আমেরিকা, মোশাররফ এবং পাকিস্তান সেনবাহিনী চরম ধাক্কা খেয়েছিল। বানচাল হয়ে গিয়েছিল এই অঞ্চলে আমেরিকার সমস্ত রোডম্যাপ।

নির্বাচনও মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও বেনজিরের হত্যার কারণে সহানুভূতি পেয়ে পিপলস পার্টি অনেক ভোট পেয়েছিল এবং ২০০৮-এর ১৮ জানুয়ারি নির্বাচনে বড় সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমা পন্ডিতদের দৃষ্টিতে বেনজিরের হত্যার কারণে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মোশাররফ ২৭ নভেম্বর ইউনিফর্ম খুলে ফেললো (পদত্যাগ করলো)। বেনজির-মোশাররফ সমঝোতার আর কোনো আশাই বাকি রইলো না। এর দায়ভার ছিল আমেরিকার রিপাবলিকান বুশ প্রশাসনের ওপর। কিন্তু বুশ সরকারের নির্দিষ্ট সময় শেষের পথে ছিল। আবার নতুন সরকারের যাত্রাও শুরু হয়নি। তাই সেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে তেমন কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আদৌ ছিল না।

এর আগে মোশাররফ সৌদি আরবের চাপের মুখে নওয়াজ শরিফ এবং শেহবাজ শরিফকে দেশে প্রত্যবর্তনের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। লাল মসজিদের গণহত্যা এবং বিচার বিভাগীয় সঙ্কটের ভারে মোশাররফ জোটের একনিষ্ঠ অনুগত দল Pakistan Muslim League (Quaid e Azam Group) তথা PML(Q) এর পা পিছলে যাবার যোগাড় হলো। অপরদিকে নওয়াজ শরিফের দল আশাতীত সীট পেয়ে পার্লামেন্টে পৌঁছে গেল। ফলে এই দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত ফেডারেল সরকার গঠন করার উপায় ছিল না। মোশাররফ পড়ে গেল মহা বিপাকে।

এদিকে নতুন সেনাবাহিনী চীফ আশফাক কায়ানীর প্রধান লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের মাঝে সেনাবাহিনীর প্রভাব বাড়িয়ে তোলা। কিন্তু সেই প্রভাব ফৌজী রাজনীতিতে অব্যাহত পালাবদল, বিচার বিভাগীয় সঙ্কট এবং লাল মসজিদ গণহত্যার কারণে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল হিসেবে মোশাররফ একপ্রকার বোঝা ছিল। সেনাবাহিনী রাজনীতি থেকে দূরে সরতে লাগলো এবং বেসামরিক পজিশন থেকে সরে আসার নোটিশ জারি করে দিল। কায়ানী নিজেও মোশররাফ থেকে বিমুখ হতে লাগলো এবং নিজের সঙ্গীদেরকেও বিমুখতার পরামর্শ দিল।

মোশাররফ প্রধানমন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে দুইবার কায়ানীকে অপসরণের চেষ্টা করলো এবং জেনারেল খালিদ মাজিদকে চিফের পদে বসাতে চাইলো। কিন্তু খালিদ মাজিদ সরাসরি এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। কারণ এটা সেনানীতির বিরুদ্ধে যায়। তার ধারণা ছিল, এই পদক্ষেপ সেনা শিবিরে নতুন সঙ্কট তৈরি করবে। একজন প্রফেশনাল সেনার পক্ষে এই আচরণ করা মানায় না। কায়ানীকে চিফের পদ থেকে অপসারণে ব্যর্থ মোশাররফ পতনের আরও কাছাকাছি চলে এল। পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা চলমান রাজনৈতিক দৃশ্যপট ভালভাবেই লক্ষ্য করছিল। নতুন যুগ সূচনা করতে তাদের জোর আওয়াজ শোনা গেল।

মোশাররফ সরকার জোটের প্রধান দুই শক্তি পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কয়দে আজম গ্রুপ) তথা PML(Q) এবং মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট তথা MQM অন্য পথে হাঁটা শুরু করলো। মোশাররফ জোটের সাবেক সদস্য দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (ফজলুর রহমান) তথা JUI এবং আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি তথা ANP বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে মোশাররফের জোটের সঙ্গ দিল। তখন মোশাররফের একান্ত শত্রু নওয়াজ শরিফ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে উঠে পড়ে লাগলো।

আর পিপলস পার্টি তথা PPP নতুন সেনাবাহিনী এবং আমেরিকার সন্তুষ্টি অর্জনে মনোযোগী হলো। ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি দূত হুসাইন হাক্কানি এবং ইসলামাবাদে আমেরিকান দূত পিটারসন মিলে ওয়াশিংটনকে স্পষ্ট করলো - কেন মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। ২০০৮ সালের আগস্টে বিদ্রোহের কারণে মোশাররফ মুশকিলে পড়লেও চেয়ার ধরে রাখতে পারলো। কিন্তু পরবর্তীতে বাধ্য হয়েই তাকে চেয়ার ছাড়তে হলো। পরের সপ্তাহে সরকার প্রধান হলো আসিফ আলি জারদারি। জারদারি পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং আমেরিকা উভয় পক্ষেরই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিল। সবচেয়ে জঘন্যতম

ব্যাপার হলো, FATA-তে (Federally Administered Tribal Area) অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির নামে আমেরিকার দেওয়া সমস্ত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকার পরও জারদারিই সরকারপ্রধান হলো।

নিজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর পিপলস পার্টির (PPP) প্রধান হলো জারদারি। PPP ছিল আমেরিকার 'War on Terror'-এ ফেডারেল সরকারের সম্মিলিত শক্তির প্রধান পর্যায়ের। আর বিরোধী দলগুলো বিশেষত নওয়াজ শরিফের PML(N) ছিল তার জাতিগত দুশমন। বেনজির সরকার প্রধান থাকবার সময়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মতো অভিজাত পত্রিকাগুলো জারদারির দুর্নীতির রিপোর্ট বিস্তারিত ছেপেছে। তখন পশ্চিমা বিশ্বে বিপদের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠেছিল।

বেনজির হত্যা এবং মোশাররফের পদত্যাগের মাঝের সময়টাতে মুজাহিদরা রীতিমতো উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ২০০৭ সালে খানিকটা দমার পর ২০০৮ সালে আবার তাদের জাগরণ শুরু হয়। সোয়াত উপত্যকার যুদ্ধক্ষেত্র আল-কায়েদা আর তালেবানের নিখুঁত আঞ্চলিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কেবল শত্রুকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য ছিল। এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, পাক-আফগান বর্ডারে নিয়োজিত পাকিস্তান সেনাদের সরিয়ে দেওয়া, যেন ন্যাটো সেনারা অনিরাপদ হয়ে যায়। আল-কায়েদার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সোয়াত উপত্যকায় পরিচালিত এই অপারেশনের কোনো বিকল্প ছিল না।

আল-কায়েদা এই সময়টায় খাইবার এজেন্সি, ওরাকযাই এজেন্সি এবং দারা আদামখেলে নিজেদের গুছিয়ে নিল। পেশোয়ারে নির্মিত হলো নতুন ঘাঁটি। গোত্রীয় শহরগুলোতে সুসংহত অবস্থা পরিলক্ষিত হলো। আফগানিস্তানে শক্তির দর্শনীয় মাত্রা চোখে পড়লো। পাকিস্তানের শহরগুলোতে আল-কায়েদার প্রভাব দিনদিন বাড়তে লাগলো। এবং সবশেষে গোত্রীয় এজেন্সিগুলোর প্রাকৃতিক দূর্গগুলোকে স্থায়ী ঠিকানা বানানোর লক্ষ্যে আল-কায়েদা জন্ম দিল ভারসাম্যপূর্ণ নতুন একটি দল - তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান তথা (TTP)।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP)

আল-কায়েদা ইসলামি বিশ্বে চলমান সশস্ত্র আন্দোলনগুলোর ওপর আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করতে সর্বত্র চেষ্টা করে যাচ্ছিল। আল-কায়েদা চাইছিল, এসব আন্দোলন তাদের বেঁধে দেওয়া ছকের ভেতরে থেকে, তাদের চেতনা ধারণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাক। দলগুলোর মাঝে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যাক যে, আমেরিকাই সব সমস্যার মূল। আল-কায়েদার বিশ্বাস, বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সমস্ত রণক্ষেত্রে আমেরিকার পতন জরুরি। তালেবানের মাঝে এই বিশ্বাস আল-কায়েদা বদ্ধমূল করে দিতে পেরেছিল।

অবশ্য ইরাকের প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে আল-কায়েদার এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যদিও আল-কায়েদা ইরাকি প্রতিরোধ আন্দোলনের যোদ্ধাদের নিঃশর্ত সহায়তা করেছিল, কিন্তু আমেরিকান কমান্ডার জেনারেল ডেভিড পেট্রাউস ইরাকের গোত্রীয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের শান্তি আলোচনায় বসতে প্রলুব্ধ করে ফেলেছিল। এরপর ইরাকি যোদ্ধারা নিজেদের নিকৃষ্ট শত্রু আমেরিকার সাথে সমঝোতা করে বসে এবং আল-কায়েদার সদস্যদেরকে তাদের ইরাকি আস্তানাগুলো থেকে বিতাড়িত করে দেয়। তখন আল-কায়েদার সামনে ইয়েমেন, সোমালিয়া ও পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলে হিজরত করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

আল-কায়েদার বিশ্বাস ছিল, ইরাকের তুলনায় পাকিস্তানের এই গোত্রীয় অঞ্চলে তাদের শিকড় অনেক শক্তভাবেই প্রোথিত। কিন্তু তারা এটাও জানতো যে, তখনও সেখানকার নেতৃত্ব ততটা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়নি। এবং তারা জানতো, ইরাকে আমেরিকা যেই কৌশল প্রয়োগ করেছিল, পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকাতেও তেমন কিছুর আশঙ্কা তখনও ছিল। আর আমেরিকানদের এই কৌশলের প্রভাবে পাকিস্তানেও তাদের পতনের আভাস দেখা দিয়েছিল, যখন ২০০৭ সালে ওয়ানায় মোল্লা নাযিরের অনুগত দল ও বহিরাগত উজবেক যোদ্ধাদের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা দিল।

মোল্লা নাযিরের জন্ম ১৯৭৫ সালে। তালেবান শিবিরে যোগদানের আগে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় তিনি গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের দল 'হিযবে ইসলামি'র যোদ্ধা ছিলেন। আফগানিস্তান-পাকিস্তান উভয় দেশের নাগরিক ছিলেন। পূর্ব নাম ছিল আহমাদ জাই ওয়াজির। মোল্লা নাজির আল-কায়েদার ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁর

মূল আনুগত্য ছিল মোল্লা উমারের সাথে। তিনি আল-কায়েদার আদর্শকে অতটা ধারণ করতেন না; গোত্রীয় রীতিনীতির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ গোত্রীয় এলাকার মেহমান। তাদের গোত্রীয় রীতি ও ঐতিহ্য হিসেবে গোত্রনীতি অনুযায়ী আল-কায়েদাকে নিরাপত্তা দেওয়া ছিল তাদের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব। তিনি আল-কায়েদার আদর্শে প্রভাবিত ছিলেন না। আদর্শিক ও সামরিক — উভয় অঙ্গনে তিনি কেবলই মোল্লা উমারের অনুসারী ছিলেন।

যদিও আল-কায়েদা এবং তালেবানের মাঝে ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ওয়াজিরিস্তানের চলমান ক্রিয়াকলাপে আফগান তালেবান খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধও করছিল না। ২০০৬ সালে ওয়াজিরিস্তানে প্রায় চল্লিশ হাজার চেচেন, উজবেক, আরব ও পাকিস্তানি যোদ্ধার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু উজবেকিস্তানের ইসলামি আন্দোলনের নেতা তাহের ইয়ালদোচিভ তাঁর এক ভাষণে আফাগানিস্তানে পশ্চিমা জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তাকে অধিক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরলেন। সেই সময়ে তা আফগান তালেবানের শত্রু চিহ্নিতকরণের অগ্রাধিকার অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দেয়নি। তবে আল-কায়েদার প্রতি তাদের আস্থা ছিল।

আল-কায়েদা পাকিস্তানের তালেবানকে আফগানিস্তানের প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত করছিল, কিন্তু তাদের দ্বিতীয় আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল - প্রয়োজনে এই শক্তিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হবে, যেন আমেরিকার 'War on Terror'-এ আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের মিত্রতা ও সহযোগিতাকে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়। আল-কায়েদার মূল যুদ্ধক্ষেত্র তো আফগানিস্তানই ছিল, তবে আফগানিস্তানের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে পাকিস্তানের দ্বারা আমেরিকাকে সহযোগিতা বন্ধ করাটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। আফগান তালেবানের এই কৌশলটি তখনও বুঝে আসেনি। তারা নিজেরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে চাইছিল না।

আল-কায়েদা বিশ্বব্যাপী ভবিষ্যত পরিকল্পনাকে সামনে রেখে নিজেদের কর্মপন্থা বিন্যস্ত করছিল। আর আফগান তালেবান তাদের টার্গেটকে ফোকাস করেছিল আফগানিস্তানে পশ্চিমা জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধতে। পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও সংবাদ আদানপ্রদানের বিঘ্নতার ফলে আল-কায়েদা ও তালেবান নেতৃবৃন্দের চূড়ান্ত ঐক্যমতে পৌঁছাও সম্ভবত হয়ে উঠছিল না।

২০০৬ সালে মোল্লা উমার পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলে মোল্লা দাদুল্লাহকে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন এই বার্তা সহকারে যে, আফগান ময়দানের ওপরই যেন সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়। মোল্লা নাজির দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে উজবেক মিলিশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও স্থায়িত্বকে ভালো নজরে দেখছিলেন না। কেননা উজবেকেরা আফগান যুদ্ধে অল্প পরিসরে অংশ নিলেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারা বেশি সরব ছিল।

এই পর্যায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই মতবিরোধ থেকে নিজেদের স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা তদবির শুরু করলো। তাদের এই ব্যাপার জানা ছিল যে, মোল্লা নাজিরই একমাত্র তালেবান কমান্ডার, যিনি আল-কায়েদাকে আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও তাদের আদর্শকে পুরোপুরি ধারণ করেন না।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী উজবেক যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মোল্লা নাজিরকে অস্ত্র সরবরাহ করে। ফলে ২০০৭ সালের শুরুর দিকে মোল্লা নাজিরের অনুগত দল ও উজবেক যোদ্ধাদের মাঝে চরম যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়। শতশত উজবেক নিহত হয়ে যায়। যারা প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল, তারা গিয়ে বাইতুল্লাহ মেহসুদের কাছে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেই সেই ঘটনার সমাপ্তি ছিল না। মোল্লা নাজিরের সম্পর্ক ছিল দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ওয়াজির গোত্রের সঙ্গে। আর তাদের সঙ্গে মেহসুদের গোত্রের ছিল চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আদর্শিক পরিচয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও মোল্লা নাজির ও বাইতুল্লাহ মেহসুদ ছিলেন দুই পরস্পর বিরোধী দলের কমান্ডার। উজবেকেরা যেহেতু মেহসুদের সহযোগী ছিল, তাই মোল্লা নাজির তাদের ভালো চোখে দেখতেন না।

আল-কায়েদা অবশ্য এই ঘটনায় তেমন আগ্রহ দেখায়নি। উজবেকেরা সরাসরি আল-কায়েদার নেটওয়ার্কের সাথেও সম্পৃক্ত ছিল না। তারা শুধু আল-কায়েদার বিস্তৃত লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি মেনে চলতো, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে চলতো। তারপরও আল-কায়েদা নেতৃত্বের এমন আশঙ্কা অবশ্যই ছিল যে, কর্মপদ্ধতিগতভাবে আল-কায়েদার পতাকাতলে শামিল হওয়া দলগুলোর পারস্পরিক মতানৈক্য ও দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা যেকোনো সময় তাদের সমস্ত পরিশ্রমকে পন্ড করে দিতে পারে।

এই আশঙ্কার প্রেক্ষিতেই ২০০৮ সালে 'তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান'-এর জন্ম হয়। পাকিস্তানে আল-কায়েদার অনুগত সব দলকে এক পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করা হয়। বাইতুল্লাহ মেহসুদকে এই দলের প্রথম চীফ অব কমান্ডার এবং হাফেজ গুল বাহাদুর ও

মোল্লা ফকিরকে লেফটেন্যান্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সমস্ত সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত করে মোল্লা উমারকে এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক করা হয়। কিন্তু এই ‘তেহরিকে তালেবান’ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আফগান তালেবানের আফগান-কেন্দ্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল।

কমান্ডার মোল্লা নাজির এবং গুল বাহাদুর শুরু থেকেই মেহসুদের নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু আল-কায়েদা খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত ‘তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান’ তথা TTP-এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করতে বাইতুল্লাহ মেহসুদকে সুসংহত করতে থাকে। যদিও আফগান তালেবান খানিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল, তবুও তারা কখনও TTP-এর প্রকাশ্য নিন্দা করেনি। আজও TTP আফগানিস্তানে পশ্চিমা জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিস্তৃত পরিসরে নিজেদের সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত রেখেছে। ২০০৮ সালে মেহসুদ একাই হেলমান্দে আফগান তালেবানের সাহায্যার্থে ২৫০টি সেনাদল আফগানিস্তানে প্রেরণ করেছিলেন।

২০০৮ সালের শেষদিকের মধ্যেই TTP সবগুলো গোত্রীয় এজেন্সি এবং সমগ্র বেলুচিস্তানজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। এভাবে তারা সমগ্র গোত্রীয় অঞ্চলের সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সম্পর্ক নিঃশেষ করতে সক্ষম হয়।

২০০৮ সালের পর মোল্লা উমার TTP-কে পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার অনুমতি দেন। ততদিনে TTP-এর হিন্দুকুশের সারি সারি পর্বতমালার এক প্রাকৃতিক বাংকার ও আশ্রয়স্থল পেয়ে গেছে, যেখান থেকে তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে আটঘাট বেঁধে যুদ্ধে নামতে পারে। তাই এবার আল-কায়েদা সামনে অগ্রসর হওয়ার এবং তাদের বৈশ্বিক অপারেশন পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিল। ইতোপূর্বে পাকিস্তানের শহরগুলোতে সিকিউরিটি ফোর্সের কঠোর পদক্ষপের কারণে এমন অপারেশনের ধারা বিঘ্নিত হচ্ছিল। কেননা বহির্বিশ্বের সঙ্গে আল-কায়েদার যোগাযোগের এই একটিই পথ খোলা ছিল। ইরানি ‘জুনদুল্লাহ’ আল-কায়েদার এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল। ২০০৯ সালে আল-কায়েদা ইরানি জুনদুল্লাহর সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক তৈরি করলো।

জুনদুল্লাহ: আল-কায়েদার নতুন মিত্র

৯/১১ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত যাওয়া-আসার রোড হিসেবে আল-কায়েদা ইরানের ওপর দিয়ে যাওয়া সহজ পথটিই ব্যবহার করতো। একটি চুক্তির ভিত্তিতে ইরান সরকার আল-কায়েদার সদস্যদের এই পথের ব্যবহার দেখেও না দেখার ভান করে থাকতো। ইরানের সঙ্গে আল-কায়েদার এই কূটনৈতিক সম্পর্ক ধরে রাখার দায়িত্বটা ছিল আবু হাফস আল-মৌরিতানির ওপর। ইরাকে আবু মুসআব আয-যারকাভির আবির্ভাবের পর এই কূটনৈতিক সম্পর্কে ফাটল ধরে।

আবু মুসআব আয-যারকাভির জন্ম ১৯৬৬ সালে, জর্ডানে। তিনি আফগান জিহাদে একটি সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইরাকের ময়দানে পাড়ি জমান এবং সেখানে গিয়ে অনেক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ইরাক যুদ্ধে বোমা হামলা ও সামরিক অপারেশনের সর্বোচ্চ প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[45]

রাবেতায়ে উলামায়ে ইসলামির শীর্ষস্থানীয় নেতা, আমেরিকার বিরুদ্ধে ইরাকি প্রতিরোধযুদ্ধের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বশির আল-ফয়িজি আমাকে ওমানে বলেন, *"যদিও ইরাকের প্রতিরোধযুদ্ধে বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, তবুও তারা যারকাভির মতো বিদেশি যোদ্ধাদের বরণ করে নেয়। কারণ, তাঁর অসাধারণ সামরিক কৌশলের ফলে তিনি এবং ইরাকের প্রতিরোধযুদ্ধ সফলতার তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে হঠাৎ করেই যারকাভি শিয়াদের হত্যা করতে শুরু করলেন, যা সুন্নি ইরাকিদের প্রতিরোধযুদ্ধ এবং আল-কায়েদা — উভয়ের নীতি অনুযায়ী-ই আপাতত অগ্রহণযোগ্য ছিল। যদিও যারকাভির ধারণা ছিল, এটা আল-কায়েদার নীতির অনুকূলে ছিল, কিন্তু সেটা ছিল তাঁর ভুল ধারণা এবং বাস্তবতার বিপরীত।"*

আমেরিকান পত্রিকা USA Today তে ১৫ জুন, ২০০৬-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিয়া-বিরোধী যুদ্ধ শুরু করার পেছনে যারকাভির উদ্দেশ্য ছিল ইরানকেও এই যুদ্ধে টেনে আনা। আর এই কর্মকাণ্ডের ফলে ইরান স্বাভাবিকভাবেই আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে গেল। ফলে আল-কায়েদার মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক পরিকল্পনা

---

45. আবু মুসআব আয-যারকাভির শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আল-কায়েদার অন্যতম প্রভাবশালী দুজন আলেম - আবু আবদুল্লাহ আল-মুহাজির এবং আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসি।

চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হলো। ইরান আল-কায়েদার সদস্যদের আসা যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত ইরানের ভেতর বাহিরের সব পথই কঠিন নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেললো। আল-কায়েদার অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে সৌদি এবং মিশরের হাতে তুলে দিল। যারকাভি শিয়াদেরকে এতটাই ক্ষতি করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরও ইরান আল-কায়েদার জন্য নিরাপদ রাস্তা ছাড়তে রাজি হয়নি। সবশেষে ইরানি জুনদুল্লাহর নেতা আবদুল মালিক রিজির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান নিশ্চিত হলো।

আবদুল মালিক রিজি ছিলেন একজন বেলুচ জাতীয়াবাদী এবং প্রাক্তন ড্রাগ স্মাগলার। তিনি কাঁচা পথে গাড়ি চালিয়ে সফর করতেন এবং বিশ পঁচিশ সদস্যের একটি গ্যাং সর্বদাই তাকে ঘিরে রাখতো। ২০০৮ সালের দিকে তিনি করাচির ডিফেন্স হাউজ অথোরিটির (DHA) পাশে মেহমুদাবাদের একটি ঘিঞ্জি বস্তিতে থাকতেন। সেখানে একবার বিরোধী আরেকটি গ্যাংয়ের সঙ্গে এক সংঘর্ষে তিনি আহতও হয়েছিলেন। রিজির দলের একজন প্রাক্তন সদস্য আমাকে বলেছিলেন, তিনি বেলুচ লিবারেশন আর্মির সাথে যুক্ত ছিলেন; এবং পাকিস্তানের লায়ারি থেকে তুর্কি পর্যন্ত প্রকাশ্যে হিরোইন পাচার করতেন।

পাকিস্তান ও ইরানের দুর্নীতিপরায়ণ সিকিউরিটি ফোর্সের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে রিজি কখনোই গ্রেপ্তারির মুখোমুখি হননি। বেলুচ সেনাবাহিনীর কমান্ডার হওয়ায় তিনি ইরান বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গ্রেপ্তারি থেকে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বহু আন্ডারগ্রাউন্ড সংস্থার সঙ্গে রিজির সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এতকিছুর পরও তিনি ইরানি বেলুচিস্তানে বিদ্রোহ ঘটাতে ব্যর্থ ছিলেন।

কয়েক বছর আগে লায়ারিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিলুপ্তপ্রায় সংগঠন ‘সিপাহে সাহাবা’ র সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর থেকে আবদুল মালিক রিজির মাঝে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তার মধ্যে বেলুচ জাতীয়াতাবাদ থেকে সৃষ্ট ইরান বিরোধিতা শিয়া বিরোধিতায় রূপ নেয়। কিছুদিন পর তিনি ‘সিপাহে সাহাবা’-এর ‘লস্করে জাংভী’-তে যোগ দেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে রিজি আফগানিস্তানের জেলা জাবেলেও যান।

কিন্তু তালেবান তাকে আমেরিকান গুপ্তচর সন্দেহে দলে অন্তর্ভুক্ত করতে অসম্মতি জানায়। পরে তাকে আফগান থেকে বের করে দেওয়া হয়।

এরপর ২০০৯ সালে লস্করে জাংভীর সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা আল-কায়েদার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন এবং আল-কায়েদার দাঈরা তার দায়িত্ব নেন। দাঈদের একনিষ্ঠ দাওয়াহর ফলে রিজি তাঁর অতীত কর্মকান্ডের জন্য অনুতপ্ত হন এবং নিজেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে তাঁর নতুন পথচলা শুরু হয়। আল-কায়েদা আবদুল মালিক রিজিকে বেলুচিস্তানে বিদ্রোহ সংঘটিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। বিনিময়ে তিনি আল-কায়েদার সদস্যদের তুরস্ক ও ইরাকে সফরকালে ইরানের অভ্যন্তরে নিরাপদ রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার ওয়াদা করেন।

জুনদুল্লাহর মাধ্যমে রিজি ও আল-কায়েদার সম্পর্কের কারণে ২০০৯ সালটি ইরানের জন্য একটি বিপদসংকুল বছর হিসেবে প্রমাণিত হয়। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে ইরানি বেলুচিস্তানে বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং ইরান রেভ্যুলেশনারি গার্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার নিহত হয়।

এদিকে রিজির দলের সরবরাহ রুট আল-কায়েদার চলাচলের জন্য নিরাপদ রাস্তায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান ইরানকে এই ব্যাপারে সতর্ক করলে ইরান রিজিকে গ্রেপ্তার করে। তবে রিজির গ্রেপ্তার আল-কায়েদার ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এদিকে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার কারণে ইরান ও আল-কায়েদার কৌশলগত সম্পর্ক ততদিনে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল পেশোয়ার থেকে ইরানের রাষ্ট্রদূত হাশমতুল্লাহকে অপহরণ।

তেহরান প্রথমে দূতেকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ISI-এর কাছে আবদার করলো। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। এরপর ইরান জাবেলে তার আফগান-লিঙ্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করলো। তারা তাদের গোত্রীয় ঘনিষ্ঠজনদের দিয়ে কমান্ডার সিরাজউদ্দিন হাক্কানির সঙ্গে যোগাযোগ করলো। এবং সিরাজউদ্দিন হাক্কানির মাধ্যমে ইরান তাদের দূতকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আলোচনায় বসলো।

দূতকে ছাড়িয়ে নেওয়ার বিনিময়ে ইরানের কাছে বন্দী আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মুক্তির শর্ত আরোপ করা হলো। তাদের মধ্যে আবু হাফস আল মৌরিতানী, সুলাইমান আবু গাইস, উসামা বিন লাদেনের কন্যা আইমান বিন লাদেন এবং মিশরের

আল-কায়েদা নেতা সাইফ আল-আদেল প্রমুখ ছিলেন। এই বন্দী বিনিময় আলোচনা কয়েক মাস অব্যাহত ছিল। এরই মধ্যে ইরান-আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এল। ইরান পুনরায় আল-কায়েদাকে তাদের নিরাপদ রাস্তা ব্যবহারের অনুমতি দিল।

এই সময়ে আল-কায়েদা দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের আমেরিকা বিরোধী যুদ্ধ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলো। একদিকে তারা বহির্বিশ্বে নিরাপদ যাতায়াতের জন্য ইরানের ওপর দিয়ে সুরক্ষিত পথ পেয়ে গেল। অপরদিকে পাকিস্তানের পথ ব্যবহার করে আফগানিস্তানে যাওয়া ন্যাটো বাহিনীর সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হলো।

ন্যাটো বাহিনীর ওয়াটার লু পরিকল্পনা

২০০২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত আল-কায়েদার হাজার রজনীর উপাখ্যানে বহু নতুন গল্পই মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেই সময়টাতে আল-কায়েদাকে বেশ কয়েকটি সঙ্কটের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। পুরো সময় জুড়ে তারা নিজেদের বেশকিছু চরিত্রের মাধ্যমে আফগানিস্তানের ভূমিকে আমেরিকার জন্য এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছিল। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ের আগে আল-কায়েদার আরও একটি কৌশলের ব্যবহার বাকিই ছিল।

উসামা বিন লাদেন আর আইমান আজ-জাওয়াহিরি ছিলেন পোড়খাওয়া সেই রণভিজ্ঞ আরব-আফগান যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম, যারা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অংশীদার ছিলেন। সেসময় যোদ্ধারা বিজয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলকে সর্বদাই বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তা হলো উত্তর আফগানিস্তানে রাশিয়ার সাপ্লাই লাইন সফলভাবে কেটে দেওয়া। ২০০৬-এর বসন্তকালীন আক্রমণের সময় আল-কায়েদার নেতারা এমনই কিছু কৌশল অবলম্বন করতে চাইছিলেন, যাতে করে চিরতরে আফগানের মাটিতে ন্যাটোর কবর রচিত হয়ে যায়। আলোচনা-পর্যালোচনার পর খাইবার এজেন্সিকে রণাঙ্গন হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২০০২ সালের পর থেকে খাইবার এজেন্সিই ছিল ন্যাটো বাহিনীর রসদ সরবরাহের প্রধান রাস্তা। প্রায় আশি ভাগ সাপ্লাই সম্পন্ন হতো এই খাইবার এজেন্সির রাস্তা দিয়ে। কান্দাহার দিয়েও কিছু হতো। আর যৎসামান্য বিমান থেকে নিক্ষেপ করা হতো। ন্যাটোর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, খাইবার এজেন্সিতে আল-কায়েদার সহযোগী নিতান্তই অল্প ছিল। সেখানকার আধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল বেরেলভি ঘরানার, যারা কিনা ইসলামের সূফীবাদী মতাদর্শের অনুসারী ছিল। এছাড়াও তালেবান-বিরোধী একজন পাকিস্তানি আলেম এই এলাকার পার্লামেন্ট সদস্য ছিল। এই পরিস্থিতিতে আল-কায়েদার জন্য এখানে ঘাঁটি গাড়া খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

এই সমস্যার সমাধান তখনই হলো, যখন আল-কায়েদা তালেবানকে বোঝাতে পারলো যে, আফগানে পশ্চিমা জোটকে পরাজিত করতে হলে ন্যাটোর সাপ্লাই লাইন বন্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। মোল্লা উমারের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে উস্তাদ ইয়াসিরকে খাইবার এজেন্সির কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। হাকিমুল্লাহ মেহসুদের নেতৃত্বে একটি ছোটো দল 'hit and run' (আঘাত করেই সটকে পড়া) কায়েদায় গেরিলা অপারেশন শুরু করার

জন্য খাইবার এজেন্সিতে রওয়ানা হলো। স্থানীয় গোত্রীয়দের একটি দলও সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসলো। এই সমস্ত আয়োজন ছিল এক নতুন রণক্ষেত্রের সূচনা।

২০০৮ সালে ন্যাটো সাপ্লাই লাইনে সুনির্দিষ্টভাবে আক্রমণ শুরু হলো। ২০০৮ সালের এপ্রিলের দিকে হুমকি ধমকি সম্বলিত বিভিন্ন দেওয়াল লিখন ন্যাটো বাহিনীর নজরে পড়তো। কিন্তু পরবর্তীতে আক্রমণ এতটাই তীব্রতর হতে শুরু করে যে, তালেবান যোদ্ধারা ন্যাটোর বেশ কয়েকটি এয়ার ক্রাফট ও হামভি গাড়ি পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়।

ন্যাটো কমান্ডার পূর্ব অভিজ্ঞতা বশত আগ থেকেই জানতেন যে, সময়ে সময়ে নিত্যনতুন কৌশলে আবির্ভূত হওয়া তালেবানের বৈশিষ্ট্য। এজন্য তিনি বেশ চিন্তিত ছিলেন। রসদ সরবরাহের জন্য পাকিস্তানি পথের বিপরীতে বিকল্প পথ ছিল ইরানের চাবাহার বন্দর। কিন্তু সেজন্য আফগানিস্তানে একটি নতুন হাইওয়ে নির্মাণ করার দরকার ছিল। কালক্ষেপণ না করে হাইওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু করে দিল আমেরিকা। তালেবানের একাধিক হামলার মুখে পড়েও প্রজেক্টটি ২০০৮ সালে শেষ হলো। কিন্তু আমেরিকার জন্য এর পরের কাজটি ছিল আরও কঠিন - এই পথে ন্যাটোর রসদ সরবরাহ করার ব্যাপারে ইরানের অনুমোদন কীভাবে নেওয়া যায়।

ইরানের এই পথ ছাড়া ন্যাটের অন্য আরেকটি বিকল্প পথ ছিল। ইউরোপ-রাশিয়া হয়ে পথটি অতিক্রম করেছে মধ্যএশিয়ার দেশগুলোকে। সেখান থেকে উত্তর আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে বাগরাম হয়ে কাবুলে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু একদিকে এই পথ ছিল অনেক দীর্ঘ এবং প্রচুর ব্যায়বহুল। অন্যদিকে এই দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে আসতে গেলে একটি দ্বি-স্থলবেষ্টিত অঞ্চলও অতিক্রম করতে হতো। ফলে সেই পথটি ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য ছিল। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির শোচনীয়তা এই দুর্গম পথটি ব্যবহারের জন্যই আমেরিকাকে মধ্যএশিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য করলো। এছাড়াও ২০০৯ সালে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে আমেরিকাকে ইরানের সঙ্গেও ব্যাক-চ্যানেল কূটনৈতিক সংলাপে বসতে হয়েছিল। আমেরিকা পূর্বের সমস্ত দাবি-দাওয়া থেকে কেবল এজন্য সরে এল যে, ইরান যেন তাদেরকে ন্যাটোর সাপ্লাইয়ের জন্য ‘চাবাহার বন্দর’ ব্যবহারের অনুমদন দিয়ে দেয়।

শেষে ইরান বেসামরিক রসদ সাপ্লাইয়ের অনুমতি দিতে সম্মত হয়। কিন্তু সেই সুযোগ পুরো ন্যাটো জোটের জন্য ছিল না, তা ছিল নির্দিষ্টভাবে ইউরোপের বিশেষ কিছু দেশের জন্য সীমাবদ্ধ। আর তাই সেটা আমেরিকার জন্য কোনো প্রশান্তিদায়ক সমাধান ছিল না।

ফলশ্রুতিতে আমেরিকা-ব্রিটেন বাধ্য হয়ে ইসলামাবাদের শরণাপন্ন হলো, যেন পাকিস্তান ন্যাটোর সাপ্লাই লাইনের নিরাপত্তার জন্য সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে তাদের সাহায্য করে। কিন্তু নিজের জমিনে জঙ্গিবাদের দুশ্চিন্তা পাকিস্তানের মাথায় এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, পাকিস্তানের এদিকে দৃষ্টি দেওয়ারও সুযোগ ছিল না। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নিজেদের বিভিন্ন রণাঙ্গন নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তাই ন্যাটোর সুরক্ষার জন্য সিকিউরিটি ফোর্সের ব্যাবস্থা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই এই অজুহাত বলে কয়ে পিছিয়ে আসা ছাড়া পাকিস্তানের অন্য কোনো উপায় ছিল না।

এদিকে ন্যাটো বাহিনীর সাপ্লাই লাইনে একের পর এক সফল হামলা তালেবানের মনোবল বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। তারা পেশোয়ারের ট্রাক স্টেশনে ভয়াবহ হামলা পরিচালনা করলো। ন্যাটো রসদবহর রাতের সফরে 'দারহ খাইবার' যাওয়ার সময় সেখানেই বিরতি দিতো। এর পাশাপাশি তালেবান করাচি বন্দরে ন্যাটোর রসদ সরবরাহকারী সামুদ্রিক জাহাজের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শুরু করলো। ন্যাটোর মালামাল স্থানান্তরকারী ঠিকাদার সংস্থার অনেক কর্মকর্তা, যারা কিনা ন্যাটোর সাপ্লাই পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতো, তাদেরকে তালেবান যোদ্ধারা অপহরণ করলো। এছাড়া তাদের রসদ বহনকারী ট্রাক ড্রাইভারদেরকে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি-ধমকি দিল। এই সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে এসে ন্যাটোর সাপ্লাই একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ মিডিয়ার বরাতে জানা যায়, হেলমান্দ এবং গজনীতে ন্যাটোর রসদ পুরোপুরিই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

আল-কায়েদা আর তালেবানের এমন অভূতপূর্ণ সাফল্য পশ্চিমাদের মাঝে বেশ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করলো। পশ্চিমাদের এই প্রথম উপলব্ধি হতে শুরু করলো যে, তাদেরকে এক চোরাবালিতে আটকে দেওয়া হয়েছে। এবার তারা আল-কায়েদা এবং (তাদের দৃষ্টিতে) কট্টরপন্থী তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে নয়া কৌশল অবলম্বন করতে চাইল। তা হলো - (তাদের দৃষ্টিতে আপাত) উদারপন্থী তালেবানের সঙ্গে আপোষ করে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। এটা আসলে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' ধরনের হতাশাব্যঞ্জক কৌশল ছিল।

তালেবানের এমন অভাবিত সাফল্যে তালেবান ও আফগানিস্তান নিয়ে গবেষণাকারী আমেরিকান ও বৃটিশ থিংকট্যাংকগুলোর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের মতে, ২০০৬ সালের পর দক্ষিণ আফগানিস্তান প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে পশ্চিমারা বিকল্প কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে শুরু করলো।

২০০৭ সালের আগস্টে কাবুলে একটি কনফারেন্স ডাকা হলো। সেখানে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদের শামিল হতে বলা হলো। পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ।

সেখানে সিদ্ধান্ত হলো, অঞ্চলভিত্তিক তালেবান কমান্ডারদের প্রলুব্ধ করতে এমন ছোট ছোট পরিষদ ডাকতে হবে। এর উদ্দেশ্য থাকবে উদারপন্থী তালেবানের খুঁজে বের করা। উক্ত কনফারেন্স শেষ হলে পাকিস্তান, আমেরিকা ও ব্রিটেন মিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত সফল করতে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু করে দিল। মাওলানা ফজলুর রহমান গোপনে কোয়েটার সফর করলেন এবং কয়েকজন উদারপন্থী তালেবানের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন। আমেরিকা জোটের এই নতুন কৌশল আশার আলো জ্বেলে দিল। সাবেক তালেবান কমান্ডার মোল্লা আব্দুস সালাম ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সমঝোতা করলেন এবং হেলমান্দ প্রদেশের মুসা কালা জেলার প্রসাশনিক দায়িত্ব বুঝে নিলেন।

এই সময়ে ব্রিটিশ MI6 [46] এর এজেন্টরা নতুন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার শেরার্ড কাউপের সাথে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পশতুন আরবাকাঈ নীতি অনুযায়ী কুনার, পাক্তিয়া, পাক্তিকা ইত্যাদি অঞ্চলে অনেক খাটাখাটনি করলেন। ফলে এই তিনটি অঞ্চলই এই জাতীয় সমাবেশের সফলতার জন্য অনুকূল হয়ে যাচ্ছিল। আর সম্ভাবনা ছিল, যদি এভাবে একের পর এক গোত্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে, তাহলে তালেবানের মধ্যে সত্যিই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামান্য নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগটা পেতো, তবেই এই সফলতা সম্ভব হতো। আল-কায়েদা সেই সুযোগটুকু দিতে রাজি ছিল না।

46. Secret Intelligence Service যা ভিন্ন নামে MI6 নামে পরিচিত। এটি ব্রিটেনের বিদেশি গুপ্তচর বিভাগের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।

সোয়াতের ঘূর্ণিপাকে আফ-পাক কৌশলের ভরাডুবি

উদারপন্থী তালেবানের সঙ্গে সংলাপ-সমঝোতা আমেরিকার সর্বশেষ কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বটে; তবে এখানেই এই কৌশলের সমাপ্তি ছিল না। ২০০৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান, কুনার ও বাজাউরের সীমান্তবর্তী পর্বতের চূড়াসমূহে জোরেশোরে আমেরিকার সেনাঘাঁটি নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছিল। পাকিস্তানের সাথেও চুক্তি হয়েছিল, যেন পাকিস্তান ড্রোন হামলার জন্য তার বিমানঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে এবং আমেরিকার নিরাপত্তা বিষয়ক ঠিকাদারদেরকে পাকিস্তানে কাজ করার অনুমোদন দেয়।

আমেরিকার প্রশাসন একদিকে তালেবানের সাথে সমঝোতামূলক সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে গোত্রীয় অঞ্চল থেকে আল-কায়েদাকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার এজেন্ডা বাস্তবায়নে উঠেপড়ে লেগেছিল। আর পাকিস্তান এই যুদ্ধে আমেরিকার সাথে সমানভাবেই শরিক ছিল।

তবে গোপন সংবাদদাতারা আল-কায়েদাকে আমেরিকার এহেন পরিকল্পনার ব্যাপারে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। আর পত্র-পত্রিকার রিপোর্টেও এই বিষয়টা উঠে এসেছিল যে, খুব দ্রুতই এক নতুন খেল শুরু হতে যাচ্ছে। আল-কায়েদার কাছে তখন একটিই বিকল্প ছিল; আর তা হলো সোয়াত উপত্যকায় যুদ্ধকে আরও তীব্র ও গতিময় করে তোলা। সোয়াতের তালেবান লাল মসজিদ অপারেশনের পরপরই পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান ফৌজী অপারেশনের প্রথম পর্যায়ের তীব্রতায় না পেরে তখন তারা পিছিয়ে এসেছিল। নিঃসন্দেহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধ বন্ধ করার চুক্তি করতে প্রস্তুত ছিল এবং মালাকুন্ড ডিভিশনে ইসলামি বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতেও রাজি ছিল, কিন্তু আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল অন্যকিছু। আল-কায়েদা আগে থেকেই গোত্রীয় যুদ্ধবাজ নেতাদের তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের (TTP) নিয়ন্ত্রণে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এই নতুন দলের নেতৃত্বে বসানো হয়েছিল বাইতুল্লাহ মেহসুদকে। আর সোয়াত উপত্যকার তালেবান যোদ্ধারা ছিল এই দলেরই একটি শাখা।

আল-কায়েদা তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানকে নির্দেশনা দিল সোয়াত উপত্যকায় ফিদায়ি হামলাকারীদের একটি দল পাঠিয়ে দিতে। সোয়তে যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ছড়িয়ে

পড়লো, তখন চতুর কমান্ডার কারী হুসাইন আহমাদ মেহসুদ সেই নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করলেন। মেহসুদ ছিলেন পাকিস্তান তালেবানের এক বিপজ্জনক কমান্ডার, যিনি ফিদায়ি হামলার ট্রেনিংপ্রাপ্ত একটি দলকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এই দলের সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসনের ওপর বিধ্বংসীরূপে আবির্ভূত হলো এবং সোয়াতের সবগুলো পুলিশ স্টেশন গুড়িয়ে দিল। মেহসুদ ও তাঁর উজবেক সঙ্গীরা শত্রু সেনাদের গর্দান কেটে পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে আরও বাড়িয়ে দিলেন।

পাকিস্তানে ইসলামি বিপ্লব সৃষ্টি করতে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানকে আফগান তালেবানের আদলে তৈরি করা ছিল আল-কায়েদার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। কিন্তু আল-কায়েদা তার সামরিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আপাতত দ্রুততার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। কেননা, একদিকে আল-কায়েদাকে পথ খুঁজতে হচ্ছিল উদারপন্থী তালেবানের সাথে সংলাপের আমেরিকান চাল ব্যর্থ করে দেওয়ার; অন্যদিকে পাকিস্তানের শহরগুলোয় বিদ্রোহ সৃষ্টি করার কাজও তদারকি করার প্রয়োজন ছিল।

আল-কায়েদার এই দ্বিতীয় কর্মপন্থা মোল্লা উমারের সেসময়ের চিন্তার বিপরীত ছিল। কিন্তু তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান মোল্লা উমারের হাতে বায়াতবদ্ধ ছিল এবং পশ্চিমের বিরুদ্ধে আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধে তাদের সাথে সমানভাবে শরিক ছিল। তাই এই নতুন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি তেহরিকে তালেবান যোদ্ধাদের সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার মতো কোনো নৈতিক কারণ বা ভিত্তি আফগান তালেবানের ছিল না।

আর তেহরিকে তালেবান যে সরাসরি আফগানের ভূমিতে পশ্চিমা জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না নেমে পাকিস্তানের শহরগুলোতে নতুন যুদ্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে, সেটাকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী একটি পদস্খলন ও বিভ্রান্তি হিসেবে ধরে নিল। কেননা নিজেরা আমেরিকার পক্ষ নেওয়ায় তারা সক্রিয়ভাবে আফগান তালেবানকে তেহরিকে তালেবানের কাজের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে পারছিল না। আবার তারা এটাও চাইছিল না যে, পাকিস্তানে তালেবানের শাখা তৈরি হোক।

তবে এখানে আল-কায়েদার ছিল ভিন্ন পরিকল্পনা। ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের এক নতুন ফ্রন্ট তাদের সামনে উন্মোচিত হলো। বিশ্বে এই প্রথম ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ গোত্রীয় সহায়তার ভিত্তিতে আল-কায়েদার স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো। এখন ভবিষ্যতে যদি আফগান তালেবান কিংবা পাকিস্তান সেনাবাহিনী পশ্চিমের সাথে (দ্বীনের ব্যাপারে) আপোষ করে ফেলার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহলে আল-কায়েদার এই নতুন ও স্থানীয়

শাখা তাদের আফগান সঙ্গিদের এই কথা স্মরণ করে দিবে যে, জিহাদের আন্দোলন শুধুই আফগানের জমিনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিধি পুরো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত। আর আল-কায়েদা সেসময় পাকিস্তান প্রশাসনের কাছ থেকে আসা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানকে তথা TTP-কে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে।

সোয়াতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তালেবানের যুদ্ধ থেকে আল-কায়েদার খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অনেক বেশি ফায়দা হয়েছে। তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই উত্তর এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের রণভিজ্ঞ উজবেক ও পাঞ্জাব কমান্ডারদেরকে সোয়াতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মুজাহিদদের এই নতুন দল সোয়াত রণাঙ্গনের চিত্র একেবারেই বদলে দিল। শিয়া বিরোধী সংগঠন সিপাহে সাহাবার প্রাক্তন নেতা কারী হুসাইন এসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন রঙ চড়িয়ে দিল। স্থানীয় কমান্ডার বিন ইয়ামিনের সাথে মিলে তিনি আটককৃত সেনাদের জবাই করে সেই ছবি ও ভিডিও মিডিয়ায় রিলিজ করে দিলেন। তিনি এমনসব ভীতিকর ও পিলে চমকানো অভিযান শুরু করলেন যে, শত্রু সেনাদের আত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হলো। পুলিশের সদস্য ও তাদের ঘনিষ্ঠ সাহায্যকারীদের আটক করে শিরোচ্ছেদ করলেন। আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি তথা এএনপির তালেবান বিরোধী নেতা ও সদস্যদের জনসম্মুখে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো। এই অভিযানে সোয়াতের স্থানীয় প্রশাসন, থানা, পুলিশ পরিপূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে গেল। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সাহায্য ছাড়া পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল অসহায়। ফলশ্রুতিতে, সোয়াতের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোনো প্রভাবশালী অপারেশন পরিচালনা করার সক্ষমতা থাকলো না।

২০০৮-এর জানুয়ারি নাগাদ পাকিস্তান তালেবান সোয়াতের প্রায় নব্বই ভাগ অংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সফল হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে অল্প কিছু সামরিক চৌকি ও পাহাড়ী ঘাঁটি বিদ্যমান ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ পাকিস্তানের বিলুপ্তপ্রায় সশস্ত্র সংগঠন 'তেহরিকে নেফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদী'-এর প্রধান মাওলানা ফজলুল্লাহর শ্বশুর খাইবার পাখতুনখোয়া জেলায় পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একটি নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। একই মাসে আরেকটি চুক্তি হলো, যেখানে অঙ্গিকার করা হলো যে সোয়াতে ইসলামি শরীয়াহ বাস্তবায়ন ও ইসলামি বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। নিউ তালেবানের সামনে এটা ছিল পাকিস্তান প্রশাসনের প্রথম সারেন্ডার। কিন্তু মালাকুন্ড ডিভিশনে শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের চুক্তি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিজ সম্মান রক্ষার একটি

কৌশল ছিল মাত্র। তারা মালাকুন্ড থেকে বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ছিল। ফলে দেড় বছর লড়াই চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া তালেবানের জন্যও একটু ফুরসত নেবার সুযোগ হয়ে গিয়েছিল।

মজার বিষয় হলো, নতুন তালেবান কেবলই ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিল না। কেননা সোয়াতে ২০০৭-এর যুদ্ধ কেবল এজন্যই হয়নি যে, পাকিস্তান সরকার ইসলামি আইন বাস্তবায়নের ওয়াদা কার্যকর করেনি। বরং সেই ফ্রন্টে আমেরিকার উপস্থিতিকে নিশ্চিহ্ন করা এবং উদারপন্থী তালেবানের সাথে আপোষী চুক্তির ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে তা ছিল আল-কায়েদার একটি পদক্ষেপ। আর তারই সাথে আল-কায়েদা নিজ সামরিক কর্মকাণ্ডের পরিধি সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের অব্যহত সামরিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় কখনো এমনটা শোনা যায়নি যে, তেহরিকে তালেবান মালাকুন্ডে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার দাবি না মানার ভিত্তিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেছে। বরং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তানের সীমানা থেকে হটানোর জন্য সোয়াতের যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল, যাতে পরবর্তীতে আল-কায়েদা আফগানিস্তানের ভূমিতে পশ্চিমা সামরিক জোটের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে। এদিকে সোয়াতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যস্ত থাকার সুবাদে তালেবান খাইবার এজেন্সি, কাঝাঙ্গী এজেন্সি ও দারা আদমখেলে দ্বিতীয়বার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ সফলভাবে কাজে লাগালো।

অন্যদিকে আফগানিস্তানের জন্য আমেরিকা সৌদি আরবকে এই দায়িত্ব অর্পণ করলো যে, তারা ২০০৮-এর আসন্ন রমাদান মাসে প্রাক্তন তালেবান ও হিজবে ইসলামির কমান্ডারদেরকে সৌদি আরবে আমন্ত্রণ জানাবে। তালেবান মুখপাত্র তাইয়্যেব আগা-এর মাধ্যমে সৌদি ইন্টেলিজেন্স প্রধান শাহাজাদা মুকাররিন ও তালেবান প্রধান মোল্লা উমারের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আলোচনা আফগান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই শেষ হয়ে যায়। কেননা মোল্লা উমার শাহাজাদা মুকাররিনকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, তারা আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি নয়।[47]

---

47. মোল্লা উমার তথা তালেবান কখনোই আফগান সরকারকে বৈধ বলেই স্বীকৃতি দেয়নি। তালেবান সবসময়ই ওদেরকে আমেরিকার দালাল সরকার বলে গণ্য করেছে, যারা পশ্চিমা জোটের সহায়তার কারণেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পেরেছে। এর জের ধরেই তালেবান বলে এসেছে যে, আফগান সরকারের সাথে আলোচনায় বসা মানে হলো ওদেরকে বৈধতা দেওয়া।

২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর সমঝোতা সংলাপের প্রক্রিয়া আবারও শুরু হয়, তবে সেটা একতরফাভাবে চলতে থাকে। আফগান সরকারের মাধ্যমে আমেরিকা তালেবানকে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অফার করে। প্রাক্তন তালেবান উপদেষ্টা ও বর্তমান আফগান সিনেটর মৌলভী আরসালাহ রহমানী আমাকে (লেখককে) জানিয়েছেন যে, ২০০৯-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর আমেরিকা ও ব্রিটেন তাকে ও অন্যান্য আফগানদের জোরালো আদেশ প্রদান করে যে, তারা যেন তালেবানকে স্থাপনা ও অবকাঠামোর ওপর হামলা করা থেকে বাধা প্রদান করতে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। রহমানী বলেন যে —

"যদি তালেবান এই প্রথম শর্তটি মেনে নিতো, তাহলে তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করার প্রাথমিক ধাপ শুরু হয়ে যেত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তালেবানকে তুর্কি, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবে দফতর খোলার অনুমোদন দেওয়া হতো, যেখান থেকে আফগান সরকারের সাথে আমেরিকা নিয়মতান্ত্রিক আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবে। সেই আলোচনায় আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহার ও তালেবানের অংশীদারিত্বে নতুন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা হতো।"

কিন্তু তালেবান এই ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু তারা আসলে এমনটা কেন করেছিল? নির্ভরযোগ্য ব্রিটিশ থিংকট্যাঙ্ক এর কারণ হিসেবে এই ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে, আগ থেকেই আফগানিস্তানের ৭৩ পার্সেন্ট ভূমির ওপর তালেবানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর আমেরিকা তার সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহ ও নুরিস্তান থেকে পশ্চাদপসরণ করে যাচ্ছিল।

নতুন পেয়ালায় পুরোনো মদ

বেনজির হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আমেরিকার পাকিস্তান কেন্দ্রিক পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে ভেস্তে যায়। ওয়াশিংটনকে পুরো রোডম্যাপ পুনরায় পরিবর্তন করতে হয়। এই নতুন পরিকল্পনায় পারভেজ মোশাররফ কাবাবের হাড্ডির মতোই অপ্রয়োজনীয় ও অস্বস্তিকর ছিল বিধায় তাকে ঝেড়ে ফেলা হলো। আমেরিকা আসিফ যারদারিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিনন্দন জানালো। আমেরিকান ও পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বকে নতুন করে তাদের দায়িত্ব পালনে নেমে যেতে হলো। পুর্বের 'বুশ-মোশাররফ' জোটের মতো এখন 'মুলিন-কায়ানী' জোট পাকিস্তান আমেরিকান ঐক্যের পথে মৌলিক ভূমিকা পালন করছিল। যে বিষয়গুলোতে তারা চুক্তিবদ্ধ হলো, সেগুলো ছিল —

১. পাকিস্তানে যেকোনো ধরনের সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার কেবল পাকিস্তান সেনাবাহিনীরই থাকবে। পার্লামেন্ট ও প্রশাসনের পারস্পরিক সহযোগিতা তা নৈতিকভাবে সমর্থন করে যাবে।

২. পাকিস্তানে আমেরিকার উপস্থিতিকে আরও ব্যাপক করার জন্য ইসলামাবাদে বিলিয়ন ডলার বাজেট করে আমেরিকান দূতাবাসকে প্রসারিত করা হবে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তান ও আমেরিকা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কঠিন পদক্ষেপ নিবে।

৩. আমেরিকার উপস্থিতির উদ্দেশ্য থাকবে, এই অঞ্চলে যুদ্ধ ও নিরাপত্তার পুরো বিষয়টা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করবে আমেরিকা। আর সাথে সাথে আমেরিকা ও পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

৪. চুক্তির অধীনে বেসরকারি সিকিউরিটি ফোর্স কোম্পানিকে (ব্ল্যাক ওয়াটার) ইসলামাবাদে অফিস খোলার অনুমোদন দেওয়া হবে। ব্ল্যাক ওয়াটার ইতোপূর্বেই ইসলামাবাদে ২৮৪ টি বাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছিল। কোয়েটার আস্তানাগুলো ছিল এই হিসেবের বাইরে। এছাড়াও অপারেশন পরিচালনার জন্য আমেরিকাকে পাকিস্তান তারবিলায় ভূমি প্রদান করলো।

৫. পাকিস্তনি গোয়েন্দা সংস্থা ISI একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করবে, যার কাজ হবে গোত্রীয় অঞ্চলে আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দকে CIA-এর ড্রোনের টার্গেটে পরিণত করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা।

সংক্ষেপে ঘটনা হলো, একদিকে উদারপন্থী তালেবানের সঙ্গে আপোস সমঝোতার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে আল-কায়েদা আর তালেবানের গলায় শক্তিশালী ফাঁস পড়ানোর জন্য তোড়জোড় প্রস্তুতি চলতে থাকলো। নতুন যুদ্ধকৌশলে 'অপারেশন শেরদিল' শুরু করা হলো, যেখানে ন্যাটো ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনী মিলে বাজাউর, মোহমান্দ, কুনার ও নুরিস্তান থেকে আল-কায়েদার সামরিক ঘাঁটিগুলোকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার প্র্যাক্টিকাল রূপরেখা প্রণয়ন করলো।

আল-কায়েদা ২০০৮ সালে চলমান এই সমস্ত কর্মকাণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কিন্তু এর মোকাবেলা করার মতো কোনো মাধ্যম বা উপায় তাদের সামনে ছিল না। এটা ছিল আল-কায়েদার জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতি। এক শক্তিশালী রাজনৈতিক জোট (পাকিস্তান), দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী (আমেরিকা) যুদ্ধযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করছে; আর পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ণাঙ্গভাবে তার সহযোগিতায় রয়েছে। আল-কায়েদার সামনে বাজাউর, মোহমান্দ আর নুরিস্তানে তাদের সামরিক ঘাঁটিসমূহের ধ্বংস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদিকে আল-কায়েদার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, যেমন উসামা আল কেনী, খালিদ হাবিব, আবু লাইস আল-লিব্বিসহ বেশকিছু দুর্লভ মেধা শত্রুর ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, একবার যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোত্রীয় অঞ্চলে সফল হয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে (সদ্য বিজয় পাওয়া) সোয়াত আর মালাকুন্ডে আগ্রাসন চালাবে। আর তেহরিকে তালেবান তার প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। আল-কায়েদা যেন পরিপূর্ণভাবে জালে আটকা পড়ে গেল। নতুন করে কোনো চাল চালার সুযোগ আর তাদের ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে আল-কায়েদা প্রাথমিক পর্যায়ে পকিস্তান সেনাবাহিনী চীফ জেনারেল কায়ানীকে হত্যা করার চিন্তা শুরু করলো।

কায়ানীর দৈনন্দিন কার্যবিধি আল-কায়েদার জানাই ছিল। তিনি প্রায়ই জিমে যেতেন। প্ল্যান করা হলো, জিমে একজনকে প্রস্তুত রাখা হবে, যে তার সাথে গিয়ে 'শহিদি মুআনাকা'[48] করবে। যদি এই মিশন সফল হয়, তাহলে পুরো পাকিস্তান ব্যাপী সঙ্কট ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। ফলে সেনাবাহিনী তখন আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনায় সক্ষম হবে না।

কিন্তু আল-কায়েদার উপদেষ্টামন্ডলী এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের মতে, এর সমস্যা হলো, সেক্ষেত্রে আমেরিকার জন্য পাকিস্তানে সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি

---

48. শহিদি বা ইস্তিশহাদি শব্দগুলো ফিদায়ি হামলার বিকল্প শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হয়ে যাবে। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন আমেরিকার সাথে মিলে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে মোকাবেলায় নেমে যাবে।

এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরির আবির্ভাব হলো।

ইলিয়াস কাশ্মীরি জন্মগ্রহণ করেন পাকিস্তান অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের সামহানি উপত্যকার ভুমবির গ্রামে, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সালে। তিনি ইসলামাবাদে অবস্থিত আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে 'ম্যাস কমিউনিকেশন'-এ ফাস্ট ইয়ার সমাপ্ত করেন; কিন্তু জিহাদি আন্দোলনে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। তাঁর সামরিক অঙ্গনের পথচলার সূচনা হয় 'তেহরিকে আজাদিয়ে কাশ্মীর'-এর মাধ্যমে। এরপর তিনি হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামিতে যোগদান করেন এবং সর্বশেষ নিজে ৩১৩-ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করেন। এই দল দক্ষিণ এশিয়ার এক শক্তিশালী দলে পরিণত হয়, যার সুগভীর নেটওয়ার্ক পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। CIA-এর কিছু নথিতে ৩১৩-ব্রিগেডের ইউরোপে থাকার কথাও উঠে আসে, যেখানে তারা মুম্বাই হামলার মতো বড় ধরনের হামলা পরিচালনা করার সক্ষমতা রাখে।

ইলিয়াস কাশ্মীরির জীবনের ওপর খুব কমই লেখা হয়েছে। যতটুকু লেখা হয়েছে, তাতে অনেক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশ্বের সকল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এই ব্যাপারে একমত যে, তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের তৎপর, কৌশলী, বিপজ্জনক ও সফল গেরিলা কমান্ডার ছিলেন।

প্রথমে একবার তিনি ভারতীয় ফোর্সের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে জেল ভেঙ্গে পালিয়ে আসেন। এরপর মোশাররফকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ISI তাঁকে গ্রেপ্তার করে; কিন্তু ছেড়ে দেয়। যখন তিনি কাশ্মীরে অপারেশন বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানান, তখন তাঁকে ISI-এর হাতে দ্বিতীয়বার আটক হতে হয়। সেখান থেকে মুক্তিলাভ করেন ২০০৫ সালে। এবারের গ্রেপ্তারি থেকে রেহাই পাবার পর ২০০৫ সালে তিনি কাশ্মীর ছেড়ে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে যান।

সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্কীর্ণ গিরিপথে ইলিয়াস কাশ্মীরির উপস্থিতির সংবাদ ওয়াশিংটনের মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছিল।

ওয়াজিরিস্তান এসে ইলিয়াস কাশ্মীরির উপলব্ধি হয় যে, তিনি নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আফগানিস্তানের প্রাচীন ধারার গেরিলা যুদ্ধকে আধুনিক গেরিলা অপারেশনে রূপান্তরিত করতে পারবেন। তাঁর অতীতের রেকর্ড তাঁর উপলব্ধির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছিল।

১৯৯৪ সালে তিনি তাঁর গ্রেপ্তার হওয়া মুজাহিদ সঙ্গিদের মুক্ত করতে নয়াদিল্লিতে 'আল হাদিদ' নামক অপারেশন পরিচালনা করেছিলেন। পঁচিশ সদস্যের সেই গ্রুপে শাইখ উমার সাঈদ (যিনি ২০০২ সালে করাচিতে আমেরিকান সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্লকে অপহরণ করেছিলেন) তাঁর সহকারী ছিলেন। সেই গ্রুপের সদস্যরা আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ইসরায়েলের কয়েকজন পর্যটককে অপহরণ করে দিল্লির নিকটবর্তী গাজীয়াবাদে নিয়ে যায়। এরপর ভারত সরকারের কাছে অপহৃত পর্যটকদের বিনিময়ে তাঁর সঙ্গিদের মুক্তির দাবি করে। তখন ভারতীয় সরকার তাঁর দাবি না মেনে উল্টো লোকেশন ট্রাক করে হামলা চালায়, যার ফলে শাইখ উমার সাঈদ আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়ে যান। সেবার ইলিয়াস কাশ্মীরি নিরাপদে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। (আর পরবর্তীতে শাইখ উমার সাঈদকে ভারতীয় বিমান অপহরণ করে সেখানকার যাত্রীদের বিনিময়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল)

২০০০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা 'লাইন অব কন্ট্রোল'[49] অতিক্রম করে আজাদ কাশ্মীরের লঞ্জুট গ্রামে প্রবেশ করে এবং ১৪ জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। এই কমান্ডোরা কিছু পাকিস্তানি কিশোরীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে তিনজনের মাথা কেটে পাকিস্তানি সেনাদের দিকে নিক্ষেপ করেছিল। এর পরবর্তী দিনই ইলিয়াস কাশ্মীরি 'লাইন অব কন্ট্রোল' পাড়ি দিয়ে নিকিয়াল সেক্টরে ৩১৩-ব্রিগেডের পঁচিশ জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা অপারেশন পরিচালনা করেন। তখন প্রতিশোধস্বরূপ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসারকে অপহরণ করে তার শিরচ্ছেদ করা হয় এবং তার কর্তিত মস্তক কোটলির বাজারে বাজারে প্রদর্শন করা হয়।

---

49. Line of Control (LoC) শব্দটি দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরের ভারত এবং পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত অংশের মধ্যে সামরিক নিয়ন্ত্রণ রেখাকে নির্দেশ করা হয়। এটি আইনত স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সীমানা নয়, তবে ব্যবহারিক সীমান্তরেখা হিসাবে কাজ করে।

এই নিয়ন্ত্রণ রেখাটি পূর্বে Cease-fire Line নামে পরিচিত ছিল, যা ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই 'সিমলা চুক্তি' থেকে নতুন এই নামে অভিহিত হয়।

ইলিয়াস কাশ্মীরির সবচেয়ে ভয়াবহ অপারেশন ছিল ২০০৬ সালে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের আঙ্কুরছাউনির ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, যে সময়টায় গুজরাটে মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়েছিল। এই অপারেশনে তিনি তাঁর ৩১৩-ব্রিগেডের সদস্যদের দুই ভাগে ভাগ করে দেন। প্রথম হামলার পর ভারতীয় জেনারেল, ব্রিগেডিয়ার ও অন্যান্য সিনিয়র অফিসাররা ঘটনাস্থলে এসে একত্রিত হলে সেখানে দ্বিতীবার হামলা চালানো হয়। যেখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের সাথে সংঘটিত তিন তিনটি যুদ্ধে একজন জেনারেলকেও আহত করতে সক্ষম হয়নি, সেখানে ইলিয়াস কাশ্মীরির সেই হামলায় দুই জেনারেল আহত হয় এবং কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেল নিহত হয়। কাশ্মীরে চলমান ভারতীয় আগ্রাসনের দীর্ঘ ইতিহাসে সেটা ছিল ভারতের জন্য সুস্পষ্ট পরাজয়।

ভারতের অপারেশনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি আল-কায়েদা নেতাদের সম্মুখে এই মতামত তুলে ধরে তাদেরকে বিস্ময়াবিভূত করে দেন যে, এখন চলমান বিপজ্জনক ফাঁদ থেকে বের হওয়ার একটিই পথ। আর তা হলো - যুদ্ধের পরিধিকে বিস্তৃত করে দেওয়া। তাঁর বিশ্লেষণ ছিল, ভারতে এত বড় আকারের অপারেশন পরিচালনা করা হোক, যেন ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে তৈরি করা সব অপারেশন প্ল্যান নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল-কায়েদা সানন্দে তাঁর এই প্ল্যান গ্রহণ করে নেয়, এবং ভারতের ওপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইলিয়াস কাশ্মীরি এই প্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে প্রাক্তন অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী মেজর হারুণ আশেকের হাতে। মেজর হারুণ নিজেও লস্করে তইয়্যেবার প্রাক্তন কমান্ডার ছিলেন এবং তখনও তাঁর সাথে লস্করে তইয়্যেবার নেতৃবৃন্দ - জাকিউর রহমান লখভী ও কমান্ডার আবু হামযার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মেজর হারুণের জানা ছিল যে, ISI লস্করের মাধ্যমে ভারতে স্বল্প পরিসরে একটি হামলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনা নিয়ে কয়েকমাস যাবত তারা চিন্তা করছিল, কিন্তু সরকারি পলিসি এটাই ছিল যে, এই জাতীয় হামলা না করা। প্রাক্তন সেনাবাহিনী অফিসার মেজর হারুণ ভারতে অবস্থিত ইলিয়াস কাশ্মীরির লোকদের মাধ্যমে ISI-এর এই প্ল্যান নিজেই বাস্তবায়ন করে ফেলেন। এভাবেই ISI-এর সামান্য হামলার প্ল্যান ২৬ নভেম্বর, ২০০৮-এর ভয়াবহ মুম্বাই হামলায় রূপান্তরিত হয়।

তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারীরা করাচি থেকে যাত্রা শুরু করে। আরব সাগরে নেমে ভারতের একটি মৎস্যশিকারী ট্রলার অপহরণ করে তার সব সদস্যকে হত্যা করে এবং রাবারের

নৌকা ব্যবহার করে মুম্বাই প্রবেশ করে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী প্রথম ঘটনাটি ঘটে রাত আটটার সময়, যখন উর্দুভাষী দশজন মানুষ বাতাসভরা রাবারের নৌকায় করে কোবলা উপকূলের ভিন্ন ভিন্ন দুটি জায়গায় অবতরণ করে। তাদের টার্গেট ছিল সম্রাট শিবাজী টার্মিনাল, লিওপোল্ড ক্যাফে, তাজমহল প্যালেস হোটেল, দ্য ওবেরয় হোটেল এবং ইহুদি জনবসতি নরম্যান হাউস। প্রথমে তারা লোকদের জিম্মি করে এরপর সবাইকে হত্যা করে। অপারেশন ৭২ ঘন্টা চলমান ছিল। ২৬ নভেম্বরের এই ঘটনা পুরো বিশ্বকে বাকরুদ্ধ করে দেয়।

২৬/১১-এর এই হামলা ছিল ৯/১১-এর হামলার মতোই। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে পাকিস্তানের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ করানো। ঠিক সেভাবেই, যেভাবে ৯/১১ হামলার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে আফগানিস্তানের যুদ্ধে উস্কে দেওয়া। ২৬ নভেম্বরের এই হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানের দৃষ্টিকে ওয়ার অন টেরর থেকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে ন্যাটো বিরোধী যুদ্ধে এই অবস্থা থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারে।

ওয়াশিংটনের পলিসি মেকাররা এই ঘটনার পেছনের উদ্দেশ্য ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তারা সাথে সাথেই ভারত-পাকিস্তানে দৌড়ে আসে এবং দুই দেশের যুদ্ধের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। ভারত আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যখন একে অপরের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর আল-কায়েদার মধ্যকার যুদ্ধ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় হামলার তরবারি পাকিস্তানের মাথার ওপর লটকে থাকার সময়টায় আল-কায়েদার যোদ্ধারা যেন কুনূতে নাযেলা পড়ছিল, যাতে কোনো মুসলিমের ওপর তাদের অস্ত্র ওঠাতে না হয়। বরং তারা দোয়া করছিল, যেন পাকিস্তান ও আল-কায়েদার সৈন্যরা ভারতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ শুরু করে। আর ঠিক সেই সময়ই আমেরিকান হস্তক্ষেপে যুদ্ধ শুরু হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেই সুযোগে যোদ্ধারা খাইবার এজেন্সিতে ন্যাটোর সাপ্লাই লাইনে আক্রমণ শুরু করে দেয়। এর ফলে পাক-আফগান সীমান্তে বেশ কয়েকদিনের জন্য রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। আর এর প্রভাব আফগানিস্তানে বিশেষ করে গজনী, ওয়ারদাক ও হেলমান্দে ন্যাটো সেনাবাহিনীর ওপর বিরাট আকারে গিয়ে পড়ে। ন্যাটোর কাছে রসদ না পৌঁছার কারণে তাদের অপারেশন রীতিমত বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে ভারতের সাথে সঙ্কট তৈরি হওয়ার ফলে পূর্ব সীমান্তের 'অপারেশন শেরদিল'-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণে স্থবিরতা নেমে আসে। ফলে ২০০৯-এ এসে তারা তালেবানের শর্তাবলি মেনে তাদের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি করে নিতে বাধ্য হয়।

এরপর বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। সোয়াতে নতুন করে অপারেশন হয়। মোহমান্দ এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানেও অপারেশন হয় এবং ড্রোন হামলায় বাইতুল্লাহ মেহসুদ শহীদ হন। কিন্তু এসব ঘটনায় যোদ্ধাদের মনোবল অবদমিত হয়নি। তারা এসব হামলার একের পর এক জবাব দিতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ২০০৯-এর ১০ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার তথা GHQ-এ হামলা চালায় এবং ৪ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডির ফৌজি মসজিদে সেনা অফিসারদের হত্যা করে।

এই ঘটনাগুলোর অন্তরালে আল-কায়েদার আরব্যরজনীর এক নতুন গল্প মঞ্চস্থ হওয়ার প্রস্তুতি হতে থাকে, যার জন্য উদ্বিগ্ন আমেরিকান প্রশাসনকে আরও তেইশ হাজার নতুন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে হয়। আল-কায়েদা পরবর্তী ধাপের নতুন কর্মপন্থা তৈরি করতে থাকে। এর পাশাপাশি কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরিকে আল-কায়েদার সামরিক বিভাগের প্রধান বানানো হয়।

ইলিয়াস কাশ্মীরির প্রদত্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সোমালিয়া ও ইয়েমেনে নতুন রণাঙ্গন সাজানো হয়। যেখান থেকে পশ্চিমা বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে টার্গেটে পরিণত করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মধ্যপ্রাচ্যে আল-কায়েদার অপারেশনের জন্য ইয়েমেনকে কেন্দ্র বানানো হবে। পাশাপাশি সেখান থেকে সৌদি আরবের আমেরিকান ঘাঁটিকেও টার্গেটে পরিণত করা হবে। এছাড়াও ইলিয়াস কাশ্মীরির সামরিক পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পাক-আফগান যুদ্ধকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

এদিকে ISI আর CIA— উভয়েরই ধারণা ছিল কাশ্মীরি কী চাইছেন। তাই ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ISI থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তিন তিন বার তাঁকে টার্গেট করে ড্রোন হামলা চালানো হয়। সর্বশেষ হামলায় তাঁর মৃত্যুও ঘোষণা করে দেওয়া হয় এবং ওয়াশিংটন তাঁর মৃত্যুকে সরকারিভাবে 'War on Terror'-এর এক মীমাংসিত অধ্যায় হিসেবে ঘোষণা করে।

সেই ঘটনার পর ৩১৩-ব্রিগেড আমাকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আমন্ত্রণ জানায় এবং সেখান থেকে আঙ্গোরাড্ডায় নিয়ে যায়, যেখানে ইলিয়াস কাশ্মীরি আমার কাছে ইন্টারভিউ প্রদান করেন এবং তাঁর মৃত্যুর সংবাদকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। তিনি বলেন,

“আল-কায়েদার যুদ্ধকে ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা মূলত আমেরিকার শক্তিকে খতম করার জন্যই।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “পৃথিবীর কি মুম্বাই হামলার মতো আর কোনো হামলার সংবাদ শোনার সম্ভাবনা আছে?”

তিনি বললেন, “ভবিষ্যতে ভারতের জন্য যে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আছে, মুম্বাই হামলা সেগুলোর সামনে অতি নগণ্য।”

পরবর্তীতে এমন অনেক মানুষ — যাদের মধ্যে কয়েকজন সুনিশ্চিতভাবেই কাশ্মীরির দলের লোক ছিলেন — আমেরিকায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। তারা স্বীকারও করেছিল যে, তারা ভারতের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে (জাতীয় সামরিক কলেজ) হামলার পরিকল্পনা করছিল। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে একত্রিত ভারতের শ্রেষ্ঠ সেনা অফিসারদের হত্যা করা। তারা এই স্বীকৃতিও দেয় যে, ভারতে যুদ্ধের ফ্রন্ট খোলার জন্য মুম্বাই ও দিল্লি ছাড়াও আরও কয়েকটি টার্গেটে তাদের হামলার পরিকল্পনা ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, ভারত-পাকিস্তানের বিরোধের সুযোগে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল হয়ে যাবে। তারা একথাও জানিয়েছিল যে, ইউরোপেও তারা এই জাতীয় অপারেশন পরিচালনার জন্য চিন্তাভাবনা করছিল। এবং ডেনমার্কের যে পত্রিকা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশ করেছিল, সেখানেও হামলার পরিকল্পনা ছিল।

৯/১১-এর পরই আল-কায়েদা যুদ্ধ ও শান্তির একটি রাজনৈতিক কৌশল ঠিক করে নিয়েছিল। তারা যুদ্ধে স্থিরতা লাভের জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিচুক্তির কৌশল অবলম্বন করেছিল। আবার যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করছিল। তাদের কৌশল হলো, এভাবেই চলতে থাকবে, যতদিন না চূড়ান্ত বিজয়ধ্বনি বেজে ওঠে!

তৃতীয় অধ্যায়

নেতৃত্ব গঠন

ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি সাধারণ কোনো মানুষ নয়, বরং অর্ধ শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত এক বিপ্লবের নাম। অনেক লেখকই তাঁর সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেছেন। যেমন শৈশবে অন্যান্য ছেলেদের বিপরীতে তিনি খেলাধুলাকে অপছন্দ করতেন, এড়িয়ে চলতেন। তখন থেকেই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো তিনি কাব্যানুরাগী ছিলেন। যদিও তিনি সার্জন হয়েছিলেন দুনিয়াবি শিক্ষার্জনের মাধ্যমে, তথাপি সাইয়্যেদ কুতুব ও তাঁর রচনাকর্ম তাঁর জীবনপথের আলোকিত মশাল ছিল। সাইয়্যেদ কুতুব ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একজন চিন্তাবিদ, যাকে ইসলামি বিপ্লবকেন্দ্রিক কিতাবাদি রচনার অভিযোগে ১৯৬০ সালে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।

আইমান আজ-জাওয়াহিরির জীবনে সাইয়্যেদ কুতুবের গভীর প্রভাব ছিল। ফলে ইসলামি বিপ্লব তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়। তাঁর বিশ্বাসমতে, যেকোনো মানবরচিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অপরিহার্য। কেননা, এই ব্যবস্থা হলো জাহিলিয়াত। যেমনটা সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর রচনায় বলেছেন। তিনিসহ অন্যান্য কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তিত্ব পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জাহেলি ব্যবস্থা সাব্যস্ত করেছিলেন। ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি চৌদ্দ বছর বয়সে ইখওয়ানে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালে সাইয়্যেদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সফল করার জন্য আজ-জাওয়াহিরি কৌশল প্রণয়ন করতে শুরু করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি সার্জন হিসেবে দায়িত্ব পান, বিয়ে করেন এবং প্র্যাক্টিস শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যেন অন্যান্য সংগঠনের সাথে মিলে মিশরীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করা যায়।

পরবর্তীতে তাঁর জেল হয়, মুক্তি পান, হিজরত করেন ও আফগান জিহাদে শরিক হন। এছাড়া মিশরের অন্য একটি বিপ্লবেও অংশ নিয়েছিলেন; এবং শেষমেশ আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য আল-কায়েদায় যোগদান করেন। এই পঞ্চাশ বছরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি একটি বিপ্লব হিসেবে নিয়েছিলেন। চাই হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হোক, গোপন সংগঠনের কাজ হোক বা বিয়ে-ই হোক। এই পুরো জীবনে সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর প্রেরণার বাতিঘর ও চেতনার মশাল ছিলেন। সাইয়্যেদ কুতুবের দিকনির্দেশনার আলোকে আজ-জাওয়াহিরি মুসলিম বিশ্বে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত করতে, জিহাদের মাধ্যমে জাহিলিয়াহকে পরাজিত করতে কাজ করেছেন।

১৯৭৯ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানের ওপর আগ্রাসন পরিচালনা করে, তখন সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার মুসলিম আফগান প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তানে আসে। তাদের অধিকাংশই জিহাদের ডাকে 'লাব্বাইক' (অর্থাৎ, উপস্থিত) বলে ইসলামের বিজয়ের জন্য লড়াই করতে আসেন। তারা ইসলামের স্বার্থে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঐ হাদিসের ওপর তাদের আশা ছিল যে, শেষ যুগে খোরাসান থেকেই ইসলামি বিজয়ের সূচনা হবে। এই মুজাহিদদের সামনে যখন আবদুল্লাহ আযযামের মতো আলেমগণের ফাতওয়ায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের প্রতিরোধযুদ্ধ একটি নিরেট ইসলামি জিহাদ এবং এর উদ্দেশ্য হলো আফগানিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, তখন তারা আফগানিস্তানে ছুটে আসতে দেরি করেননি।

আফগানিস্তানে চলে আসা সেই তরুণ আরবদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আইমান আজ-জাওয়াহিরির মতো অভিজ্ঞ পেশাজীবী। তারাও ইসলামি বিপ্লবের জন্য উৎসর্গিত ছিলেন এবং বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য নিজের জান কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই মানুষগুলো শুধু আফগানযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেই নয়, বরং এসেছিলেন এক বিস্তৃত পরিসরের বিপ্লবের সূচনা করতেও। তারা দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামি বিপ্লবের একটি কেন্দ্র নির্মাণ করতে চাইছিলেন, যা কিনা বৈশ্বিক খিলাফাতের জাগরণের লক্ষ্যে কাজ করবে। পরবর্তীতে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ার পিছু হটার পর এই মানুষগুলো একই আদর্শে প্রভাবিত হন এবং এই আন্দোলনের প্রাণসদৃশ সৈনিকে পরিণত হন।

আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত আগ্রাসনের পর থেকে ৯/১১ পর্যন্ত ঘটনাসমূহের এটা একটি সাধারণ বর্ণনা। যদিও বাস্তবে তা আরও জটিল, দুর্বোধ্য ও রহস্যময়।

এই আন্দোলন আজ-জাওয়াহিরির মতো ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত, উসামার মতো ব্যক্তিরা যাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রত্যেকেই তাঁর আদর্শ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। আর এই প্রক্রিয়া অবাধে চলতে থাকে এবং বৈশ্বিক লড়ায়ের জন্য আল-কায়েদার বাহিনী প্রস্তুত হতে থাকে। তবে তার কেন্দ্র আফগানিস্তানই রয়ে যায়।

ইতোপূর্বে আল-কায়েদার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পশ্চিমা জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়নি। যতটুকু উঠে এসেছে, তাও ছিল বিভ্রান্তিকর। এই কারণে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা জোট যে

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। ৯/১১-এর পূর্বে বিশ্বের সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আল-কায়েদাকে একটি অনিয়মিত সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবেই জানতো, যার আমেরিকার ওপর হামলা করার মতো সক্ষমতা নেই। এমনকি যখন আল-কায়েদার সত্যিকারের সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা হলো, তখনও তাদের প্রকৃত শক্তি, ক্ষমতা ও লক্ষ্য ছিল রহস্যের আঁধারেই। বাস্তবে আমেরিকাকে পরাজিত করাই ছিল আল-কায়েদার প্রধানতম লক্ষ্য; আর তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ছিল এই চিন্তারই প্রতিফলন।

যেকোনো যোদ্ধাদের জন্যই আদর্শ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে, কিন্তু শুধুমাত্র আদর্শ এককভাবে কোনো ফল বয়ে আনতে পারে না। সফলতার জন্য আদর্শের সাথে বৈষয়িক উপকরণের সেতুবন্ধন জরুরি। এই দুটোর যেকোনো একটির অনুপস্থিতিই ব্যর্থতা ডেকে আনে। অনানুষ্ঠানিকভাবে আল-কায়েদার সূচনা হয়েছিল ১৯৮০ সালে। তবে এর মূল অবকাঠামো রচিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে, যখন আদর্শ ও উপকরণের যথাযোগ্য সম্মিলন ঘটে। অর্থাৎ, যখন আইমান আজ-জাওয়াহিরির বিপ্লবি আদর্শ এবং উসামা বিন লাদেনের উপকরণের পারস্পরিক মেলবন্ধন হয়।

ছ' ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা উসামা বিন লাদেন আমির ও শাহী খান্দানের এতটা ঘনিষ্ঠ যে, তাদেরই একজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অভিমানী তরুণ হিসেবেই তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। চৌদ্দ বছর পূর্বে সৌদি আরব প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে (Gulf War) পশ্চিমা সৈন্যদেরকে নিজ ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কারণে উসামা বিন লাদেন সৌদি বাদশাহের সমালোচনা করেছিলেন।

ব্যবসায়িক মহলে বিন লাদেন পরিবারের অনেক সুনাম সুখ্যাতি ছিল এবং শাহী খান্দান ও ব্যবসায়িক ঘরানায় তাঁদের অনেক সম্মান ও মর্যাদা ছিল। পরিবারের লোকজন বিন লাদেনকে পরামর্শ দিয়েছিল, যেন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে বাদশাহের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়। সৌদি রাজপরিবারের অনেকে, যাদের মধ্যে শাহাজাদা তুর্কি ও শাহাজাদা আবদুল্লাহ ছিলেন অন্যতম, সেই বিরোধের সমাধানকল্পে যারপরনাই চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু কোনো ফল হয় না।

উসামা বিন লাদেন ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে ভুল ধারণা ও ভিত্তিহীন সমালোচনার সেটাই ছিল সূচনা। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স তাঁকে সৌদি রাজপরিবারের বিদ্রোহী সাব্যস্ত করে, যিনি ১৯৮০ সালে আফগান যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই

করেছিলেন, কিন্তু সৌদি আরবে তিনি একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। মূলত উসামা বিন লাদেন শুরু থেকেই আমেরিকার বিরোধী ছিলেন। যখন সৌদি আরব প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমেরিকান সেনাদের নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানায়, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।[50] কিন্তু সেই সময় তাঁর সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছিল না।

---

50. উসামা বিন লাদেনের এমন চিন্তাভাবনা ইসলামের আলোকে বাড়াবাড়ি বলা যায় না। কেননা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওয়াসিয়্যাত ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান আর মুশরিকদেরকে আরবের জমিন থেকে বের করে দেওয়া। আর সেটা পূর্ণ করেছিলেন আমিরুল মুমিনিন উমার ইবনু খাত্তাব رضي الله عنه । হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بِثَلاَثَةٍ فَقَالَ "أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَأُنْسِيتُهَا

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ (ইন্তিকালের সময়) তিনটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুশরিকদের আরবভূমি হতে বের করে দেবে, তোমরা রাষ্ট্রদূতদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে যেমনটা আমি তাদের সাথে করে থাকি।"

রাবী বলেন, ইবনু আব্বাস رضي الله عنه তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে চুপ থাকেন। অথবা তিনি বলেন, আমি তা ভুলে গিয়েছি। [সুনানে আবু দাউদ ৩০২৯, অনুরূপঃ সহিহুল বুখারি ৪৪৩১, সহিহ]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلاَ أَتْرُكُ فِيهَا إِلاَّ مُسْلِمًا

উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছেন, "আমি ইয়াহুদি ও নাসারাদের অবশ্যই আরবভূমি হতে বের করে দেব এবং এখানে মুসলিম ছাড়া আর কেউ থাকবে না।" [সুনানে আবু দাউদ ৩০৩০, তিরমিযি ১৬০৭ সহিহ]

আর আরব ভূমি বলতে যে বিস্তৃত জমিন বোঝানো হয়, তা হাদিসের ভাষায়,

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - قَالَ قَالَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ إِلَى تُخُومِ الْعِرَاقِ إِلَى الْبَحْرِ

সাঈদ অর্থাৎ ইবনু আবদিল আযিয رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আরবভূমি 'ওয়াদী-কুররা' হতে ইয়েমেনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইরাক হতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।" [সুনানে আবু দাউদ ৩০৩৩, সহিহ]

অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত হলো - আমেরিকার বিরুদ্ধে উসামা বিন লাদেনের যে উচ্চবাচ্য শুরু হয়েছিল, হয়তো তা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকত, যদি না ১৯৯৭ সালে আইমান আজ-জাওয়াহিরির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হতো। আইমান আজ-জাওয়াহিরি উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, এমনকি এটা তাঁর অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, একসময় আমেরিকার বিরুদ্ধে দেওয়া তাঁর অনিশ্চিত হুমকি এক ভীতিকর বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়।[51]

সৌদিবিরোধী দল 'মুভমেন্ট ফর ইসলামিক রিফর্ম ইন অ্যারাবিয়া'-এর প্রধান সাদ আল-ফাকিহকে আল-কায়েদা বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। টেররিজম মনিটরের বিশেষ প্রতিনিধি মাহান আবেদিন ২০০৪-এর ২৩ জানুয়ারি লন্ডনে সাদের একটি ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিস্তারিত বলেন যে, কীভাবে আজ-জাওয়াহিরির আদর্শ গ্রহণ আমেরিকাবিরোধী যুদ্ধের ক্ষেত্রে উসামা বিন লাদেনের চিন্তা ও আদর্শের গতিপথকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সাদের মতে, ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে আজ-জাওয়াহিরির

---

51. তালেবান কমান্ডার মোল্লা দাদুল্লাহর The Return of Black Flags গ্রন্থতেও উসামা বিন লাদেনের মিশরীয় ক্যাম্পের সঙ্গীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

তবে আদর্শিকভাবে উসামা বিন লাদেন তাঁর শিক্ষক ড. আবদুল্লাহ আযযামের কাছ থেকেও দীক্ষিত ছিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলাকালীন সময়ে ড. আবদুল্লাহ আযযাম সৌদি আরব থেকেও সৈন্য ও রসদের ব্যবস্থা করেছিলেন, তৎকালীন গণ্যমান্য আলেম এবং কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়েছিলেন। এই সমস্ত কারণে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর পর প্রথমদিকে সৌদি আরবের ব্যাপারে উসামা আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ হয়ে যায়, যখন উপসাগরীয় যুদ্ধে তাঁর মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর প্রস্তাব নাকচ করে পবিত্র ভূমিতে কাফির সর্দার আমেরিকাকে আহ্বান জানানো হয়।

ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি সহ মিশরীয় ক্যাম্পের সদস্যরা উসামাকে আদর্শিকভাবে পুনর্জীবিত করলেও বৈশ্বিক জিহাদের পরবর্তী টার্গেট নির্ধারণের ব্যাপারে প্রথমদিকে আঞ্চলিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এমনকি ডা. আজ-জাওয়াহিরি সহ অন্যান্যরাও প্রথমে মিশরকেন্দ্রিক জিহাদি আন্দোলনের চিন্তাভাবনা করছিলেন। তখন উসামা বিন লাদেনই প্রস্তাব করেছিলেন আমেরিকাকে টার্গেট করার এবং এর মাধ্যমে পবিত্র ভূমি বায়তুল মাকদিস মুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোনোর। এর ফল হিসেবেই ১৯৯৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইহুদি-মার্কিন বিরোধী 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্টের' ঘোষণা আসে, যা পরবর্তীতে আল-কায়েদার বর্তমান কাঠামোয় রূপ নেয়।

এই বইতে বিভিন্ন জায়গায় কেবল একপাক্ষিক আলোচনা এসেছে। তবে মূল ঘটনা যেমনই হোক, উসামা বিন লাদেন এবং ডা. আইমান আইজ-জাওয়াহিরি সহ মিশরীয় ক্যাম্পের সঙ্গীদের সম্মিলনের ফলেই যে আল-কায়েদার বর্তমান আদর্শিক ও কর্মপদ্ধতিগত রূপ দাঁড়িয়েছে, তা স্পষ্ট।

সাথে সাক্ষাতের পরই উসামা বিন লাদেনের আমেরিকাবিরোধী কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সাদের বর্ণনায়, *“বৈশ্বিক পরিসরে আজ-জাওয়াহিরি ও বিন লাদেন তাঁদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক্ষেত্রে শুধু নিজেদের উপকরণ ব্যবহার করে নয়, বরং সুযোগ বুঝে শত্রুর উপকরণকেও কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত হলো। অর্থাৎ, শত্রুর সরঞ্জামাদিকে শত্রুর বিরুদ্ধেই এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা।”*

সাদ আরও বলেন —

“আমরা শুরু থেকেই বলি। যখন উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানের যুদ্ধে যোগদান করেন, তখন তিনি সাধাসিধে দৃষ্টিভঙ্গির একজন মুসলিম ছিলেন; যিনি কেবল তাঁর মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করতে চান। আর নিঃসন্দেহে তখনই তিনি বিশ্বরাজনীতি ও রাশিয়া-আমেরিকার শক্তির ভারসাম্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে সামরিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকতে হতো। তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর মতে, তিনি তখন থেকেই ভবিষ্যতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতেন। আশির দশকের অধিকাংশ সময়টাই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে পাড় হয়ে যায়। এরপর যখন সৌদি রাজপরিবার আমেরিকাকে তাদের ভূমিতে আমন্ত্রণ জানায়; অথবা আমেরিকা নিজেই সেখানে আস্তানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, তখন উসামা বিন লাদেন অনেক ব্যথিত হন।

আফগানিস্তান থেকে তিনি রাশিয়ান কাফিরদের বিতাড়িত করার জন্য লড়াই করছেন, অথচ এখন কিনা মুসলিমদের পবিত্র ভূখণ্ডে আমেরিকান কাফিরদের দখলদারিত্বের সূচনা হবে। যদি তিনি নিজ আদর্শে সত্যিই আন্তরিক হয়ে থাকেন, তাহলে আমেরিকার বিরুদ্ধেও তাঁর যুদ্ধ করা উচিত।

বিন লাদেন সৌদি প্রশাসন, সেখানকার ধর্মীয় নেতৃত্ব ও উলামাদের পদস্খলনে যারপরনাই ব্যথিত হন। তাঁদের কারো কাছেই এটা কোনো সমস্যা মনেই হলো না যে, পাঁচ লাখের বেশি অপবিত্র আমেরিকান সেনা আরব উপদ্বীপে অবস্থান করবে। [52]

52. এই ব্যাপারটি সর্বাংশে শুদ্ধ নয়। সেসময় সৌদির অল্পসংখ্যক আলেম আমেরিকাকে জায়গা দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিরোধিতাকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নাসিরুদ্দিন আলবানি।

এই ব্যাপার উসামা বিন লাদেনের অন্তরে ও মানসিকতায় অনেক গভীরভাবে রেখাপাত করলো। তাঁর উপলব্ধি হলো, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণেই ইসলামের উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না। তিনি বিকল্প পথ খুঁজতে লাগলেন ও সৌদি আরব ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রথমে তিনি আফগানিস্তান ফিরে গেলেন এবং যুদ্ধরত বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মাঝে মীমাংসা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন, বরং একটুর জন্য প্রায় নিহতই হতে যাচ্ছিলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সুদান চলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর মনে হলো, সেখানকার প্রশাসন খুব শক্তিশালী নয়। বিন লাদেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা চাইছিলেন না, তাঁর কেবল একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি ভাবলেন, অন্তত এখানে তাঁর একটু থাকার ব্যবস্থা হবে। স্থাপত্য কাজে ভালো অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তিনি সুদানের অবকাঠামোর কাজ করতে চাইলেন। সেই সময় সৌদি প্রশাসনের সাথে তাঁর বিরোধের ব্যাপারটি প্রকাশ্য ছিল না।

সেসময় সৌদি আরবের অনেক মানুষ সুদান যেতেন এবং তাঁর সাথে পরামর্শ চাইতেন। তাদেরকে বিন লাদেন সুদানে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিতেন। তবে তিনি সুদানে তাঁর প্রচারণা ইসলামের স্বার্থে ছিল না। (অথবা গোপনে ইসলামের স্বার্থে হলেও তা প্রকাশ্যে আসেনি।)”

সাদের কথা থেকে পরিষ্কার হয় যে, উসামা বিন লাদেন একজন সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গির মুসলিম ছিলেন এবং দুনিয়ার তাবৎ মুসলিম আর তাদের স্বার্থ নিয়েই ভাবতেন। তিনি আমেরিকার বিরোধিতা পোষণ করতেন ঠিকই, কিন্তু আমেরিকা তাঁকে নিজের জন্য বড় কোনো চ্যালেঞ্জ মনে করেনি। আর যদিও তাঁর কাছে বৈষয়িক উপায়-উপকরণের কমতি ছিল না এবং ইচ্ছাও ছিল কিছু করার, কিন্তু তাঁর সামনে কোনো পরিকল্পনা বা কর্মপন্থা ছিল না। এই সময়েই তাঁর জীবনে আজ-জাওয়াহিরির আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁর চিন্তাচেতনা পুরোদমে বদলে যায়। কেননা আজ-জাওয়াহিরির কাছে সুনিপুণ পরিকল্পনা ছিল।

সাদের মতে, *সেসময় উসামা বিন লাদেনের প্রাথমিক পরিকল্পনা খুব দীর্ঘ কিছু ছিল না। সেটা কেবল এতটুকুই ছিল যে, সৌদি আরবে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিতে বোমাহামলা করা। বিন লাদেন আমেরিকান কাফিরদেরকে বলেছিলেন, তারা যেন তাঁর দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু আমেরিকা তাঁর কথা কানেও তোলেনি, কোনো জবাবও দেয়নি। আপনি যদি অতীতে যান এবং আমেরিকান বার্তাগুলো দেখেন, তো সেখানে উসামা বিন*

লাদেনের কোনো গুরুত্বই আপনার চোখে পড়বে না। ১৯৮৮ সালের মে মাস অব্দি এমনই ছিল এবং সেই মুহূর্তে আজ-জাওয়াহিরির আবির্ভাব হলো, এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর উসামা বিন লাদেনের চিন্তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেল। আজ-জাওয়াহিরি যখন আফগানিস্তান আসেন, তখন তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল আরব উপদ্বীপে আমেরিকার সাথে লড়াইয়ের কোনো ফায়দা নেই।

আজ-জাওয়াহিরি উসামা বিন লাদেনকে এভাবে বোঝান যে, আপনি আমেরিকার মানসিকতাটা বুঝুন। আমেরিকা এক 'কাউবয়' মানসিকতা রাখে (বিশ্বপরিস্থিতির সবকিছুতে পন্ডিতি করে বেড়ানোর মনোভাব)। আপনি যদি ওদের আদর্শিক ও বাস্তবিক অবস্থান থেকে চিহ্নিত করে তারপর ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাহলে ওরা এর কঠিন প্রতিউত্তর দিতে নামবে। যখন অন্য কোনো ভূমিতে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তখন আমেরিকা ওর সমস্ত উপায় উপকরণ নিয়ে কাউবয়ে পরিণত হবে। ওরা আপনাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ শত্রু বিবেচনা করে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিবে। আর এই বিষয়টি বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এমন একজন নেতার সুদীর্ঘ প্রত্যাশাকে বাস্তব করে দিবে, যিনি পশ্চিমা বিশ্বকে সত্যিকারভাবেই চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

আইমান আজ-জাওয়াহিরি উসামা বিন লাদেনকে পরামর্শ দেন যে, আপনি এই বিষয়ে বারো পৃষ্ঠার যে বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিলেন, সেটির কথা ভুলে যান। কেউই সেটা পড়ে দেখেনি। এর পরিবর্তে আপনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন যে, 'প্রতিটি আমেরিকান নাগরিক আমাদের টার্গেট'। [53] *এটি ছিল এক কৌশলগত বিবৃতি।*

---

53. এই বিবৃতির শারঈ ভিত্তি ছিল 'তাতাররুসের ফিকহ' এবং দিফায়ী জিহাদের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা আল্লামা আহমাদ শাকির رحمه الله -এর ফাতওয়া। ১৯৫৬ তে ইসরায়েলের সাথে মিলে ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চরা সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে মিশর ও সুদান হামলা করার পর বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ইমাম আল আল্লামা আহমাদ শাকের রহঃ ফাতওয়া দেন,

"বিশ্বের যে কোনো দেশের প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটি ফরজ যে, তারা ওদের (ব্রিটিশদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং ওদের হত্যা করবে - যেখানেই ওরা থাকুক না কেন - বেসামরিক কিংবা সামরিক যাই হোক।"

সূত্রঃ

قال الشيخ أحمد شاكر في كتابه كلمة الحق ص-126137-تحت عنوان

(بيان إلى الأمة المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة)

এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিন চার লাইনের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, যেখানে প্রত্যেক আমেরিকান নাগরিকের রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হয়। যদি উসামা বিন লাদেন শুধু সৌদি আরবের আমেরিকান ঘাঁটিতে আক্রমণেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইতেন, তাহলে তাঁর অবস্থাও দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার ঐসব জনগোষ্ঠীর মতো হতো, যাদের ব্যাপারে আজকে কারও কিছুই মনে নেই। মূলত আমেরিকান পরিচয়কেই চ্যালেঞ্জ করে বসা ছিল এক বড় পরিবর্তনের ফলাফল।"

১৯৯৮ সালে আফ্রিকায় আমেরিকার দুইটি দূতাবাসে হামলা আল-কায়েদার ব্যাপারে আমেরিকার উপলব্ধিকে নাড়িয়ে দেয়। এবং ওয়াশিংটন বুঝতে শুরু করে যে, আমেরিকান স্বার্থের বিরুদ্ধে হামলার জন্য এক নতুন কট্টরপন্থী দলের উত্থান হচ্ছে। ৯/১১-এর ঘটনা এই বুঝকে আরও শক্তিশালী করে। কিন্তু মিলিয়ন ডলারের ফান্ড, দীর্ঘ সময় এবং দুনিয়াব্যাপী কাউন্টার টেরোরিজম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও আল-কায়েদার ব্যাপারে আমেরিকান পলিসি মেকাররা অন্ধকারেই ছিল। ১৯৮০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত আফগান যুদ্ধকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই বুঝে আসে যে, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আল-কায়েদার নিকট বৈষয়িক শক্তির চেয়ে মানবিক শক্তির মজুদ ছিল বেশি, যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে।

এভাবেই আমেরিকান যুদ্ধযন্ত্রের মোকাবেলায় এক বিপজ্জনক সামরিক বাস্তবতার জন্ম হয়। এরপর আল-কায়েদা এমন তরুণ মুসলিমদের সন্ধানে নেমে যায়, যাদের সম্পদও আছে এবং উম্মাহর জন্য কিছু করার চিন্তাও রাখে।

কিন্তু এই চিত্র তখনও অপূর্ণাঙ্গ ছিল। এমন কিছু আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, যার আলোচনা তখনও হয়নি। সেই আন্দোলনগুলোর মাধ্যমেই মূলত আল-কায়েদার আরব্যরজনীর স্টেজ নির্মাণ হয়েছে। এবং ৯/১১-এর পরে আমেরিকার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধের সূচনা হয়েছে।

[এর পরের কয়েকটি প্যারা লেখক 'খোরাসান' অধ্যায়ে হুবহু আলোচনা করেছিলেন। আবার এখানে প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনায় আরেকবার এনেছেন।]

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ২০০১-এ শুরু হওয়া আল-কায়েদার যুদ্ধের বীজ বপন করা হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে দখলদার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক দশক ধরে চলা জিহাদের সময়েই। আফগান যোদ্ধাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানে আসা

আরবদের মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — ইয়েমেনি এবং মিশরীয়। নিজ দেশের আলেমদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্জলা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে আফগানিস্তানে আসা আরবদের বেশির ভাগই ইয়েমেনি ক্যাম্পে যোগ দিতো। যখন তারা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতো না, তাদের সময় কাটতো ব্যায়াম আর দিনভর কঠোর মিলিটারি ট্রেনিংয়ে। তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই রান্না করতো এবং এশার নামাযের পরপর ঘুমিয়ে যেত। আশির দশকের শেষ দিকে আফগান জিহাদ যখন সমাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছিল, এই মুজাহিদদের বেশিরভাগই নিজ নিজ দেশে ফিরে যায়। আবার অনেকে বিয়ে করে আফগান অথবা পাকিস্তানিদের সাথে মিলেমিশে সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আল-কায়েদার চিন্তাধারার লোকেরা শেষের এই মানুষগুলোকে বলতো দরবেশ (সহজ-সরল ধার্মিক)।

অন্যদিকে মিশরীয় ক্যাম্পে এমন বহু লোক ছিল, যাদের চিন্তা ছিল তীব্রভাবে রাজনৈতিক এবং আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুপ্রাণিত। যদিও তাদের বেশিরভাগই ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য, কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার বদলে গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের ওপর জোর দেওয়ায় সংগঠনটির ওপর তারা অখুশি ছিল। আফগান জিহাদ এই সমমনা মানুষগুলোকে একত্রিত করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার; এবং অন্য অনেকেই ছিলেন মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। এবং ছিলেন ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরির আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন 'মিশরীয় ইসলামি জিহাদ' (Egyptian Islamic Jihad)-এর সদস্য।

১৯৮১ সালে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতের হত্যাকান্ডের জন্য ডা. আজ-জাওয়াহিরির এই সংগঠনটি দায়ী ছিল। ইসরায়েলের সাথে ক্যাম্প ডেভিডে শান্তি চুক্তি করার কারণে আনওয়ার সাদাতকে হত্যা করা হয়। এই চিন্তাধারার সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো — আরব বিশ্বের সর্বনাশ ও হতাশার পেছনে মূল কারণ হলো আমেরিকা, আর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের দালাল সরকারগুলো। আফগান যুদ্ধের মিশরীয় ক্যাম্পটি ছিল ডা. আজ-জাওয়াহিরির অধীনে। এশার নামাযের পর তাদের সময় কাটতো আরব বিশ্বের সমসাময়িক নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনায়।

এই ক্যাম্পের নেতারা সবচেয়ে শক্তভাবে যে মেসেজটি প্রচার করতো, তা হলো — মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সামরিক বাহিনীগুলোকে আদর্শিকভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আফগান প্রেসিডেন্ট প্রফেসর বুরহানউদ্দিন রব্বানি যখন উসামা বিন লাদেনকে সুদান থেকে আফগানিস্তানে আসার সুযোগ দিয়েছিল, ততদিনে মিশরীয় ক্যাম্পটি বহু লোককে নিজ অধীনে নিয়ে এসেছিল। তারা বিভিন্ন মুয়াসকার (ট্রেনিং ক্যাম্প) পরিচালনা করার মাধ্যমে আসন্ন যুদ্ধের জন্য কৌশল (এবং কর্মপন্থা) শেখানো শুরু করলো। যতদিনে আফগানিস্তানে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে তালেবানের আবির্ভাব ঘটলো, ততদিনে মিশরীয় ক্যাম্প তাদের কৌশলগুলো চূড়ান্ত করে ফেলেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কৌশলগুলো ছিল :

- দুর্নীতিগ্রস্ত এবং স্বৈরাচারী মুসলিম সরকারগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণা (দাওয়াতি কার্যক্রম) চালানো, জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং সেই অত্যাচারী সরকারদলীয় লোকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদেরকে (দাওয়াতের) টার্গেট অডিয়েন্স বানানো; যাতে করে রাষ্ট্র, শাসক এবং জাতির সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা সাধারণ জনতার চোখে এই শাসকদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়।

- মুসলিমদের দুর্দশার পেছনে আমেরিকার ভূমিকার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। আমেরিকাই যে ইসরায়েলকে এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর অত্যাচারী শাসকদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে - এই সত্য সবার সামনে স্পষ্ট করে তোলা।

এই ছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদের সময়কারই অবস্থা। এবং এই সময়ই মিশরীয় ক্যাম্প সারা বিশ্ব থেকে জড়ো হওয়া বহু মুসলিম যুবকদের মননকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল।

আল-কায়েদার আবির্ভাব ঘটেছিল মূলত আরেকটি সংগঠন থেকে। সেই সংগঠনের নাম ছিল 'মাকতাব আল-খিদমাহ'। ১৯৮০-এর দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসা আরব যুবকদের জন্য একটি সার্ভিস ব্যুরো হিসেবে ড. আবদুল্লাহ ইউসুফ আযযাম একে গড়ে তুলেছিলেন। ড. আযযামকে ১৯৮৯ সালে শহীদ করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বে আসেন তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য উসামা বিন লাদেন। বিন লাদেন এই সংস্থাটিকে রূপান্তরিত করেন আল-কায়েদায়। সেই পরিবর্তন ছিল কাঠামোগত। তবে আজ-জাওয়াহিরি আর মিশরীয় ক্যাম্পের আদর্শ এবং সংগ্রামী কৌশলের ছোঁয়া ছাড়া আল-কায়েদা কখনোই আজকের মতো এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। সংগঠন হিসেবে আল-কায়েদাকে আজ বিশ্ব যেভাবে চেনে, আজ-জাওয়াহিরিই হলেন তার রূপকার।

১৯৮০-এর উসামা বিন লাদেন আর ২০০৫-এর উসামা বিন লাদেন চরিত্রের মাঝে ছিল বিস্তর ব্যাবধান। আফগান ও পাকিস্তানে আরব যোদ্ধাদের সাথে প্রায় বিশ বছর সময় অতিবাহিত করা হুজাইফা বিন আযযাম [54] ওমানে এক ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে আমাকে বলেন —

“ইয়েমেনের যোদ্ধারা ছিল খুবই সাধাসিধে ধরনের। শাহাদাত লাভ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র তামান্না। আফগানিস্তানে কমিউনিজমের পতনের পর তাঁরা দেশে ফিরে যান। পক্ষান্তরে মিশরীয়রা সেখানেই রয়ে যায়, কেননা তাঁদের গন্তব্য এখনও অনেক দূরে।

১৯৯২ সালে যখন উসামা বিন লাদেন সুদান ত্যাগ করে তাদের সাথে এসে মিশলেন, তখন তারা তাঁর চিন্তাচেতনা পরিবর্তনের কাজে মনোযোগী হলেন। ফলে উসামা বিন লাদেনের মধ্যপ্রাচ্যের আমেরিকা বিরোধিতা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির রঙ ধারণ করলো, যেখানে পশ্চিমের খৃস্টানবিশ্ব ও ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে কোনো ব্যাবধান ছিল না।

১৯৯৭ সালে যখন আমি ইসলামাবাদে উসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁর সাথে মিশরীয় ক্যাম্পের তিনজন ব্যক্তি ছিলেন। সোমালিয়ার আবু উবাইদা, মিশরের আবু হাফস ও সাইফুল আদিল। ১৯৮৫ সালে আমার বাবা (আবদুল্লাহ আযযাম) যখন তাঁকে (উসামা বিন লাদেন) আফগানিস্তানে যাওয়ার কথা বললেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, বাদশাহ ফাহাদ যদি নিজ থেকে আমাকে এর জন্য অনুমতি দেন, তবেই আমি যাবো। তখন পর্যন্ত সৌদি শাসকদের তিনি ‘উলিল আমর’ [55] মনে করতেন। ৯/১১-এর পর সৌদি শাসকদের অপরাধী সাব্যস্ত করে তিনি যে বার্তা দিয়েছিলেন, তা সম্ভব হয়েছিল সেই মিশরীয় ক্যাম্পের প্রভাবেই।”

১৯৯৮ সালে তানজিনিয়ার দারুস সালাম আর কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলার মাধ্যমে আল-কায়েদার আমেরিকান স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। ফলশ্রুতিতে আমেরিকা সাথে সাথেই খোস্ত ও কান্দাহারে আল-কায়েদার ঘাঁটিতে মিসাইল আক্রমণ করে। এর জবাবে আল-কায়েদা একটি বিশেষ সেল গঠন করে, যাদের দায়িত্ব ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করা। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে তিন বছর সময় লেগে যায়। এই ঘটনার পরও

54. ড. আবদুল্লাহ আযযামের ছেলে

55. শারঈভাবে অনুমোদিত মুসলিম শাসক, যার অনুগত্য করা ফরজ

মিশরীয় ক্যাম্পের সদস্য আর আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমেরিকাকে লাঞ্ছিত করার আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হামলার পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে।

৯/১১-এর জবাবে ২০০১-এর অক্টোবরে আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তবে এর আগেই আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ হিজরত করে সরে যায়। তখন আল-কায়েদার সামনে কয়েকটি মিশন ছিল -

- স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিটি অর্থাৎ সশস্ত্র সেনা ও গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যদের মাঝে আদর্শিক পরিবর্তন আনা।
- নতুন সদস্য রিক্রুট করা এবং নতুন নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রত্যেকটি কেন্দ্র অনুমদিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে তৈরি করা। সেই কেন্দ্রগুলোর মধ্যে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এবং অন্য কেন্দ্রগুলো গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।

আল-কায়েদার প্রকৃত যুদ্ধটা শুরু হয় ৯/১১-এর পর। আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসন শুরু হলে পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলে আল-কায়েদার হিজরত, তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। পুরোনো সেই মিশরীয় ক্যাম্প তখন পুরোদস্তুর আল-কায়েদায় রূপান্তরিত হয়ে গেল; উসামা বিন লাদেন আর আইমান আজ-জাওয়াহিরি যার নীতিনির্ধারক।

নিজেদের নতুন অবস্থান পাকিস্তানে আল-কায়েদাকে নতুন কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হলো। বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য পাকিস্তান ছিল এক উর্বর ভূমি। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত রুশ বিরোধী আফগান যুদ্ধ, এবং এর পরবর্তী প্রায় দেড় বছর তালেবানের নিরঙ্কুশ শাসন — এই ঘটনা দুটো পাকিস্তানের সমাজ ও রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার ফলশ্রুতিতেই পাকিস্তানে মাত্র এক দশকের মধ্যে তালেবানের চিন্তা ও আদর্শ লালনকারী হাজারো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই অবস্থাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে পাকিস্তান প্রশাসন নিজেদের অধিকৃত কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোকে উস্কে দেয়। তারা জাইশে মুহাম্মাদ, হরকাতুল জিহাদ, হরকাতুল মুজাহিদিন আল-ইসলামি এবং লস্করে তইয়্যেবার মতো কয়েকটি জিহাদি সংগঠনকে লালন পালন করতে শুরু করে। এদিকে আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসন এইসব

দলের সদস্যদের আমেরিকা বিরোধী মনোভাবকে তুমুলভাবে উস্কে দেয়; এবং তালেবান ও আল-কায়েদার ব্যাপারে তাদের সহমর্মিতাবোধকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

এই অবস্থায় আল-কায়েদা ইসলামপন্থীদের যোগ্যতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ক্যাম্পে বিভক্ত করে তাদের মাঝে সেই আদর্শের বীজ বপন করতে শুরু করে, যা উসামা বিন লাদেনের মাঝে আইমান আজ-জাওয়াহিরি বপন করেছিলেন। আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এটা ছিল আল-কায়েদার সর্বশেষ অস্ত্র। পরবর্তীতে আল-কায়েদার আদর্শিক চেতনা 'ইবনুল বালাদ' তথা স্থানীয় মাটির সন্তানদের মাঝে স্থানান্তরিত হয় এবং তাদেরকে আল-কায়েদা নিজেদের রক্তের ভাই বানিয়ে নেয়। ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধ এই মাটির সন্তানদেরই লড়বার ছিল। আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল এমন এক 'আজ-জাওয়াহিরি প্রজন্ম' তৈরি করা, যারা হবে আমরণ সংগ্রামে বিশ্বাসী। তাদের জীবন মরণ এই আন্দোলন ও বিপ্লবের তরেই হবে। তবে তারা মৃত্যুর পূর্বে এমন আরেকটি প্রজন্মকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে যাবে, যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে চলমান রাখবে। এটাই ছিল আল-কায়েদার অস্ত্রাগার।

পরবর্তী ধাপে আল-কায়েদা মিডিয়া উইং 'আস-সাহাব' তৈরি করে, যেটার দায়িত্ব হয় ইরাক ও আফগানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে তালেবান আর আল-কায়েদার আক্রমণগুলোর সত্যিকারের ভিডিওচিত্র নির্মাণ করা। পরবর্তীতে আস-সাহাব উসামা বিন লাদেন, আইমান আজ-জাওয়াহিরি, আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি সহ অন্যান্য দাঈদের বিভিন্ন বক্তব্য ও বিবৃতি বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে এবং পাশ্চাত্য ও তার মুসলিম নামধারী দালাল মিত্রদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার আদর্শ ও বার্তাকে অবলম্বন করে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করে। এছাড়াও আল-কায়েদার আলেমদের আরবি প্রবন্ধ-নিবন্ধ অনুবাদ করে প্রকাশ করে পুরো পাকিস্তান জুড়ে তা ছড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষদেরকে টার্গেট করা হয়; বিশেষত ইসলামি মানসিকতার বিভিন্ন পেশা ও কর্মের মানুষেরা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সেনাবাহিনী অফিসার, সাধারণ সেনা কর্মকর্তা এবং আইটি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

এই বইয়ের পূর্বের অধ্যায়সমূহে আলোচিত হয়েছে - কীভাবে গোত্রীয় যুবকরা আন্দোলিত হয়েছে এবং তালেবান যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে। তবে শৃঙ্খলাহীন, অবিন্যস্ত ও দায়সারা গোছের কিছু করা আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল না। বরং গোত্রীয় এলাকায় আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল নেক মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ মেহসুদ, হাকিমুল্লাহ মেহসুদদের

মতো কিছু স্বভাবজাত নেতা খুঁজে বের করা এবং তাদের মাঝে আল-কায়েদার আদর্শ স্থাপন করে দিয়ে ভবিষ্যত যুদ্ধের কার্যকর কর্মপন্থা শেখানো। এই নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের নিজ শিষ্য ও সমর্থক যোগাড় করবার দায়িত্ব নিজেদের ওপরই দেওয়া হয়েছিল।

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল, যদি একবার তাদের পয়গাম কাঙ্ক্ষিত মুসলিম নওজোয়ানদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে বৈষয়িক উপায় উপকরণ নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী এবং সেনা অফিসারদের মতো লাখ লাখ ডলার খরচ করে অত্যাধুনিক অস্ত্র ক্রয় করতে হবে না। কেননা এই নওজোয়ানরা তখন নিজেরাই নিজেদের অস্ত্র সংগ্রহ করে নিবে। বরং প্রয়োজনের সময় অস্ত্র চুরি করতে হলে তারা তাই করবে। মেডিকেল সাইন্সের আদর্শবাদী যুবকরা হবে অতিরিক্ত সম্পদ।

এই টার্গেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল-কায়েদা তার বার্তাগুলো প্রচার করে এসেছে এবং মুসলিম নওজোয়ানদের মাঝে বাস্তবতা তুলে ধরে তাদেরকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করেছে যে, নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে তারা যেন নিজেদের নেতৃত্বকে পশ্চিমা গন্ডি থেকে দূরে রাখে। মুসলিম প্রশাসনের বিরোধিতা করা কখনোই আল-কায়েদার মূল লক্ষ্য ছিল না। বরং লক্ষ্য শুধু এটাই ছিল যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ থেকে আমেরিকান ইজারাদারিকে দূরীভূত করা।

আল-কায়েদা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয় ২০০৭-এ, যখন তার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয় পশ্চিমা স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এই অস্ত্রধারণ ছিল খুব স্বাভাবিক, কিন্তু সেটাই যথার্থ হয়েছিল। আল-কায়েদা ২০০৩-এ পাকিস্তানি সেনাদের মাঝে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন গোত্রীয় যুবকদের দল এবং পাকিস্তান প্রশাসনের অনুগত সাবেক জিহাদি সংগঠনগুলো পাকিস্তানি প্রশাসন থেকে সরে এসে আল-কায়েদার আনুগত্য বরণ করে নিতে থাকে।

২০০২-এর শুরুতে তালেবানের সাময়িক পরাজয় এবং আল-কায়েদার পিছু হটার পর গোত্রীয় অঞ্চলে নতুন খেলা শুরু করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু ততদিনে আল-কায়েদা দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ইসলামপন্থীদেরকে স্বীয় আদর্শ ও সামরিক তৎপরতার বিষয়ে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সফল হয়েছিল। তাই এরপর থেকে আল-কায়েদা নিজ মর্জি অনুযায়ী যুদ্ধের চাল চেলে যাবার ব্যাপারে সক্ষম হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন খুররম শহীদ

২৩ ডিসেম্বর, ২০০৫। ক্যাপ্টেন খুররম শহীদ আমাকে একটি ই-মেইল করেন। তাতে লেখা ছিল —

"জনাব ডাক্তার সাহেব! [56] আসসালামু আলাইকুম। আমি বিগত কয়েক মাস যাবৎ আপনার প্রকাশিত লেখাগুলো পড়ছি এবং সর্বশেষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আপনি হাতে গোনা সেই কয়েকজন বিশ্লেষকদের একজন, যাদের পাকিস্তানি জিহাদি দলগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা আছে।

আমি আপনার 'সশস্ত্র এবং ভয়ঙ্কর তালেবানের উত্থান' নামক আর্টিকেলটি পড়েছি। এটার পর্যালোচনা করার পূর্বে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে চাই।

আমি ২০০১ সালে পাকিস্তানের স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট 'জাররার'-এর একজন কমান্ডার ছিলাম। ৯/১১ ছিল এক বিস্ময়কর আগ্নেয়গিরি, যা মানুষকে আদর্শিকভাবে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তখন আমিও মুজাহিদদের দ্বারা প্রভাবিত হই, এবং কাশ্মীর ভিত্তিক জিহাদি সংগঠন লস্করে তইয়্যেবায় যোগদান করি।

১৯৯৮-৯৯-এ গোয়েন্দা ইউনিট জাররারের একজন এনসিও কর্মকর্তা [57] যখন অবসর নিয়ে লস্করে তইয়্যেবায় যোগদান করেন, তখন এই সংগঠনের সৈনিকদের ট্রেনিং পদ্ধতি আমূল বদলে যায়। অবসরপ্রাপ্ত সেই কমান্ডার ছিলেন গেরিলা যুদ্ধে এক্সপার্ট। তাঁর হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত লস্করের ফিদায়ি ইউনিট ভারতীয় ব্যারাকসমূহে ভয়াবহ আক্রমণ শুরু করে। সেই আক্রমণগুলোর মধ্যে কালুচকের আক্রমণ ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও ভয়াবহ। যার ফলে বাজপেয়ী [58] যুদ্ধের ঢোল তবলা বাজিয়ে একদম জম্মুতে এসে অবস্থান নেয়। শামশাদ ওরফে আবু ফাহাদ আবদুল্লাহ নামক এই কমান্ডার ২০০০ সালে শাহাদাত বরণ করেন এবং তারপর সহসাই লস্করে তইয়্যেবার ট্রেনিংয়ে স্থবিরতা নেমে আসে।

আমার ভাই একজন সাবেক সেনাবাহিনী মেজর ছিলেন এবং তিনিও ৯/১১-এর পর অনেকটাই বদলে যান। সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে তিনিও লস্করে তইয়্যেবায় যুক্ত হন।

---

56. তালেবান ইংরেজি জানা লোকদের এভাবে 'ডাক্তার সাহেব' বলে সম্বোধন করে।

57. Noncomissioned Officer বা NCO - এমন সামরিক কর্মকর্তা, যিনি পদোন্নতি অর্জন করেননি।

58. অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

আমার ইউনিটের অন্য এক অফিসারও একই পথের পথিক হয়। আমিও আগে-পিছে না ভেবে সেখানে নাম লেখাই। এক বছর পর আমরা তিনজনই লস্কর নেতাদের ষড়যন্ত্রের মুখে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই। এই তথাকথিত জিহাদি নেতাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের মুনাফিকি, বিলাসীতা ও অপকর্মের ফিরিস্তি বলতে চাইলে অনেক বলা যাবে। কিন্তু এখানে এসব বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমার উদ্দেশ্য হলো আপনার লেখা উল্লেখিত আর্টিকেল।

লস্করে তইয়্যেবায় থাকাকালীন তাদের ধোঁকাবাজি, স্মাগলিং, ব্ল্যাক মার্কেটিং ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এছাড়া আল-কায়েদা, তালেবানসহ পাকিস্তানের অন্যান্য জিহাদি গ্রুপগুলোর আদর্শ ও মতভিন্নতা সম্পর্কেও আমি জানতে পারি। টেররিজম সবসময়ই আমার আগ্রহের টপিক ছিল। আমি সর্বশেষ এই সম্পর্কে পহেলা অক্টোবর, ২০০৫-এ Nation Plus ম্যাগাজিনে একটি ফিচার আর্টিকেল লিখেছিলাম। সেটা ছিল চাইনিজ জিম্মিদের মুক্তি সংক্রান্ত।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও তামিল টাইগারের যুদ্ধের ওপর গভীর পড়াশোনার আমি আমার নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ পেশ করতে চাই।

আপনি পাকিস্তানের সিনিয়র গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নাম গোপন করে তাদের বরাতে উল্লেখ করেন যে, তাদের ধারণা অনুযায়ী আল-কায়েদা সমরাস্ত্রের আদান-প্রদানের জন্য তামিল টাইগারের সাথে সম্পর্ক রাখে। আমি আপনার কথার ওপর এটা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি যে, এই জিহাদি দলগুলো সম্পর্কে পাকিস্তানের অধিকাংশ গোয়েন্দা কর্মকর্তার কোনো ধারণাই নেই। ৯/১১-এর পর তারা পাকিস্তানের জিহাদি গ্রুপগুলোর বিশ্বজয়ী ইসলামি আদর্শকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে রূপান্তরিত করে এবং কাশ্মীর স্বাধীনতাকেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে দেয়।

মুজাহিদরা কয়েক বছর যাবত আমেরিকা বিরোধী আওয়াজ উচ্চকিত করে আসছিল, কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রই হয়তো বিস্তৃতি, আদান-প্রদান ও অবস্থানের দিক দিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছিল, যা মুজাহিদদেরকে আমেরিকার স্বার্থবিরোধী আক্রমণ থেকে বাধা দিয়ে আসছিল। পাকিস্তানের জিহাদি দলগুলোর সদস্যদেরকে আফগানিস্তান গিয়ে আল-কায়েদা আর তালেবানের সাথে মিলিত হওয়ার পথে বাধা প্রদান করার মিশনে তাদের অনেক বড় ভূমিকা ছিল। তবে সরকারি কর্মকর্তারা এই ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতার

দাবিদার হলেও এতে মূল ভূমিকা পালন করেছে সেইসব জিহাদি সংগঠনের দুর্নীতিবাজ নেতারাই। এজন্য এদের কোনো দাবির ওপরই আমি ভরসা করতে পারি না। আমি মনে করি তারা যা কিছু দাবি করে, সেগুলোর ভিত্তি হয়তো ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত কোনো অভিযানের গল্প, বা অতীতের কোনো বাধ্যতামূলক কোর্সে নম্বর পাওয়ার জন্য দেওয়া কোনো প্রেজেন্টেশন।

বড় বড় ডিল নিয়ে কাজ করা গ্রুপগুলোর মাথা ছিল দুই তামিল টাইগার। এই ডিলগুলোর মধ্যে ছিল রবিযন কেমিক্যালস, ইউক্রেন থেকে বিস্ফোরক দ্রব্যের চালান, এলএমজি, রাশিয়া থেকে বন্দুকের গুলি, থাইল্যান্ড ও বার্মা থেকে সাম মিসাইলের চালান ইত্যাদি। এরা পানামা, হন্ডুরাস, লাইবেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জাহাজ চার্টার করাতো। এরা এক ইসরায়েলি অস্ত্রের ডিলারকে ঘুষ দিয়ে নিজেদের মালামাল জাফনা পর্যন্ত পৌঁছায়। এই লোকেরা জাল পাসপোর্ট ও মেমো তৈরি করে এবং বারকয়েক তৃতীয় বিশ্বের সেনাবাহিনীকে নিজেদের ক্রেতা হিসেবে দেখায়। কিন্তু এই সবই ৯/১১-এর আগের কথা, যখন আমেরিকা একাই কাউন্টার টেরোরিজমের দায়িত্বে ছিল।

২০০১-এর পর ওদের সেই সুখের দিনগুলো হাওয়া হয়ে গেল। সীমান্তের সরবরাহ লাইন আর গোপন লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। আমি জানি, এখন এই মুজাহিদদের নিজেদের জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে গিয়ে কত যে ভোগান্তি পোহাতে হয়! এক্ষেত্রে কেবল ইরাকি আল-কায়েদাই তাদের সীমান্তবর্তী কার্যক্রম আগের মতো চালিয়ে যেতে পারছিল। তালেবান পারছিল না।

আমার মতে, আফগান প্রতিরোধ যুদ্ধের সহসা এই জাগরণ এই কারণে হয়েছে যে, আল-কায়েদা ইরাকে ইরানিয়ান মাধ্যমসমূহের সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিজের পলিসি পরিবর্তন করেছিল। অন্যথায় আমরা তালেবানের আক্রমণগুলোকে যদি আলাদা আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব - তারা এখানে নতুন কোনো সমরাস্ত্রের ব্যবহার করছে না। পরিবর্তন শুধু এতটুকুই হয়েছে যে, তালেবান এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিদায়ি হামলার কৌশল ব্যবহার করছে। চিনুক ও অন্যান্য হেলিকপ্টার আরপিজি দিয়েই বিধ্বস্ত করা যায়।

ইরাক থেকে আল-কায়েদা আর তালেবানের সামরিক মিসাইল পাওয়ার সম্ভাব্য পথ ছিল ইরান। সেটাও এভাবে যে, গোয়েন্দা সংস্থাকে দলগুলোর সাথে মিলে যেতে হবে। আর এই বাস্তবতা আল-কায়েদার অনেক পরে বুঝে এসেছিল। আর তামিল টাইগার তো

নিজেই অস্ত্রের সন্ধানে ঘুরছিল। কারণ, ৯/১১-এর পর অনেক দেশেই তাদেরকে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

আল-কায়েদা আর তালেবান মানুষ মারতে পারে, প্রস্তরাঘাত করে ব্যাভিচারের শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু একটি বিষয়ে তারা খুব কঠোর। তা হলো আফিম ও গাজার চাষাবাদ ও ব্যবসা। আমি এক বছর তাদের সাথে থেকেছি এবং দেখেছি। বিজ্ঞ আরব আলেমদের শারঈ ফাতওয়ার মধ্যে মাদকের সাথে সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

যাই হোক, এই ই-মেইলের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপনাকে একথা জানানো যে, আমি আপনার লেখার একজন গুণমুগ্ধ পাঠক এবং আপনাকে আমার সিদ্ধান্ত ও নিজস্ব বিশ্লেষণ সম্পর্কে অবগত করতে চাই। আমি Great Lakes অঞ্চলে থাকি এবং চাল রপ্তানি করি। আমি জানতে পেরেছি যে, ইউরোপ, আমেরিকা ও ইসরায়েল মিলে কঙ্গোর খনিজ সম্পদ, যার মধ্যে ইউরেনিয়ামও আছে, দুই হাতে লুটপাট করছে। আপনার লেখার জন্য নিশ্চয়ই এটা একটি চমৎকার টপিক।

আমি ২০০১ থেকে ২০০২ পর্যন্ত সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেছি। আমরা একবার সেদেশের 'হিরের খনি' হিসেবে প্রসিদ্ধ তার পূর্ব প্রদেশ 'কোনো'-তে যাই এবং জানতে পারি যে, সেই এলাকাটি কঙ্গো তো দূরের কথা, পুরো বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তখন আমরা সেখানকার বিদ্রোহীদের থেকে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেই, সেখানে নির্বাচন করাই এবং সরকার প্রতিষ্ঠা করি। এবং অবশেষে হিরের খনিতে ভরা এই অঞ্চলটি যুক্তরাজ্যের হাতে চলে যায়। এই চমকপ্রদ উপাখ্যানও আপনার কলমে উঠে আসতে পারে। শুকরিয়া। আল্লাহ আপনার কলমকে আরও শক্তিশালী করুন।"

— খুররম,

ডি আর কঙ্গো

ক্যাপ্টেন খুররম শহীদ কাশ্মীরের এক সালাফি ঘরানার মানুষ ছিলেন। তাঁর নিজ মুখের কাহিনী থেকেই বুঝে আসে কীভাবে আল-কায়েদা ও ইসলামি আদর্শের দিকে পাকিস্তানের মধ্যম শ্রেণির সামরিক অফিসাররা ঝুঁকে পড়ছে এবং কীভাবে আল-কায়েদা তাদেরকে রক্তের ভাই বানিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার রণাঙ্গনে সফল সব সামরিক চাল চেলে

যাচ্ছে। খুররম শহীদ সব দিক থেকেই একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ছিলেন। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালীন জাতীয় সমস্যাদি নিয়ে নিজের রাজনৈতিক মতামত নির্দ্বিধায় ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন। এজন্যই তিনি তাঁর এসএসজি সঙ্গীদের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

২০০১-২০০২ সালে তিনি যখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্য হিসেবে সিয়েরা লিওন গমন করেন, তখন সেখানকার মুসলিমদের অধঃপতনের চিত্র তাঁকে অস্থির করে ফেলে। তারা কেবল নামেই মুসলিম ছিল, এছাড়া ইসলামি আকিদাহ ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ক্যাপ্টেন খুররম সিয়েরা লিওনে তাঁর কমান্ডার শুজা পাশার বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন।

আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার আগ্রাসনের পর তালেবানের ব্যাপারে পাকিস্তানের পলিসি আগাগোড়া বদলে যায়। যার ফলে মধ্যম পর্যায়ের সেনা অফিসারদের ভিতর-বাহির আলোকিত হয়ে ওঠে। তবে যারা এই পলিসির নীরব সমালোচক ছিল, তাদের মধ্যে থেকেই ক্যাপ্টেন খুররম ও তাঁর ভাই মেজর হারুণ কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পাকিস্তান যখন ২০০১-এর 'War on Terror'-এ আমেরিকার সঙ্গ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন সুযোগ্য সেনা অফিসার মেজর হারুণ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে নেন। সিয়েরা লিওন থেকে ফিরে এসে তাঁর ভাই খুররমও অবসর গ্রহণ করেন। এরপর উভয়েই লস্করে তইয়্যেবায় যোগদান করেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁদের উপলব্ধি হয় যে, লস্কর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি সাধারণ শাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৯/১১-এর পর আফগানের ব্যাপারে লস্করে তইয়্যেবার পলিসিতেও পরিবর্তন আসে। লস্কর নিজ সদস্যদের আল-কায়েদা আর তালেবান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়।

এদিকে মেজর হারুণ আর ক্যাপ্টেন খুররম শুধু যোগ্য সেনা অফিসারই ছিলেন না, বরং মুসলিমদের ব্যাপারেও তারা চিন্তাশীল ছিলেন। তাই লস্করে তইয়্যেবার এহেন সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

মেজর হারুণের চিন্তা ছিল সালাফি ঘরানায় সম্পৃক্ত। এই চিন্তা তাঁর গভীর অধ্যয়নের ফলে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি উলামায়ে সালাফ ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু খালদুন,

এবং মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব প্রমুখের রচনাবলি গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। আর সমকালীন আলেমদের মধ্যে তিনি সাইয়্যেদ কুতুব ও সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর পাঠক ছিলেন।

এছাড়া সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পরও তিনি সামরিক বইপুস্তক, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সামরিক বিষয়ক পড়াশোনা চালিয়ে যান।

মেজর হারুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাঁর সমালোচনা কখনও গোপন করতেন না। তিনি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর কট্টর সমালোচক ছিলেন। তাঁর পুরোনো সেনা বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রায়শই তিনি তাদের দুর্বল ইসলামি আকিদাহ বিশ্বাস নিয়ে বিদ্রূপ করতেন। তিনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে ব্রিটেনের উপনিবেশবাদী সিস্টেমের ধারাবাহিকতা মনে করতেন এবং এজন্য তিনি তাঁর সেনা বন্ধুদের সাথে ঠাট্টা করতেন। প্রায়ই এর উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলতেন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী ফকির ইপি ও হাজি সাহেব তারঘিজাঈকে গোত্রীয় বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়েছিল, যা নিয়ে ফরেন্টিয়ান ফ্রন্টিয়ার কর্পস (Frontier Corps) গর্ব করতো।

হারুণ তাঁর বন্ধুদের সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কারণ, তাঁর মতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছিল এক নিরেট পেশাদার হত্যাকারী দল। তিনি তাঁদের পরামর্শ দিতেন জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো ভালো পথ বেছে নিতে। তাঁর অনেক বন্ধু তাঁর পরামর্শে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়েও দিয়েছিল।

এই সময় হারুণের নতুন বন্ধু কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইলিয়াস কাশ্মীরি একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন, যাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বারবার ভীতি প্রদর্শন করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধমকি দিয়েছে। ফলে তিনি কাশ্মীর সংগ্রামের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিবারসহ ওয়াজিরিস্তানে চলে আসেন। মেজর আবদুর রহমানও একজন সেনাবাহিনী অফিসার ছিলেন, যিনি সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা নিয়ে মেজর হারুণের সাথে এসে মিলিত হন। সেসময় তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তান গিয়ে ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়াই করা। ক্যাপ্টেন খুররম ও মেজর আবদুর রহমান আফগানিস্তানের হেলমান্দ গিয়ে ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগদান করেন। খুররম ২০০৭-এ হেলমান্দের এক লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন। খুররমের শাহাদাত তাঁর ভাই মেজর হারুণ ও মেজর আবদুর রহমানের মনে নতুন প্রাণের স্পন্দন দেয়।

মেজর হরুণ গম্ভীর ও বিষণ্ণ মনে আফগান চলে যান এবং আপন ভাইয়ের শাহাদাতের পর তিনি তাঁর পুরো জীবনকে ন্যাটোর বিরুদ্ধে ওয়াকফ করে দেন।

২০০৬ পর্যন্ত ইলিয়াস কাশ্মীরি আল-কায়েদার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যপদে বহাল ছিলেন। তাঁর দল ৩১৩-ব্রিগেড আল-কায়েদায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দ্রুতই মেজর হারুণ তাঁর সব ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে নেন এবং ন্যাটোর বিরুদ্ধে গেরিলা অপারেশন পরিচালনার পথ তৈরির জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ঘুরতে থাকেন।

মেজর হারুণ ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে সুযোগ পেলেই তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাপুরুষতার গল্প শোনাতেন। তিনি এই কথার প্রবক্তা ছিলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কোনো বড় যুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা রাখে না। আল-কায়েদা তাঁর চিন্তার জগতে এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ভেতরে এমন এক সৈনিক-সত্ত্বা জেগে উঠেছিল, যার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। তিনি কঠিনতম শারীরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে Super Fit একজন মানবে পরিণত করেছিলেন। আল-কায়েদার সাথে তাঁর সম্পর্ক গভীর হতে লাগলো এবং তিনি আল-কায়েদার ঘরোয়া মজলিসগুলোতে নিয়মিত অংশ নিতে লাগলেন। আল-কায়েদার চিন্তা আর তাঁর সামরিক দক্ষতা — এই দুইয়ের সম্মেলনে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার রণাঙ্গনে এক প্রভাব সৃষ্টিকারী নামে পরিণত হতে লাগলেন।

মেজর হারুণ আফগান যুদ্ধক্ষেত্রকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেন। হাজার হাজার তালেবান সেনা মারা এবং মরবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাদের প্রাচীন পদ্ধতির গেরিলা অপারেশন তাদের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। ২০০৬-এ তালেবানের সফল উত্থান হয়েছিল বটে; তবে তাঁদের মৃত্যুর হার শত্রুসেনাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ২০০৬-এর বসন্তকালীন উত্থানে তালেবানের মৃতের সংখ্যা ছিল সরকারি হিসেবমতে দুই হাজারের কাছাকাছি, পক্ষান্তরে ন্যাটোর মৃতের সংখ্যা ছিল দুইশতেরও কম।

মেজর হারুণ উপলব্ধি করেন, তালেবান যদি তাদের এই পুরোনো যুদ্ধকৌশলের মাধ্যমেই লড়তে থাকে, তাহলে ২০০৮ নাগাদই ন্যাটোর বিমানহামলা আর সেনাশক্তির সামনে তালেবান একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই তাঁর মতে এখন আধুনিক গেরিলা অপারেশনের কলাকৌশল রপ্ত করা এবং আধুনিক সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা তালেবানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

মেজর হারুণ আরও উপলব্ধি করলেন, আরব যোদ্ধারা আফগান যোদ্ধাদের চেয়ে উন্নত সামরিক জ্ঞান রাখে। তবে তাদের জানাশোনাও সীমিত পরিসরের। তদের এই ক্ষমতা নেই যে, তাদের রপ্ত করা সামরিক কৌশলের মাধ্যমে তালেবানেরকে সাহায্য করবে। আবদুর রহমান ও হারুণ মিলে এই দিকটায় কাজ করা শুরু করেন। হারুণ লাইব্রেরিতে গিয়ে ভিয়েতনামের আমেরিকা বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। গভীর অধ্যয়নের পর তাঁর মনে হলো, আধুনিক সমরাস্ত্র ও উন্নত সামরিক কলাকৌশল রপ্ত করা ছাড়া আফগান যুদ্ধে তালেবানের সফলতার কোনো পথ নেই।

এরপর হারুণ উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে যান এবং আল-কায়েদার প্রবীণ কমান্ডারদের সামনে তাঁর চিন্তা ও উপলব্ধির কথা খোলাখুলি ব্যাক্ত করেন। তিনি বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধের দুটো মডেল তাঁদের সামনে উপস্থাপন করেন। এক. আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ। দুই. শ্রীলঙ্কান সরকারের বিরুদ্ধে তামিল টাইগারের গেরিলা যুদ্ধ।

তিনি মতামত ব্যাক্ত করেন যে, আফগানিস্তানের খোস্ত, পাকতিয়া ও পাকতিকা অঞ্চলে ঠিক সেই ত্রিশাখা বিশিষ্ট সামরিক কৌশল অবলম্বন করে গেরিলা অপারেশন শুরু করা যেতে পারে, যে কৌশলের মাধ্যমে জেনারেল গিয়াপ [59] ১৯৬০-এর দশকে আমেরিকাকে পরাজিত করেছিল।

এই কৌশলের বাস্তবায়ন এভাবে হবে যে, প্রথম ধাপে এই তিন অঞ্চলে যোদ্ধারা সাধারণভাবে ন্যাটোর বিরুদ্ধে ছোটোখাটো যুদ্ধ শুরু করবে। দ্বিতীয় ধাপে সিকিউরিটি চেকপোস্ট ও পদস্থ ফৌজি অফিসারদেরকে টার্গেটে পরিণত করা হবে। যোদ্ধারা একেকটা চেকপোস্ট দখল করে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে এরপর অদৃশ্য হয়ে যাবে। তৃতীয় ধাপে এই যুদ্ধ ব্যাপকভাবে শহরাঞ্চলে ও ফেডারেল রাজধানীতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

মেজর হারুণ জোর দিয়ে এইকথা বোঝাতে চাইলেন যে, জেনারেল গিয়াপের এই কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, শত্রুর ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে তাকে ভড়কে দেওয়া। তিনি নির্বাচিত যোদ্ধাদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে বিশেষ ফোর্স গড়ে তোলার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিলেন। আরব যোদ্ধারা হারুণের চিন্তায় মনোযোগী হলেন এবং

59. ভো নগুয়েন গিয়াপ ছিলেন একজন ভিয়েতনামী রাজনীতিবিদ এবং ভিয়েতনাম গণসেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে নেতা হো চি মিনের সহচর ছিলেন।

আঞ্চলিক কমান্ডার সিরাজউদ্দিন হাক্কানি ও মোল্লা নাজিরের সাথে মতবিনিময় করলেন। পরবর্তীতে মেজর হারুণের এই কৌশল গোত্রীয় অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সফলভাবে কার্যকর হয়েছিল।

মেজর হারুণ আধুনিক পদ্ধতির এমন এক বন্দুক তৈরি করলেন, যা কেবল দুনিয়ার সর্বাধুনিক হাতেই থাকতে পারে। এই বন্দুকের সাইজ এতই ছোট ছিল যে, একটি মধ্যম আকৃতির ট্রাভেল ব্যাগে খুব সহজেই তা লুকিয়ে রাখা যেত। অন্যান্য বন্দুক যেখানে লম্বা আকৃতির নলের কারণে লুকিয়ে স্থানান্তর করা দুরূহ ব্যাপার ছিল, সেখানে সেটা ছিল অতি সহজেই লুকিয়ে স্থানান্তরযোগ্য। হারুণ AK-47 এর জন্য একটি সাইলেন্সারও তৈরি করেছিলেন, যা দুনিয়ার খুব অল্প মানুষের কাছেই আছে। তাঁর আবিষ্কৃত সেই জিনিসগুলো আল-কায়েদার বিশেষ গেরিলা ফোর্সের আবশ্যক সরঞ্জামে পরিণত হলো।

এরপর মেজর হারুণ নাইট ভিশন গগলস [60] সংগ্রহ করার জন্য চীন সফর করলেন। কিন্তু পাকিস্তান কাস্টমসের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেগুলো বের করে আনা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। হারুণ তাঁর পরিচিত বন্ধু মোশাররফের পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার ক্যাপ্টেন ফারুককে ফোন করলেন, যাতে হারুণকে রিসিভ করা হয়। ক্যাপ্টেন ফারুক [61] সরকারি গাড়িতে করে এয়ারপোর্ট এলেন এবং ইমিগ্রেশন কাউন্টারে হারুণের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তার উপস্থিতিতে হারুণের জিনিসপত্রে হাত দিতে কারও সাহস হলো না। এভাবেই কোনো ঝামেলা ছাড়াই নাইট ভিশন গগলস পাকিস্তানে পৌঁছে গেল।

এদিকে নতুন অস্ত্রশস্ত্র হাতে পাওয়ার পর যোদ্ধারা বিশেষ অপারেশনের জন্য তৈরি হয়ে গেল। এই অপারেশনের জন্য নির্বাচিত সব যোদ্ধা ইতোমধ্যেই ওয়াজিরিস্তান এসে পৌঁছেছিল।

২০০৮-এর জানুয়ারি মাসে কাবুল সিরিনা হোটেলে হামলা, এপ্রিল মাসে কাবুলে ফৌজি প্যারেডে হামলা, ২০০৯-এর মে মাসে খোস্ত অঞ্চলে বোমা হামলা, একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সাদিশের আমেরিকান ঘাঁটিতে হামলা — এই হামলাগুলো ছিল সফল

60. Night Vision Goggles হলো এমন বিশেষায়িত চশমা যা দ্বারা অন্ধকারে দেখা যায়। এগুলো সাধারণত সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ নিরাপত্তা সংস্থারও থাকে না।

61. ক্যাপ্টেন ফারুক হিজবুত তাহরিরের সদস্য ছিলেন। ইন্টেলিজেন্স এই কথা যখন জানতে পারে, তখন মোশাররফের পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে তিনি নয় মাস অতিক্রম করে গেছেন। এরপর এক সংক্ষিপ্ত গ্রেপ্তারির মাধ্যমে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

গেরিলা অপারেশনের কিছু উদাহরণ। অধিকাংশ অপারেশনেই তালেবান গেরিলারা আফগান সেনাবাহিনী বা আফগান পুলিশের সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল। প্রায় প্রতিটি অপারেশনেই ভেতরের গোপন সংবাদদাতারা টার্গেটের ভিতর ও বাহিরের সব রাস্তার তথ্য দিয়ে দিয়েছিল।

মেজর হারুণ আর ইলিয়াস কাশ্মীরি — কেউই বিশেষ অপারেশনের জন্য বড় ধরনের সেনা সমাবেশ পছন্দ করতেন না। তাঁরা ৩১৩-ব্রিগেডের জন্য বেছে বেছে উন্নত ও আদর্শবাদী যুবকদের নির্বাচিত করেন। এই যুবকদের বিশেষ ধরনের গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া হতো; যার মধ্যে ছিল সাঁতার, কারাতে, টার্গেটিং, অ্যাম্বুশ, বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার, শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখা এবং শত্রুর সাথে মিশে গিয়ে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। ৩১৩-ব্রিগেডের ওপর কাশ্মীরির কঠিন নিয়ন্ত্রণ ছিল। আল-কায়েদার লস্করে যিল-এর কাজ ছিল মুজাহিদদের বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সেসময় অনেকগুলো জিহাদি দল লস্করে যিল-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মেজর হারুণ তালেবানের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক প্রশস্ততা দান করেন। তাছাড়া ভবিষ্যৎ অপারেশনগুলোর ব্যাপারেও তাঁর নিজের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ কাশ্মীরি ও অন্যান্য আল-কায়েদা নেতাদের সামনে উপস্থাপন করেন। মেজর হারুণই করাচি বন্দর থেকে আফগানিস্তান যাওয়া ন্যাটোর সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটেন। ন্যাটোর ৮০% ভাগ সরবরাহই পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে গোত্রীয় অঞ্চলের খাইবার এজেন্সি হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছাতো। আর বাকি ২০% যেত চামান কান্দাহারের পথে। হারুণ জানুয়ারি, ২০০৮-এ পাকিস্তান হয়ে যাওয়া ন্যাটোর সাপ্লাই বহরে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।

খাইবার এজেন্সি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল। আফগান যুদ্ধে ব্যবহৃত ন্যাটোর প্রায় পুরো রসদই এই খাইবার এজেন্সি অতিক্রম করে যেত। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব লস্করে যিল-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। তালেবানের উপদেষ্টা উস্তাদ ইয়াসির থাকেন এর মূল নেতৃত্বে। সাথে সহযোগিতার জন্য তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের নেতা হাকিমুল্লাহ মেহসুদকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে প্রেরণ করা হয়।

আল-কায়েদার জানা ছিল, লস্করে যিলের এই অপারেশনে খাইবার এজেন্সির স্থায়ী বাসিন্দাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। কেননা সেখানে বেরলভী ঘরানার মানুষের বসবাস

বেশি। আর তারা ছিল সাধারণত তালেবান বিরোধী। এছাড়াও দেওবন্দের সুফিবাদি ঘরানার কিছু মানুষও ছিল, তবে তারাও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও স্থানীয় নেতৃত্বের লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বহাল রাখার স্বার্থে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে চাইতো।

হারুণের প্ল্যান ছিল লস্করে যিলের অপারেশন টিম ঘাঁটি বানাবে উরাকজাঈ এজেন্সিকে; আর কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করবে দারা আদমখেলকে। ন্যাটোর সাপ্লাই লাইনে তালেবানের এই অপারেশনে স্থানীয় লোকদের নিরপেক্ষ হিসেবে থাকতে বাধ্য করাও তাঁর পরিকল্পনার অংশ ছিল। একই সঙ্গে তালেবানের যোদ্ধারা উরাকজাঈ এজেন্সি থেকে এসে নিয়ম করে ন্যাটোর সাপ্লাই লাইনে আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকবে। ২০০৯-১০ এর মধ্যে কিছু জায়গায় যোদ্ধারা স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে নিতে সক্ষম হলো।

এদিকে ন্যাটোর সাপ্লাই বহরের ওপর নিয়মতান্ত্রিক অপারেশন চলতে থাকলো। এক হামলায় স্থানীয় যুদ্ধবাজ নেতা হাজী নামদার মারা পড়লো। হাজী নামদার প্রথমদিকে ন্যাটোর সাপ্লাই লাইনে হামলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলেও পরবর্তীতে খাইবার এজেন্সিতে আল-কায়েদা আর তালেবানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করেছিল। হাজীর মৃত্যুর ফলে অন্য প্রভাবশালী নেতা মঙ্গল বেগ উচিত শিক্ষা নিল এবং নিরপেক্ষ রইলো।

তালেবানের নিয়মিত হামলাগুলো এতই ভয়াবহ ছিল যে, পাকিস্তানকে কয়েকবার সীমান্ত বন্ধ করে দিতে হলো। মেজর হারুণ এই অপারেশনের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করতে চাইলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আফগানিস্তানে আমেরিকানদের পরাজিত করতে এই হামলা অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তিনি কয়েকবার করাচি ভ্রমণ করলেন এবং ন্যাটোর সাপ্লাইয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে এই সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্যের যোগান দিতে কার্যকর টিম তৈরি করলেন। এই সময় তিনি খোঁজ নিলেন, কীভাবে ন্যাটোর সরবরাহ বিভিন্ন ঠিকাদারদের হাতে পৌঁছে। অতঃপর করাচিতে থাকা বেশ কয়েকজন ঠিকাদারকে জিম্মি করা হলো এবং বাকিদের হুমকি দেওয়া হলো — হয় এই ঠিকাদারি ছেড়ে দিবে, নয়তো ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকবে।

ন্যাটোর কমান্ডাররা এই নতুন সমস্যা নিয়ে ভয়ানক পেরেশানিতে পড়লো। তারা এর চেয়েও বেশি পেরেশান ছিল এই বিষয়ে যে, তালেবান আফগানিস্তানে অপারেশন পরিচালনাকে প্রায় সীমিত করে এনেছিল আর সাপ্লাই ধ্বংস করার কাজে নিজেদের সর্বশক্তি ব্যবহার করছিল। করাচির অধিকাংশ ঠিকাদারকে জিম্মি করা হয়েছিল এবং

বাকিরা পালিয়ে গিয়েছিল। একসময় পেশোয়ার টার্মিনালে একদিন পর পর আক্রমণ হতো। আর ন্যাটোর সাপ্লাই বহরের ওপর রকেট বর্ষণ করে তালেবান সেনারা খাইবার এজেন্সিতে অদৃশ্য হয়ে যেত। প্রায় বিশ থেকে ত্রিশটি কন্টেইনার দৈনিক জ্বালিয়ে দেওয়া হতো অথবা লুট করা হতো।

পাকিস্তানি তালেবান পাকিস্তানের মিডিয়ায় একটি ছবি প্রেরণ করে। সেখানে দেখা যায় যে, উরাকজাঈ এজেন্সিতে একজন তালেবান সেনা একটি ইউএস হামভি গাড়ি ড্রাইভ করছে। এই দৃশ্য পুরো পশ্চিমা কমিউনিটিতে হৈচৈ ফেলে দেয়। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ন্যাটোর জাহাজ হারিয়ে যাওয়া এবং তা তালেবানের নিয়ন্ত্রণে থাকার খবর পশ্চিমের জন্য আরও বেশি পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ন্যাটোর নেতৃত্ব একথা ভেবে অবাক হচ্ছিল যে, তালেবানের এমন বিস্ময়কর নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? তাৎক্ষণিক তাদের সন্দেহের তীর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দিকে গেলেও যাথার্থ প্রমাণের অভাবে তাদেরকে কিছুই বলতে পারলো না। পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স উত্তর ওয়াজিরিস্তানে থাকা সকল আরব ও আফগান কমান্ডারদের ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করলো কিন্তু এমন আধুনিক কলাকৌশলের প্রয়োগ করতে পারে, এমন কাউকে খুঁজে পেলো না। এদিকে হেলমান্দ, গজনী ও ওরদাক প্রদেশে রসদের অভাবে ন্যাটো সব ধরনের কাজের সক্ষমতা হারিয়ে ফেললো।

২০০৮-এর এপ্রিলে ন্যাটো রাশিয়ার সাথে চুক্তি করে যে, তার সাপ্লাই রাশিয়া হয়ে আফগানিস্তান যাবে। একইভাবে ইরানের সঙ্গে চুক্তি হয় যে, ন্যাটোর বেসামরিক সাপ্লাই ইরানের চাবাহার বন্দর হয়ে আফগানিস্তান পৌঁছবে। কিন্তু এই পথ দুটোর একটিও খাইবার এজেন্সির উত্তম বিকল্প ছিল না। মেজর হারুণ ন্যাটো রাশিয়ার চুক্তির পর আমাকে এ বিষয়ক একটি ই-মেইল করে, যেখানে তিনি উইকিপিডিয়ার সূত্রে তাঁর বিশ্লেষণ পেশ করেন। অন্য একটি ইমেইলে আমাকে তাঁর বিশ্লেষণের নকশাও পাঠান। তাঁর বিশ্লেষণ ছিল —

“যে স্থলবেষ্টিত দেশের পার্শ্ববর্তী সবগুলো দেশও স্থলবেষ্টিত, সেই দেশকে দ্বি-স্থলবেষ্টিত দেশ বলা হয়। এমন দেশে অবস্থিত কাউকে সমুদ্র সৈকতে যেতে হলে দুইটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। পৃথিবীতে বর্তমানে এমন মাত্র দুটো দেশ আছে। এক. মধ্য ইউরোপের লিচটেনস্টাইন। দুই. মধ্যএশিয়ার উজবেকিস্তান।

উজবেকিস্তানের সীমান্ত চারটি দেশের সঙ্গে মিলিত। দক্ষিণ পশ্চিম জুড়ে তুর্কমেনিস্তান, দক্ষিণে তাজিকিস্তান, পূর্বে কিরগিজস্তান এবং উত্তরে কাজাখস্তান এবং আরাল সাগর। জাহাজ কাস্পিয়ান সাগর থেকে ভলগা ক্যানেল হয়ে আজোভ সাগর পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে কৃষ্ণ সাগর ও অন্যান্য সমুদ্রে প্রবেশ করে। ১৮৭১-এ দুই জার্মানি একীভূত হওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনোই দ্বি-স্থলবেষ্টিত দেশের অস্তিত্ব ছিল না। উজবেকিস্তান প্রথমে রাশিয়ার অংশ ছিল এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর লিচটেনস্টাইনের সীমান্ত অস্ট্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল আর অস্ট্রিয়ার ছিল এড্রিয়াটিক সমুদ্র-বন্দর।

ডাক্তার সাহেব! আপনি যদি ন্যাটোর সাপ্লাই লাইন হিসেবে রাশিয়ার এই রোডটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তাহলে বিষয়টা আপনার কাছে নিরেট ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।”

মেজর হারুণের বিশ্লেষণ সঠিক ছিল। ন্যাটো মধ্যএশিয়ার পথে আফগানিস্তানে রসদ সরবরাহের চেষ্টায় কমতি করেনি, কিন্তু এই পথে শতকরা ৫-১০% এর বেশি সরবরাহ স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। কেননা দ্বি-স্থলবেষ্টিত দেশ দিয়ে রসদ সরবরাহ করতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অনেক বেশি অর্থ ব্যয় হয়ে যায়।

মেজর হারুণের উত্থান-পতন

মেজর হারুণ গর্বিত ছিলেন। তিনি একজন জেনারেলের ভূমিকায় যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। তাঁর জন্য এটা এমন এক সম্মাননা ছিল, হয়তো সেনাবাহিনীতে কখনো তিনি এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতেন না। তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে একটি নন কাস্টম জিপ একদম সস্তায়, মাত্র সোয়া লাখ রুপি দিয়ে ক্রয় করেন। তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে করাচি যেতে এটা ব্যবহার করতেন। পথে রাত নেমে গেলে কোনো এক সেনাবাহিনী কোয়ার্টারের রেস্টহাউজে থেকে যেতেন। প্রাক্তন সেনাবাহিনী অফিসার হিসেবে এই সুযোগ তাঁর ছিল। তবে সবসময় তাঁর সেনাবাহিনী রিভলবার ও ম্যাগাজিন ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র সাথেই রাখতেন, যেন প্রয়োজনে সদ্ব্যবহার করা যায়। তবে স্বভাবজাত প্রভাব ও গাম্ভীর্য এবং পরিষ্কার উর্দু ইংরেজি মিশ্রিত ফৌজি রীতির কথাবার্তার কারণে তাঁকে কোথাও কোনো ধরনের সমস্যায় পড়তে হতো না। নিজের পরিচয় সফলতার সাথে গোপন করার পাশাপাশি তিনি নিজস্ব নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করতে এবং এর মাধ্যমে আল-কায়েদার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেক সাক্ষাতেই তিনি নতুন নতুন সঙ্গী জুটিয়ে ফেলতেন। যাদের মধ্যে কিছু ছিল লস্করে তইয়্যেবার, কিছু অন্যান্য জিহাদি সংগঠনের আর অধিকাংশই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে এর ভেতরে তিনি এক প্রভাবশালী ইন্টেলিজেন্স তৈরি করতে সক্ষম হন। ২০০৭-এ তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার 'War on Terror'-এ আমেরিকা এক নতুন কৌশল গ্রহণ করছে। সেটা হলো, তারা অনেক ভেবেচিন্তে এই ফলাফল বের করেছে যে, এখানে সমস্যার গোড়া হচ্ছে খোদ পাকিস্তান। তাই আমেরিকা তার জঙ্গিবাদ বিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব চাইছে না। বরং তারা চাইছে নিজেদের লোক পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করাতে।

২০০৮-এ গোত্রীয় অঞ্চলে ড্রোন হামলার জন্য আমেরিকা পাকিস্তানে ঘাঁটি তৈরি করে। এই বছরেই আমেরিকা ইসলামাবাদ থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে তারবিলায় জমি ক্রয় করে এবং ইসলামাবাদস্থ আমেরিকান এম্বেসি প্রশস্ত করার জন্য দশ মিলিয়ন ডলারের বাজেট পাশ করে।

আমেরিকার যুদ্ধবিষয়ক ঠিকাদার ২০০৭-এ পাকিস্তানে আসেন। তিনি এসেই এফসি কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটি গ্রুপ তৈরি করেন এবং তাদেরকে বিদ্রোহ দমনকারী ফোর্সের মতো করে বিশেষ ট্রেনিং দেন। তার নেতৃত্বে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI সদস্যদের মধ্যে যারা আমেরিকা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাদের নিয়ে একটি কাউন্টার টেররিজম ইউনিট গঠন করা হয়। তাদেরকে কিছুদিন পরপরই আমেরিকা যেতে হতো এবং আমেরিকান প্রশাসন জঙ্গিবাদ বিরোধী যুদ্ধে তাদের মনোবল ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতো। আমেরিকান প্রশাসন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতিটি স্তরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করতে শুরু করলো, যেন অতিসত্বর আল-কায়েদার বিরুদ্ধে এক মীমাংসিত যুদ্ধের সূচনা করা যায়।

এই ব্যাপারে সমস্ত খবরই মেজর হারুণের কাছে পৌঁছেছিল। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভেতর অস্থিতিশীলতা তৈরি করার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর একটিই উদ্দেশ্য ছিল - পাকিস্তান যেন আমেরিকার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। সেনা অফিসারদের মধ্যে শঙ্কা তৈরি করার একটা পন্থাই তাঁর জানা ছিল, সেটা হলো তাদেরকে আতঙ্কিত করে দেওয়ার মতো অপারেশন। তিনি কাউন্টার টেরোরিজমের সাথে যুক্ত সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের একটি লিস্ট তৈরি করলেন এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার পথ খুঁজতে লাগলেন। এমন শাস্তি, যা দেখে অন্যরা শিক্ষা নিবে এবং আমেরিকান সারি থেকে সরে আসবে। তাঁর লিস্টে সর্বপ্রথম উঠে আসলো মেজর জেনারেল ফয়সাল আলাভীর নাম।

মেজর জেনারেল ফয়সাল আলাভী ২০০৩-এর ২রা অক্টোবর আঙ্গোরাড্ডায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এসেএসজি কমান্ডো অপারেশনের কমান্ডিং করেছিলেন। সেই অপারেশনে ২৫০০ কমান্ডো অংশ নিয়েছিল এবং বারোটি গানশিপ হেলিকপ্টার আকাশ থেকে তাদের সাপোর্ট দিচ্ছিল। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কিছু হেলিকপ্টার সীমান্তের ওপারের আমেরিকান সেনাঘাঁটি মিচদাদের দিক থেকে এসে যোগ হয়েছিল। সেই অপারেশনে আল-কায়েদা তালেবান যোদ্ধাদের বড় অংশই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তবে আল-কায়েদার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা শহীদ হয়েছিল, যাদের মধ্যে আবদুর রহমানও ছিলেন। এছাড়া অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, যাদেরকে পরবর্তীতে ‘গুয়েন্তানামো বে’-তে প্রেরণ করা হয়। সেই অপারেশন আল-কায়েদাকে বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। কেননা, তখনও পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর আল-কায়েদার মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা তৈরি হয়নি।

বৃটেনে জন্ম নেওয়া জেনারেল ফয়সাল আলাভীর সেসময়ের অবস্থান খুঁজে বের করা খুব কঠিন কোনো কাজ ছিল না। প্রেসিডেন্ট মোশাররফের সাথে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে জোরপূর্বক তাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। অবসরের পর তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানি ‘এইডটোন টেলিভিশন কমিউনিকেশন লিমিটেড’-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০০৮-এর ১৯ নভেম্বর তিনি যখন তার অফিসে যাচ্ছিলেন, মেজর হারুণ তাকে অনুসরণ করতে শুরু করেন। তার প্ল্যান ছিল - সিডব্লিউভি কলোনীর স্পিড ব্রেকারে যখন তার গাড়ির গতি শ্লথ হবে, তখন সেখানে আগে থেকে দাঁড় করিয়ে রাখা দুজন লোক এসে জেনারেলের গাড়িকে আটকে দেবে। সবকিছুই প্ল্যানমাফিক হয়েছিল, আর মেজর হারুণ তাঁর সেনাবাহিনীর রিভলবার দিয়ে জেনারেল আলাভীর মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করেছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সেনাবাহিনীর ছোট থেকে বড় সবার মধ্যে চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। ইন্টেলিজেন্সের কাছে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, প্রাক্তন ও বর্তমান উভয় শ্রেণির সেনা অফিসাররাই এখন টার্গেট। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স কিছু না বলে চুপচাপ থাকলো। মেজর হারুণ আলাভীকে হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত ছিলেন না, একই জাতীয় অন্যান্য টার্গেটের প্রতিও তাঁর সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি লেপ্টে ছিল। এই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা শুধু প্রতিশোধের উদ্দেশ্যেই ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্যদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, একদিন অবসর গ্রহণ করে তারাও একই পরিণতির শিকার হতে পারে। এভাবেই ফয়সাল আলাভীর সাধারণ হত্যায় হারুণের আরও বড় ভাবনা ছিল।

মেজর হারুণের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি খুব দ্রুতই জিহাদি মানসিকতার সেনা কর্মকর্তাদের চিনে নিতে পারতো। তিনি তাদের চিন্তার গতিধারাকে বদলে দিতে পারতেন, যেন আমেরিকার বিরুদ্ধে এক নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের সূচনা করা যায়।

মেজর হারুণের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ২০০৭-এ, তাঁর বাসস্থান লাহোরে। আচার সুরোতে তিনি পুরোদস্তুর একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল লম্বা দাড়ি। পাঞ্জাবি পায়জামার সাথে মাথায় টুপিও পড়তেন। পরবর্তীতে যখন তাঁর সাথে আবার দেখা হয়, তখন তিনি একদম ভিন্ন রূপ। ক্লিন শেভড। ওজনও আগের চেয়ে কমিয়ে নিয়েছিলেন। পশ্চিমা পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য একবার আওয়ারী হোটেলে এলেন এবং আমার রুমে নামাজ আদায় করলেন। রুমের দেওয়ালে একটি ছবি ছিল, তিনি তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। কারণ ইসলামে ঘরে ছবি রাখা নিষেধ আছে।

মেজর হারুণ পাকিস্তানে চলমান সব ঘটনার দিকে সূক্ষ্ম নজর রাখতেন। সেনাবাহিনীতে থাকা তাঁর পুরোনো বন্ধুদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল (তারা বাদে, যারা ওয়ার অন টেরোরের সঙ্গে যুক্ত ছিল)। তাঁর সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন মেজর জেনারেলও ছিলেন, যিনি পেশোয়ারে একটি গ্যারিসনের কমান্ডার ছিলেন। সেই জেনারেল একবার তাঁর ভাই খুররমের শাহাদাতের শোকানুষ্ঠান করতে চাইছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে কোনো সাড়া দেননি। কেননা সেসময় তিনি তাঁর সেনা সহকর্মীদের মাঝে জিহাদি চেতনা, ক্রমবর্ধমান আমেরিকান প্রভাব ইত্যাদির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। একজন দক্ষ অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এবং একজন বিজ্ঞ পাঠক হওয়ার কারণে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপ, এর দোষ-গুণ এবং রাজনৈতিক পলিসিগুলো খুব ভালো করেই জানতেন। তিনি রাজনৈতিক পলিসিগুলোর মোকাবেলা করার জন্য বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নের চিন্তা করছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন, আমেরিকা যদি এভাবে নিজ উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে, তাহলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমেরিকার কাছে রীতিমত চিরকালের জন্য সিজদাবনত হয়ে যাবে।

আমেরিকা আফগানিস্তান আগ্রাসনের পূর্বেই ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কূটকৌশল অবলম্বনের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল। হারুণ জানতেন, আমেরিকা দূর থেকেই ভারত পাকিস্তানের শত্রুতা থেকে ফায়দা হাসিল করে পাকিস্তানকে জঙ্গিবাদ বিরোধী যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করছে। তাঁর মতে, এই অনুপ্রেরণা ও হুমকি ধমকি আমেরিকার এমন এক খেল ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে জঙ্গিবাদ বিরোধী এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে ফাঁসিয়ে দেওয়া। ২০০৭-এ মেজর হারুণ তাঁর আমির ইলিয়াস কাশ্মীরির সঙ্গে মিলে কাউন্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। এই কৌশলের মূল টার্গেট ছিল যুদ্ধকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

প্রথমদিকে মেজর হারুণ ভারতের বিরুদ্ধে ৯/১১-এর আদলে একটি হামলা করতে চাইছিলেন, যার ফলে ভারত সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিবে। হারুণের অনুমান ছিল, যদি এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে পাকিস্তান অবশ্যই 'War on Terror'-এর জন্য তার রিজার্ভ সৈন্যদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তিনি এই অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর শহীদ ভাই খুররমের বন্ধু ক্যাপ্টেন আবদুর রহমানের হাতে অর্পণ করলেন। ভারতের ব্যাপারে আবদুর রহমান এক ভ্রাম্যমাণ ডিকশনারি ছিলেন। হারুণ ভারত অপারেশনের জন্য একটি বিশেষ সেল গঠন করলেন এবং যতদূর সম্ভব এর পরিধি বিস্তৃত করতে চাইলেন।

হারুণ লস্করে তইয়্যেবা ছেড়ে এসেছিলেন বটে; তবে এর কমান্ডারদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তিনি লস্করের শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলোর ব্যাপারে খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন। লস্করের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক ও সেনাবাহিনীর অস্ত্রাদি ব্যবহারের সুযোগ। আর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দলটির প্রধান ত্রুটি।

হারুণ এইসব ব্যাপারে লস্করে তইয়্যেবার নেতাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতেন। হারুণের ব্যাপারে লস্করের নেতাদের পূর্ণ ভরসা ছিল, কেননা তিনিও তাদের মতো সালাফি ঘরানার এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার ছিলেন। হারুণ নিয়মিত তাঁর সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে লস্করে তইয়্যেবার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জেনে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। তিনি জানলেন, ISI ২০০৭-এর শেষদিকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে একটি নতুন অপারেশন পরিচালনার পরিকল্পনা করেছে, যেখানে লস্করে তইয়্যেবাকে ব্যবহার করা হবে। অপারেশনের ফান্ডিং ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং অনুমোদনও চলে এসেছিল। এটা এক সাদামাটা অপারেশন হওয়ার কথা ছিল।

ওদিকে 'লাইন অব কন্ট্রোল'-এ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দেওয়াতে সেদিকটা দিয়ে যোদ্ধাদের ভারতে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই লস্কর তার যোদ্ধাদের ভারতে প্রবেশ করাতে 'মরুসৈকত' ব্যবহার করতো এবং সেখান থেকে যোদ্ধারা কাশ্মীর পৌঁছাতো।

হারুণ লস্করে তইয়্যেবার কমান্ডার আবু হামযার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বোঝান যে, ভারতে এই জাতীয় অনর্থক অপারেশন পরিচালনা করে সময়, শ্রম ও যুদ্ধোপকরণ নষ্ট করে কোনো ফায়দা নেই। এরপর হারুণ ভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন। আবদুর রহমান কয়েকবার ভারত ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটসমূহের ছবি ও নকশা বিদ্যমান ছিল। তিনি মুম্বাইয়ের সেই জায়গাটা নির্বাচন করেন, যেখানে বিদেশি শেতাঙ্গদের বসবাস ছিল। অর্থাৎ নরম্যান হাউস ও হোটেল তাজমহল।

হারুণ আবু হামযাকে বলেন যে, যোদ্ধারা পাকিস্তানি নৌকায় চড়ে সফর শুরু করবে এবং মাঝপথে একটি ভারতীয় ট্রলার ছিনিয়ে নিয়ে তাতে করে সৈকতে পৌঁছবে। তিনি আবু হামযাকে বোঝান যে, যদি তারা ভারতের ওপর কোনো শক্তিশালী আক্রমণ করতে পারে, তাহলে ভারত আলোচনার টেবিলে বসে কাশ্মীর বিষয়ে ভালো কোনো সমাধানে

পৌঁছাতে বাধ্য হবে। আবু হামযা হারুণের পরিকল্পনার কথা পুরোটা লস্করে তইয়্যেবার কমান্ডার ইন চীফ জাকিউর রহমান লখভীকে অবগত করেন, যিনি অপারেশনের প্রস্তুতির জন্য ইতোমধ্যেই করাচি রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। লখভী এই পরিকল্পনা শুনে এর প্রস্তুতির জন্য দীর্ঘ দুই মাস সময় ব্যয় করেন। তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে এই মিশনের জন্য যোদ্ধা নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে উপযোগী ট্রেনিং দিলেন। যখন নির্বাচিত যোদ্ধারা হারুণের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত করলেন, তখনই মিশন শুরু করে দেওয়া হলো। হারুণ সেই সময়টায় আবু হামযার সঙ্গে বার্তা আদানপ্রদানের জন্য একটি পরোক্ষ নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন এবং সীমান্তের ওপারে গমনকারীদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে থাকলেন, যা পাকিস্তানের বাহির থেকে তাদের কাছে পৌঁছেছিল।

মুম্বাই হামলা সারা পৃথিবীকে বাকরুদ্ধ করে দিল। এই ঘটনা আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসেবে ভারতের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল। অপারেশন পরিচালনাকারীদের মধ্যে একজন জীবিত গ্রেপ্তার হলো। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে সব বলে দিল যে - কীভাবে, কখন, কোথায় তার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। দেখা গেল, সমস্ত ঘটনার মূলেই রয়েছে পাকিস্তান। ফলে ভারত তখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। তাতে ছিল — মুজাফফরাবাদে লস্করে তইয়্যেবার ক্যাম্পসমূহে, মুরিদকে তে লস্করের হেডকোয়ার্টারে, এবং লাহোরে তাদের ঘাঁটিসমূহে বিমান হামলা। এটাই চতুর্থ পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা ছিল।

২০০৮ সালের মুম্বাই হামলায় আল-কায়েদার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে যুদ্ধের দানা ছড়িয়ে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে মুজাহিদদের এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যকার সবধরনের শত্রুতা দূর হয়ে যায়। পাকিস্তানি মুজাহিদদের প্রধান মোল্লা ফজলুলাহ এবং বাইতুল্লাহ মেহসুদ ঘোষণা দিলেন যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার লড়াইয়ে তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ হয়ে লড়বে। এদিক দিয়ে আইএসাই-ISI-এর ডিরেক্টর জেনারেল আহমাদ খোযা পাশা সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে এক ব্রিফিং দেন। সেখানে তিনি মোল্লা ফজলুল্লাহ এবং বাইতুল্লাহ মেহসুদকে পাকিস্তানের স্ট্র্যাটেজিক প্রোপার্টি বলে স্বীকৃতি দেন। এভাবে পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষের সব পালা চুকিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই সময়ে ওয়াশিংটন এসে অনুপ্রবেশ করে। ওয়াশিংটন ভারতকে পরিপূর্ণ আশ্বাস দেয় যে, মুম্বাই হামলার তদন্তে পাকিস্তান ভারতকে সাহায্য করবে ও এর পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার করবে।

নিজেদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে দেখে হারুণ ৩১৩-বিগ্রেডের মাধ্যমে প্ল্যান বাস্তবায়ন করার জন্য আবদুর রহমানকে নির্দেশ দেয়। পাকিস্তানের ওপর আমেরিকার শক্ত প্রভাবের কারণে লস্করে তইয়্যেবার নেটওয়ার্ক নজরদারিতে অবরুদ্ধ ছিল। ফলে তাদের তেমন গুরুত্ব ছিল না। আবদুর রহমান অনেকবার ভারত সফর করে সেখানকার স্পর্শকাতর স্পটগুলোর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ছবি সংগ্রহ করলেন। এর মধ্যে মুম্বাই হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়া নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারের এর তথ্যও ছিল। আবদুর রহমান ভারতীয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ভারতীয় পার্লামেন্ট ও দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোর ছবিও সংগ্রহ করলেন। তিনি প্রতিনিয়তই ভারতের বিভিন্ন স্থানে হামলার কয়েকটি প্ল্যান সাজাতেন। সবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যদি মুজাহিদরা ভারতীয় ডিফেন্স কলেজকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পার্লামেন্টে হামলা করবে।

২০০৯ সালের জুলাই মাসে ৩১৩-বিগ্রেডের একজন যোদ্ধা যাহিদ ইকবালকে ISI ইসলামাবাদ থেকে আটক করে। আর ইকবালের দেওয়া তথ্য মোতাবেক তারা আবদুর রহমানকেও গ্রেপ্তার করে ফেলে। কিন্তু আবদুর রহমান পাকিস্তানের ভেতরে কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এজন্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুক্তির পর আবদুর রহমান ৩১৩-বিগ্রেডের মাধ্যমে ভারতে হামলা বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় কাজ শুরু করলো। কিন্তু এরই মাঝে ISI সবকিছু জেনে ফেলে এবং আবদুর রহমান ও তাঁর পুরো টিমকে আটক করে।

ওদিকে ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে FBI শিকাগোতে একটি চক্রান্তের দ্বার উন্মোচন করে। দুই সন্দেহভাজন ডেভিড হেডলি (আমেরিকান প্রবাসী পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত দাউদ সাঈদ) ও তাহাভভুর রানা গ্রেপ্তার হয়। তাদের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে FBI জানতে পারে যে, তারা ভারতীয় ডিফেন্স কলেজ এবং ভারতের নিউক্লিয়ার প্রোপার্টিতে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশকারী ড্যানিশ পত্রিকাও তাদের হিটলিস্টে ছিল। কাশ্মীরি মুজাহিদ গ্রুপের সাথে তাদের উভয়েরই সম্পর্ক ছিল। তাদের জবানবন্দিতে মেজর হারুণ এবং তাঁর সাথী আবদুর রহমানের সব প্ল্যান ফাঁস হয়ে যায়। ডেভিড হেডলির সম্পর্ক ছিল আবদুর রহমান ও মেজর হারুণের সাথে।

আমি ২০০৯-এর ৯ই অক্টোবরে যখন ইলিয়াস কাশ্মীরির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তখন তিনি মুম্বাই হামলার মাধ্যমে ভারতকে নাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন।

গ্রেপ্তার অভিযান

আবদুর রহমান আটক হওয়ার পূর্বে মেজর হারুণ নিজ বাহিনী এবং লস্করে তইয়্যেবার বন্ধুদের কাছে যান। তিনি তাদেরকে আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। তাদেরকে সীমান্তবর্তী গোত্রীয় এলাকাগুলোতে নিয়ে যান এবং আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই ৩১৩-বিগ্রেড নিজেদের দক্ষতা ও পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্রের কারণে জিহাদি দলগুলোর মাঝে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে আসে।

এরপর নতুন নতুন মিশন সামনে আসতে থাকে, আর তাদের সরঞ্জামাদির সংকট দেখা দেয়। যুদ্ধে তারা অর্থ সংকটে পড়ে যায়। মেজর হারুণ এমন অবস্থার সম্মুখীন হন যে, হোটেল ভাড়া তো দূরের কথা, তাঁর কাছে গাড়িতে পেট্রোল ভরবার মতো অর্থও ছিল না। কাফেলার যাত্রা চলমান রাখার স্বার্থে তিনি নিজের 'করোলা' গাড়িটি বিক্রি করে দেন এবং একদম নিম্নবিত্ত জীবন-যাপনে শুরু করেন। আদমখেল উপত্যাকায় এসে তিনি নিজের AK-47 সাইলেন্সার বিক্রি করে দেন। তবুও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ হয়ে উঠেনি।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাশ্মীরি ও মেজর হারুণ এক নতুন পরিকল্পনা সাজান। আর তা ছিল যোদ্ধাদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য অপহরণ করা। তবে তাঁরা কেবল অমুসলিমদেরই অপহরণ করতেন। মেজর হারুণ করাচি গিয়ে পুরোনো ফৌজী বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত মেজর আবদুল বাসেতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। হারুণ তার কাছে কেবল প্রসিদ্ধ ফিল্ম প্রডিউসার সতীশ আনান্দ-এর ব্যাপারে তথ্য সাহায্য চান। সতীশ আনান্দ ছিলেন একজন হিন্দু, ভারতীয় প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী জুহি চাওলার আংকেল ও প্রসিদ্ধ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার জাগদীশ আনান্দের ছেলে। মেজর আবদুল বাসেত থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হারুণ করাচি যান এবং অর্থকড়ি আদায় করতে সতীশ আনান্দ কে অপহরণ করেন।

হারুণের ধারণা ছিল যে, সতীশ আনান্দের পরিবার ভালো সম্পদশালী। ফলে তিনি সতীশকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে নিয়ে যান। কিন্তু পরবর্তীতে হারুণ বুঝতে পারেন যে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। সতীশের কাছে তেমন নগদ অর্থসম্পদ ছিল না। যদিও তার স্থাবর সম্পত্তি ছিল, কিন্তু হারুণের নিকট বন্দি থাকার কারণে সেগুলো বিক্রি করে দেওয়াও সম্ভাবপর হচ্ছিল না। সতীশকে বলা হলো, সে যেন পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ

যোগাড় করে। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। এরপর অপহরণকারীরা সতীশকে প্রস্তাব করে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কারণ তারা মুসলিম হত্যা করে না। সতীশ ইসলাম গ্রহণ করলো এবং যোদ্ধাদের নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানানোর প্রতিশ্রুতি দিল। একটি বিষয় এখনও রহস্য হয়ে আছে যে, সতীশের মুক্তির জন্য আসলেই কোনো পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল কিনা?! তবে এটা সত্য যে, সতীশ নিরাপদেই করাচিতে ফিরে আসেন। এবং অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি তাদের পরিচয়ের ব্যাপারেও মুখ খুলেননি।

পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সারোয়ার খান নামের এক কাদিয়ানিকে অপহরণ করার সময় ইসলামাবাদ থেকে মেজর হারুণ গ্রেপ্তার হন। আটকের পর তাঁর বিরুদ্ধে ফয়সাল আলাভীকে হত্যার মতো বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়।

হারুণ ও তাঁর ভাই খুররম একসময় সেনাবাহিনীর দিক-নির্দেশনায় কাজ করেছিল। আমার বিশ্বাস, পাকিস্তানি বাহিনীর নেতৃত্ব যারা কিনা মেজর হারুণের পেশাদার দক্ষতার ব্যাপারে অবগত ছিল, তারা নিশ্চিত হারুণের শূণ্যতা অনুভব করবে, যেমনিভাবে আল-কায়েদা উসামা বিন লাদেনকে খুব করে স্মরণ করে।

এই উপাখ্যান সেইসব ইসলামপন্থীর, যারা স্রোতের বিপরীতে এক অনন্য পথ বেছে নিয়েছেন এবং একটি আদর্শিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। একটি নীরব যুদ্ধের পর যেই মুসলিম শাসকরা নতুন বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য আমেরিকার মিত্র শক্তি হওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এমন ইসলামপন্থীরা সেই শাসকদেরকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

মেজর হারুণকে গ্রেপ্তারের এক সপ্তাহ পর ২০০৯-এর ১৩ই মার্চ তারিখে লাহোরে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট টিম ম্যাচ খেলার জন্য স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে তাদের ওপর দশজন বন্দুকধারী আক্রমণ করে। হামলার ধরন থেকে বোঝা যায়, ক্রিকেটারদেরকে হত্যা করা আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, ক্রিকেট দলের নিরাপত্তায় আসা পুলিশের গাড়িতেই গুলি করা হয়। যখন পুলিশ পালিয়ে যায়, তখন বন্দুকধারীরা ক্রিকেটারদেরকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ড্রাইভারের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সে ক্রিকেটারদের বাসকে খুব বিচক্ষণতার সাথে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ব্যর্থ

হাইজ্যাক মিশনে ৬ জন গার্ড পুলিশ নিহত হয়। আর আহত হয় ৭ জন ক্রিকেটার ও দলীয় এসিস্ট্যান্ট কোচ। হামলাকারীরা হামলার স্থানেই রকেট লঞ্চার ও গ্রেনেড ফেলে চলে যায়।

সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভয়ঙ্কর মুম্বাই হামলার সাথে এর মিল পাওয়া যায়। ISI-এর দাবি ছিল, উক্ত হামলা মেজর হারুণের প্রশিক্ষিত যোদ্ধারাই করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, ক্রিকেটারদের জিম্মি করে তাদের আটককৃত নেতা মেজর হারুণের সাথে বন্দি বিনিময় করা।

মেজর হারুণের আদর্শিক যাত্রা

পশ্চিমের স্ট্র্যাটেজিস্টরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে, যেরকম ধ্বংসপ্রায় অবস্থানে তালেবান যোদ্ধারা দিন গুজার করছিল, সেখান থেকে কীভাবে তারা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্বের চেয়েও শক্তিশালী অবস্থানে চলে এল? আর কীভাবেই বা এতটা কৌশলী গেরিলা কার্যক্রম শিখে ফেললো? বিশেষজ্ঞরা হতবাক হয়েছিল যে, ২০০5 সাল পর্যন্ত যেই গেরিলা দক্ষতার অস্তিত্বই ছিল না, হঠাৎ করে কোত্থেকে সেই শক্তির উত্থান ঘটলো! আসলে এই পরিবর্তনের পেছনে যে কোনো দক্ষ যোদ্ধার হাত থাকতে পারে, ন্যাটো সেটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। মেজর হারুণই ছিলেন সেই দক্ষ যোদ্ধা। তিনি পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গোত্রীয় এলাকাসমূহে এবং করাচির মাঝে গোপনে বিচরণ করে বেড়াতেন। সামরিক কার্যক্রম এবং কর্মপদ্ধতির বিষয়ে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে হারুণের মর্যাদা ও সম্মান ছিল শহীদ আবু হাফসের মতোই।

করাচি সী-ভিউ তে আমার (লেখকের) বাসস্থানের নিকটে আরব উপসাগরের সী-বীচে মেজর হারুণের সাথে হাঁটতে গিয়ে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ গতিবেগকে আফগানিস্তান থেকে ভারতে টেনে এনেছিলেন। ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরির মতো মেজর হারুণের পুরো জীবনটাও ছিল একটি আন্দোলন। তাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে একটিই চিন্তা ছিল - কীভাবে ন্যাটোকে পরাস্ত করা যায়। করাচির ক্লিফটন সী-বীচে চলার সময় তিনি একটু সময়ের জন্যও সাগরের স্রোতরাশি কিংবা মৃদু হাওয়ায় মগ্ন হতেন না। আমি কখনোই তাঁকে এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখিনি। বরং তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো অয়েল টার্মিনালে (তেলের ডিপো)।

করাচির বন্দর থেকে আফগানিস্তানে ন্যাটোর রসদ পৌঁছাকে বাধাগ্রস্ত করার চিন্তায় তিনি মগ্ন ছিলেন। যখন আমি করাচিতে বসবাস করতাম, তখন প্রত্যেক সাক্ষাতেই মেজর হারুণ আমার সাথে তাঁর চিন্তাগুলো শেয়ার করতেন।

তিনি বলেছিলেন, *“ডাক্তার সাহেব! খোরাসানের বিজয় অতি সন্নিকটে। যদি মুজাহিদরা ২০০৮ সালের ভিতর ন্যাটোর সাপ্লাই লাইন কেটে দিতে সফল হয়, তাহলে ২০০৯ সালের ভিতরেই ন্যাটো ফুতুর হতে বাধ্য হবে। আর যদি সাপ্লাই লাইন ২০১০ সালে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে ২০১১ সালেই ন্যাটো আফগান ছেড়ে পালাবে।*

চলমান এই যুদ্ধে উল্লেখিত কর্মপদ্ধতি মৌলিক গুরুত্ব রাখে। মধ্যএশিয়া দিয়ে বিকল্প যে সাপ্লাই লাইনের কথা ন্যাটো বলছে, সেটা উপহাস ছাড়া কিছুই না। বিকল্প এই রাস্তা এতোই দীর্ঘ ও জটিল যে, পুরো ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ধ্বসে পড়বে।

দ্বিতীয় একমাত্র বিকল্প সাপ্লাই লাইন হতে পারে ইরান দিয়ে। কিন্তু যদি আপনি ইতিহাস পড়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে, প্রাচীন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদাই প্রতিকূল ছিল। তাছাড়া ইরান যদিও এই যুদ্ধে আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকার আক্রমণকে সহজ করে দিয়েছে, তবুও ইরান আসলে আমেরিকা ও ন্যাটোর পরাজয়ই কামনা করে। আমার মনে হয় না, ইরান ন্যাটোকে স্বতন্ত্র এক সাপ্লাই লাইন প্রদান করবে।"

হারুণ মনে করতেন, ২০১২ সালে এই যুদ্ধের উত্থান হবে। তখন ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করবেন। বিশেষজ্ঞ উলামাদের সমস্ত জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী তিনি ইতোমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। হয়তো ২০১২ সালেই ইমাম মাহদি মুসলিমদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা দাজ্জালী শক্তিকে পরাজিত করবেন।

আমি সন্ধ্যার সময় মেজর হারুণের সাথে সমুদ্র উপকূলে হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন দিক থেকে আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করতাম। আমার জন্য এই সময়টা খুবই বৈপরীত্যপূর্ণ মনে হতো। একদিকে পশ্চিমা বিশ্ব আফগানিস্তানে 'War on Terror' তথা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যাপারে সন্দিহান ছিল, এবং তারা মনে করতো, সেনাবাহিনী ও তালেবান মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অপরদিকে (পাকিস্তানি) তালেবান যোদ্ধারা পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আক্রমণ করছিল; এই অভিযোগে যে - এরা পাশ্চাত্যের মিত্র শক্তি এবং ওদের অনুগত বাহিনী। এই ব্যাপারে আমি হারুণের কাছ থেকে সন্তোষজনক তথ্য পেতে থাকি। তিনি কেবল পাকিস্তানের সাবেক সেনা অফিসারই ছিলেন না, বরং তিনি কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারের অধীনে কাজও করেছেন, যাদের মধ্যে জেনারেল মজিদও রয়েছেন।

হারুণ বলেন, "তালেবানের সাহায্য করা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি সাময়িক কৌশল মাত্র। এর সাথে আদর্শিক কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারের পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের সহায়তার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে সেখানে নিজেদের প্রভাব ও অবস্থান তৈরি করা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তো লস্করে তইয়্যেবাকে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদেরকে কেবল ভারতের বিরুদ্ধেই একপেশে রেখে ব্যবহার করছিল। এমনিভাবে ভারতও

পাকিস্তানি গাদ্দারদের সাহায্য দিয়ে থাকে। যদি পরিস্থিতি পাল্টে যায়, তাহলে সেনাবাহিনীও তাদের পলিসি চেঞ্জ করে ফেলবে। উদাহরণস্বরুপ, ISI কলকাতায় নাশকতা সৃষ্টির জন্য লস্করে তইয়্যেবাকে ব্যবহার করে। লস্করে তইয়্যেবার সদস্যরা প্রায়ই ধরা পড়তো। কেউ লম্বা দাঁড়ির কারণে, কেউ সালাফি আচরণে আর কেউ নিজের কথা-বার্তার কারণে ধরা পড়তো। তারা যখনই কোনো অপারেশনের পরিকল্পনা করতো, ধরা পড়তো। পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগগুলো পেরেশান থাকতো যে, ভারতে ISI-এর সমস্ত পরিকল্পনা আবার ফাঁস না হয়ে যায়। অথচ পাকিস্তানের ভূমিতে ভারতের করা সমস্ত পরিকল্পনা গোপনই থাকে। অনেক পরে তারা এর কারণ জানতে পারে। ভারতে পরিকল্পনাকারীরা ভারতীয় নাগরিক ছিল না। অন্যদিকে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তানিদের অর্থের বিনিময়ে কিনে নিতো। ফলে পাকিস্তানও এই পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিল। ২০০৭ ও ২০০৮-এ দিল্লি এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য ভারতীয় আন্ডারওয়ার্ল্ডকে ব্যবহার করলো। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সেবার প্রথমবারের মতো সেই পরিকল্পনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই তখন পাকিস্তানের আর লস্করে তইয়্যেবার প্রয়োজন ছিল না, অথবা পাকিস্তান আর তাদেরকে ব্যবহার করতে চাইলো না।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, *“যদি ব্যাপারটি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তান কেন লস্করে তইয়্যেবাকে পরিপূর্ণভাবে দমন করে ফেললো না?”*

মেজর হারুণ উত্তর দিলেন, *“কিছু কারণে এখনও তাদের লস্করে তইয়্যেবার কিছুটা হলেও প্রয়োজন আছে। প্রথমত ৯/১১-এর ইউটার্নের পর তারা একে একে সকল ইসলামপন্থী মিত্রদের হারাতে শুরু করেছিল। লস্করে তইয়্যেবাই এখনও তাদের একমাত্র ইসলামপন্থী মিত্র। এর আরেকটি বিশেষ কারণ আছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সামাজিকভাবে পাঞ্জাবি। বাহিনীর প্রায় ৬০% এরও বেশি সদস্য পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের। আর লস্কর হলো একটি ‘আহলে হাদিস’ সংগঠন। তাদের চিন্তাধারায় শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বৈধ নয়। অন্যভাবে বললে, লস্কর পাকিস্তান প্রশাসনের জন্য সহায়ক। তাদের ব্যাপারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কোনো আশঙ্কা ছিল না।”*

বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলের স্থানীয় বিদ্রোহগুলোর সফলতা এবং ব্যর্থতার পর্যালোচনা করা ছিল মেজর হারুণের ফার্স্ট চয়েজ। যখন আমরা আরবের বাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল আফলাকের দর্শন এবং সাদ্দাম হোসাইনের আদর্শিক ও ব্যবহারিক ইসলামের ব্যাপারে

আলোচনা করছিলাম, তখন মেজর হারুণ বললেন, *“ডাক্তার সাহেব! ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য সার্বজনীন এক বার্তা। কিন্তু এটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডভিত্তিক চিন্তা-ধারা, সংস্কৃতি এবং প্রথাসমূহকে ভ্রুক্ষেপ করে না।”*

এরপর আমি বললাম, *“ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তারা তো আরব জাতীয়তাবাদ এবং তার উত্থানের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে।”* মেজর হারুণ বললেন, *“আমি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ভালোভাবে জানি না। তবে আমার মতামত হলো, যুদ্ধের সময় ইসলামি রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারও জাতিপ্রীতি থেকে ফায়দা গ্রহণ করা যেতে পারে।”*

আমি কয়েকবার হারুণকে বললাম, *“আমি এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম, যে যুদ্ধে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিক মারা যায়।”* তাঁর উত্তর ছিল, *“মহৎ উদ্দেশ্য বিশাল কুরবানির প্রত্যাশা করে। ইতিহাস সাক্ষী, যুদ্ধ এবং শান্তিতে সহস্র নিরাপরাধ মানুষ মারা যায়। আমাদের সমাজ ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা নিরাপরাধ মানুষকে পিষে রাখে। জীবন তো কেবল তাদের জন্যই, যারা কোনো একদিকে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বাকি মানুষেরা না এপারের, আর না ওপারের।”*

মেজর হারুণ বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আডিয়ালা (Adyala) কারাগারে বন্দী আছেন। যে পুলিশ অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং আমার সাথে মতবিনিময় করেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে, হারুণের মাধ্যমে তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, হারুণের মতো ব্যক্তি কীভাবে মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহরণের অপরাধে আটক হলো! পুলিশ অফিসার অধিকাংশ সময়েই হারুণের কথা বলতো। সে গর্ব করে বলতো যে, তার জীবনে কখনও সে মেজর হারুণের মতো বিপ্লবী মানুষ দেখেনি। হারুণের জীবনবৃত্তান্ত কেন ব্যাপকভাবে চর্চা হয় না, এই বিষয়েও তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করতেন। মেজর হারুণ তাঁর জিজ্ঞাসাবাদে লিপ্ত অফিসারদেরকে আফগানিস্তানে ন্যাটোর পরাজয়ের গুরুত্বের ওপর নিজস্ব চিন্তা পেশ করেছিলেন। কখনও জেল জীবনের শূন্যতা এবং একাকীত্ব তাঁকে ক্রুদ্ধ ও হতাশ করে তুলতো। কিন্তু তাঁর ঈমান তাঁকে নতুন এক জীবনের অনুভূতি দান করতো। তাঁর জীবনকাহিনী আরব্য রজনীর এমন এক উপাখ্যানের মতো, যা শেষ জামানার যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত দেয়।

ওয়াজিরিস্তানে মেজর হারুণের সঙ্গীরা তাঁর মুক্তির পথ চেয়ে আছে। তাদের বিশ্বাস যে, হারুণের চিন্তাধারা এবং তাঁর উপস্থিতি তাদেরকে বিজয় সন্নিকটে পৌঁছে দেবে।

তালেবানের সারিতে আরেক তালেবান

৯/১১-এর পর পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গোত্রীয় এলাকাগুলোতে গোপন সংগঠনের রূপে নতুন তালেবানের সূচনা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের শহরে শহরে তা দাঁড়িয়ে যায় এবং হারুণ ও কাশ্মীরিদের মতো ব্যক্তিদেরকে আদর্শিকভাবে উজ্জীবিত করে তালেবানের নবীন কাতারে শামিল করে নেয়। নতুনদের এই ধারা আফগানিস্তান পর্যন্তও পৌঁছে যায়। সেখানে আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় ময়দানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আমেরিকা ও তার মিত্ররা ২০১১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান খালি করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সমস্ত অঞ্চলে যখন তালেবানের বিজয় হতে থাকে, তখন তারা এই অবস্থায় পতিত হয়েছিল। তালেবানের অতিবাহিত প্রতিটি দিন তাদের বিজয়ের নতুন দিগন্ত প্রস্তুত করছে।

পাশ্চাত্য থিঙ্কট্যাংকগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানে প্রায় ৮০% এলাকা তালেবানের শাসনাধীন। কিন্তু তখনও তাদের গবেষকরা মনে করতেন যে, ন্যাটোর অধিক সেনা মোতায়ন, ড্রোন হামলা এবং স্পেশাল অপারেশনের ফলে তালেবান, আল-কায়েদা আর তার মিত্রদের ছেড়ে ন্যাটোর সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হবে। আল-কায়েদার পরবর্তী প্ল্যান ছিল, যুদ্ধে আমেরিকার ফাঁদকে বানচাল করে দেওয়া।

যখন আমেরিকা অধিক সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছিল, আল-কায়েদা তখনই আমেরিকার চাল বুঝতে পেরেছিল। আল-কায়েদা তালেবানকে তখনই আলোচনার টেবিলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে কাজ শুরু করে দেয়। এটা অপারেশনের অন্যতম অংশ ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল, তালেবানেরকে সেই শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, ২০০১ সালে আল-কায়েদাকে নিরাপত্তা দেওয়ার অপরাধে তালেবানকে যেই শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল - তালেবানের কাতারে ধীরে ধীরে আল-কায়েদার চিন্তা-ভাবনা প্রসার করা। যেন তালেবান গ্রুপবন্দী না থেকে যায়।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল-কায়েদার জন্য আফগানিস্তানের তালেবান পর্যন্ত পৌঁছার প্রয়োজন ছিল না। কেননা হাক্কানি নেটওয়ার্ক তাদের ওয়াজিরিস্তানস্থ ঠিকানার পাশেই ছিল। সেখানকার পরিস্থিতি গায়েবিভাবে তালেবানেরকে একটি আদর্শিক ও গ্লোবাল জিহাদি আন্দোলনে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। সেই কুদরতি পরিবর্তনকে আরও গতিময় করতে কেবল দরকার ছিল আল-কায়েদার সামান্য প্রচেষ্টার।

তালেবান শক্তির মূলকথা

সিরাজউদ্দিন হাক্কানি ছিলেন আফগান কমান্ডার জালালউদ্দিন হাক্কানির ছেলে। জালালউদ্দিন হাক্কানি আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়াইকারী ভয়ঙ্কর কমান্ডার হিসেবে গণ্য হতেন। আফগানিস্তানে পশ্চিমা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রভাবশালী সব আক্রমণ এই নেটওয়ার্কের দায়িত্বেই সম্পন্ন হয়েছিল।

২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সিরাজউদ্দিন হাক্কানির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেটিই ছিল কোনো সাংবাদিককে প্রদান করা তাঁর প্রথম ইন্টারভিউ। সেই সময়ে সিরাজউদ্দিন হাক্কানিকে জালালউদ্দিনের ছেলে ছাড়া আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ মনে করা হতো না। কারণ তখনও একজন কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্বের কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। যখন আমি তাঁর ইন্টারভিউয়ের অনুমতি লাভ করি, তখন তিনি 'মানবাউল উলুম'-এর সামনে একটি ছোট্ট কক্ষে বসা ছিলেন। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনের পতনের পর পাকিস্তান সরকার ওই মাদ্রাসাকে জোরপূর্বক বন্ধ করে দিয়েছিল। যখন আমি কামরায় প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে বসে থাকা কিছু যুবক দ্রুত তাদের মুখ ঢেকে নেয়। কিন্তু তাদের চোখ ও কপাল দেখে আমি বুঝে গেলাম, তারা স্থানীয় কেউ না, আবার পশতুনও না। বরং তারা পাঞ্জাবি ছিল। এটা বুঝে অবশ্য আমি অবাক হইনি। কেননা পাঞ্জাবি যোদ্ধাদেরকে হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রধান শক্তি মনে করা হতো। জালালউদ্দিন হাক্কানি দারুল উলুম হাক্কানিয়ার গ্রাজুয়েট ছিলেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদি দায়িত্বে তিনি পাঞ্জাবের যোদ্ধাদের উপরেই আস্থাশীল ছিলেন। পাকতিয়ার জারদান গোত্রের সাথে যদিও তাঁর সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তিনি পাঞ্জাবের জিহাদি সংগঠনগুলোর থেকে বিশেষত - হরকাতুল মুজাহিদিন ও হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি থেকে নিজের শক্তি সঞ্চয় করতেন।

খোস্ত ছিল সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান নাজিবুল্লাহ সাহেবের এলাকা। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ১৯৯১ সালে জালালউদ্দিন হাক্কানির নেতৃত্বে জিহাদ করা হরকাতুল মুজাহিদিনের পাঞ্জাবি যোদ্ধাদের ওপর উত্তরাঞ্চল বিজয় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। পাঞ্জাবি যোদ্ধারা যেকোনো অঞ্চলে কমিউনিস্টদের পরাজিত করার মতোই জানবাজ ছিল। সেই সময় হাক্কানির নেতৃত্বে লড়াইকারী আফগান গোত্রের সংখ্যা ছিল খুব স্বল্পসংখ্যক। (পাঞ্জাবি গোত্রের সংখ্যাই ছিল বেশি। আর আফগানে পশতুন ছাড়া সবাইকেই পাঞ্জাবি বলা হয়।)

২০০১ সালের শেষে তালেবানের পরাজয়ের পর অন্যান্য তালেবান কমান্ডারদের মতো আফগানে জালালউদ্দিন হাক্কানিরও প্রভাব শূন্য হয়ে যায়। একটি নতুন বাহিনী গঠনের জন্য তাঁকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আসতে হয়। তখন তাঁর আফগান অনুসারীরা আফগান সমাজে প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে স্থানীয় গোত্রগুলো নিজ নিজ গোত্রীয় কমান্ডারের অধীনে ছিল। ফলে হাক্কানিকে পুনরায় পাঞ্জাবিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। ৯/১১-এর পর আফগানে সিরাজউদ্দিন হাক্কানির পাঞ্জাবি অনুসারীরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ৯/১১-এর পর ন্যাটো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে জিহাদি গ্রুপ শূন্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

২০০৩ সালে পারভেজ মোশাররফের ওপর হামলার পর অসংখ্য মুজাহিদদের সাজা হয় এবং কোনো প্রকার বিচার বিবেচনা ছাড়াই তাদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনাগুলো সিরাজউদ্দিনের চিন্তাচেতনায় প্রভাব ফেলে। ধীরে ধীরে তাঁর মনোবল সেনাবিরোধী হতে থাকে। ২০০৬ সালের পর তিনি প্রাচীন আফগান-তালেবান থেকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন শুরু করেন। আফগান-তালেবান পাকিস্তান এবং আরবের আস্থাভাজন ছিল। আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসন চলাকালীন যদিও জালালউদ্দিন হাক্কানি পাকিস্তান ISI-এর পছন্দনীয় ব্যক্তিত্বই ছিলেন, কিন্তু ২০০৭-এর পর অবস্থা একদম পাল্টে যায়।

আগে থেকেই পাকিস্তানে আল-কায়েদার কার্যক্রম ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তাদের কার্যক্রম দমন করার জন্য পাকিস্তানি সিকিউরিটি ফোর্স ‘হরকাতুল মুজাহিদিন’ এবং ‘হরকাতুল জিহাদ’-এর সদস্যদের ধরপাকড় শুরু করে দেয়। এই সংগঠনগুলোর অসংখ্য সদস্য নিরাপত্তাবাহিনীর কালো তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। তাদের সামনে ওয়াজিরিস্তানে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। এই সদস্যরা তখন থেকে জালালউদ্দিন হাক্কানির মজলিসকে নিজেদের ক্যাম্প এবং ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে নিজেদের মিশন বানিয়ে নেয়। তারা ওয়াজিরিস্তানে সেনাবিরোধী মনোভাব বিস্তার করতে থাকে।

২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মুজাহিদদের বিরাট অংশ দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করে। হাজার হাজার পাঞ্জাবি মুজাহিদ এই এলাকায় এসে পড়ে। তাদের অধিকাংশ হাক্কানি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হলেও আদর্শগতভাবে সকলেই আল-কায়েদার মাধ্যমে প্রভাবিত ছিল। তারা সকলেই গর্ববোধ করতো যে, শাইখ ঈসা, ওয়ালিদ আনসারী এবং আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বির মতো আরব উলামাদের সাথে বসার সৌভাগ্য

তারা লাভ করেছে। আরবদের সাথে মেলামেশার কারণে সিরাজউদ্দিন হাক্কানির মধ্যে এর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেই প্রভাব এতই সূক্ষ্মভাবে বিস্তার হয়েছিল যে, তিনি নিজেও তা অনুভব করতে পারেননি।

২০০৭ সালে জালালউদ্দিন হাক্কানি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সিরাজউদ্দিনকে সৈন্যদলের দায়িত্ব প্রদান করেন। হাক্কানি নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। কিছুদিন পরেই জালালউদ্দিন হাক্কানি বিছানায় শায়িত হয়ে পড়েন। তখন তিনি যুবক সিরাজউদ্দিনকে উপদেশ দেওয়ার মতোও উপযুক্ত ছিলেন না। আল-কায়েদা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জালালউদ্দিন হাক্কানির উত্তরসূরীদের সাথে আদর্শিক সম্পর্ক তৈরি করে। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিরাজউদ্দিনের বাগরাম হামলা করা হয়েছিল আবু লাইস আল-লিব্বির দিক-নির্দেশনায়। আরব এই আলেম সিরাজউদ্দিনকে হামলার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতার যোগান দিয়েছিলেন। এমনিভাবে গজনী, খোস্ত ও কাবুলে সংঘটিত অন্যান্য অপারেশনগুলোও হয়েছে হাক্কানি নেটওয়ার্ক এবং আল-কায়েদার সমন্বয়ে।

কয়েক মাসের ভেতরেই হাক্কানি নেটওয়ার্ক আফগান তালেবানের সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রুপে পরিণত হয়। আরব উলামাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সিরাজউদ্দিন হাক্কানি আল-কায়েদার অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সেনা হামলা এবং ২০০৮ ও ২০০৯ সালে 'ডান্ডে দারপাখেল' এলাকায় হাক্কানি পরিবারের ওপর CIA-এর ড্রোন হামলা জলন্ত আগুনে পেট্রোল ঢালার মতো কাজ করে। উক্ত হামলায় সিরাজউদ্দিনের বংশের অনেক লোক নিহত হয়। ফলে পাকিস্তানি ফোর্স ও প্রশাসনের সাথে তাঁর অবশিষ্ট সম্পর্কটুকুও শেষ হয়ে যায়। যোদ্ধাদের দাবি ছিল, তাদের আশ্রয়স্থল সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীই CIA-এর কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছে।

জালালউদ্দিন হাক্কানি পাকিস্তানের ভিতরে আল-কায়েদার সহযোগী সশস্ত্র বাহিনীগুলো থেকে সর্বদাই একপ্রকার দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ২০০৭ সালের পর সিরাজউদ্দিন হাক্কানি অনুভব করলেন, আল-কায়েদা এবং তাঁর নিজের পাকিস্তানি মিত্রদের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে তিনি খুব ভালোভাবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং সংরক্ষণ করতে পারবেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ন্যাটো বিরোধী যুদ্ধে আফগান ময়দানে একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

১৯৯০ সালের দিকে যখন তালেবানের উত্থান হয়, তখন সর্বপ্রথম জালালউদ্দিন হাক্কানিই তাদের স্বীকৃতি দান করেন। তিনি অল্পবয়স্ক এবং অপরিচিত মোল্লা উমারের হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করেন। অথচ আফগান রণাঙ্গনে জালালউদ্দিন এক প্রসিদ্ধ নাম ছিল যাকে প্রথমদিকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্য এক তালেবে ইলমকেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।[62]

নিজ পিতা থেকে কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণের পর আল-কায়েদার উন্মুক্ত ময়দানে পা রাখার পূর্বে সিরাজউদ্দিনকে এসব অতীত বাস্তবতা মাথায় রাখতে হয়। আল-কায়েদার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল সতর্কতামূলক। ওদিকে কাবুলে অবস্থিত ন্যাটো দপ্তর হাক্কানি নেতৃত্বের ক্রমোন্নতির ব্যাপারে অবগত ছিল। তারা সিরাজউদ্দিনকে তালেবান থেকে পৃথক বলে ধরে নিল এবং তাঁকে স্বাধীন কমান্ডার মনে করলো। ন্যাটো সংবাদ সম্মেলনে সিরাজউদ্দিনকে তালেবানের শত্রু হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়। সিরাজউদ্দিন এবং আল-কায়েদার মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে ভুল বোঝার কারণে তারা এমন ভ্রান্ত অনুসন্ধানের শিকার হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে সিরাজউদ্দিন সর্বদাই মোল্লা উমারের অনুগত ছিলেন। আল-কায়েদা সেই আনুগত্যকে গভীর করেছে এবং আরও দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছে, যেন তালেবান কখনও আল-কায়েদার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়। আল-কায়েদা কখনোই কামনা করতো না যে, সিরাজউদ্দিন মোল্লা উমারের বিরোধিতা বা অবাধ্যতা করুক। বরং আল-কায়েদার চাওয়া ছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার তালেবানের মাঝে তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করুক এবং আল-কায়েদার এজেন্ডাগুলোকে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিশ্চিত করুক। আর সিরাজউদ্দিনের নেটওয়ার্ক এগুলো বাস্তবায়নে সক্ষম ছিল। কারণ ন্যাটোবিরোধী লড়াইয়ে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও ভূমিকা ছিল।

62. এই প্যারায় উল্লেখিত মতটি লেখকের নিজস্ব অভিমত। যাঁরা সেসময় কাজে অগ্রসর হয়েছেন, যোগ্যতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই তাঁদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তালেবানের ঘোর বিরোধীরাও স্বীকার করে যে, তালেবান তাদের সেনা কমান্ডার ও প্রশাসনিক নিয়োগে দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতি করেনি। তালেবানকে সমর্থন দেওয়ার বাইরে সোভিয়েত বিরোধী বীর ও কিংবদন্তি যোদ্ধা মোল্লা জালালউদ্দিন হাক্কানি ওই সময় ওভাবে অ্যাক্টিভ ছিলেন না। নিজের এলাকায় তিনি যুদ্ধের আগের দরস ও তা'লিমে ফিরে যান।

সিরাজউদ্দিন তাঁর পিতার ছায়া থেকে সরে আসলেন। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে করম এজেন্সিতে ঘটে যাওয়া শিয়া-সুন্নি বিরোধে সিরাজউদ্দিনকে সুন্নিদের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়। তিনি তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের কমান্ডার বাইতুল্লাহ মেহসুদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ২০০৯ সালে যখন পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী সিরাজউদ্দিনের ভাই নাসিরউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করলো, তখন বাইতুল্লাহ মেহসুদ পাকিস্তানি সেনাদের সাথে বন্দী বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করেন। সিরাজউদ্দিন হাক্কানি হয়তো বুঝতেও পারেননি যে, তিনি কীভাবে আল-কায়েদার ক্যাম্পে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

অবশ্য সেখানে বহির্গত কিছু ব্যাপারও ভূমিকা রেখছিল। সিরাজউদ্দিনকে পাঞ্জাবি যোদ্ধাদের চিন্তা-চেতনাক ও সম্মানকে করতে হতো। আর তারা সবাই ইতোমধ্যেই সরকার বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। আর সরকারের পক্ষ থেকে সন্দেহ ছিল, এরা আল-কায়েদা সম্পৃক্ত। ফলে সরকার চতুর্দিক থেকে তাদের সংকীর্ণ করে ফেলে। অন্যদিক দিয়ে তাঁর পিতাও অসুস্থ। এর ওপর আল-কায়েদার পক্ষ থেকে নিঃশর্ত সহযোগিতা। সব মিলিয়ে সিরাজউদ্দিন হাক্কানি আল-কায়েদার এত কঠিন ভক্ত হয়ে পড়েন যে, ২০০৯ সালে তেহরিকে তালেবানের বিরুদ্ধে সেনা অপারেশনের সময় তিনি কেবল তাদের রক্ষাই করেননি, বরং সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহায়তাও করেছিলেন।

ছায়া থেকে ছায়া–বাহিনী হয়ে ওঠার গল্প

সিরাজউদ্দিন ছিলেন অস্ত্রাগারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। এই কথা অবশ্যই সত্য যে, ২০০৬-এর পরে যোদ্ধাদের জন্য অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তখন আল-কায়েদা আফগান আর পাকিস্তান থেকে নিজ সৈন্য তৈরিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সৈন্যরা মূলত আফগান তালেবানের অধীনে থেকে আল-কায়েদার জ্ঞান আহরণরত ছিল।

পাকিস্তানি তালেবানের এমন কঠোর পরিবর্তনের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল:

১. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জিহাদি দলগুলোর ওপর অনর্থক চাপ প্রয়োগ,

২. আল-কায়েদার নেতৃস্থানীয়দেরকে হত্যা, গ্রেপ্তার এবং গুয়েন্তানামো বে-তে পাঠানো,

৩. ইরাক যুদ্ধ,

৪. ২০০৬ সালে লেবাননের ওপর ইসরায়েলের হামলা।

এমন আপেক্ষিক দমননীতির কারণেই আল-কায়েদা, তালেবান উক্ত ক্ষিপ্ততাকে একটি আদর্শিক লড়াইয়ে পরিণত করতে সক্ষম হয়। এবং তালেবান যোদ্ধাদের একটি নতুন শাখার আবির্ভাব হয়। নতুন তালেবান ছিল সতর্ক। অন্যসব তালেবানও সতর্ক ছিল; কিন্তু নতুন তালেবান মোল্লা উমারের বাইয়াতে আল-কায়েদার আদর্শিক উদ্দেশ্যের জন্যই যুদ্ধ করতো। সিরাজউদ্দিন হাক্কানি আগে থেকেই কমান্ডে ছিলেন, যিনি আল-কায়েদার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোত্রীয় এলাকাগুলোতে তাঁর মতো যোগ্য আর কেউ ছিল না। ফলে আল-কায়েদা নিজেদের এই গোত্রীয় এলাকাগুলোর কমান্ডার নিজেই খুঁজে-বেছে নিয়োগ করেছিল।

আল-কায়েদার দৃষ্টি ছিল হিন্দুকুশ পর্বতের চূড়ায়, যেখানে নিত্যনতুন পরিবর্তন হচ্ছিল এবং নতুন নেতৃত্বের জন্য জায়গা তৈরি হচ্ছিল। এই জায়গাগুলো হচ্ছে — বাজাউর, মোহমান্দ, কুনার এবং নুরিস্তান। উত্তর-পূর্ব আফগানের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল এই জায়গাগুলো। আর এগুলোই ছিল পাকিস্তানি মুজাহিদদের কাবুল যাওয়ার দীর্ঘ গোপন পথ। আফগানিস্তানে তালেবানের পরাজয়ের পরপরই এই এলাকাগুলোতে আল-কায়েদার সাথে তালেবানের যোগাযোগ ছিল নিভু-নিভু। আহমাদ শাহ মাসউদ

এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার কারজাঈ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। আর তাদের সাথে থাকা সেনা-নেতৃবৃন্দরা কুনার ও নুরিস্তানে হইচই সৃষ্টি করে দিয়েছিল। একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল পাকিস্তানের বাজাউর ও মোহমান্দেও — যেখানে পূর্ণরূপে পাকিস্তান প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ডক্টর ইসমাইল ও মৌলভি ফকির মুহাম্মাদের মতো প্রভাবশালী কিছু কমান্ডারের কাছে আল-কায়েদা বন্দি ছিল। ২০০৫-০৬-এর সময়টাতে তালেবান বাজাউর ও মোহমান্দে প্রকাশ্যে আসতে পারতো না। মোটকথা, সেসময়টায় পাকিস্তানি শোষণের ভরা যৌবনকাল বিরাজ করছিল।

সেই সময়ে যোদ্ধারা হিন্দুকুশের নিকটে শক্তি অর্জন করছিল। কানাডিয়ান একটি টিভির তথ্যসমৃদ্ধ ডকুমেন্টারি বানানোর জন্য আমি কুনার ও মোহমান্দ সফর করেছি। সেখানে আমার একজন পাকিস্তানি যোদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে আগে লস্করে তইয়্যেবার সাথে যুক্ত ছিল। তার নাম ছিল সাদিক। সে আমাকে খুব আগ্রহভরে শোনাল সেই অবাক করা গল্পগুলো - যার কারণে আল-কায়েদা এই স্থানগুলোতে মজবুতভাবে শেকড় গেড়ে বসতে পেরেছে। সাদিক আমাকে বলতে শুরু করলো —

“তিন বছর পূর্বে এটা ছিল স্বপ্ন। আকাশ কুসুম স্বপ্ন। কিন্তু এখন অবস্থা বদলে গেছে। সেসময় ওয়াজিরিস্তান ছাড়াও মোহমান্দ আর বাজাউরে মুজাহিদরা অত্যন্ত সতর্ক অবস্থানে থেকে চলাফেরা করতো; যেন এটা লাহোর বা করাচি! সবসময় গোয়েন্দা আর গ্রেপ্তারির ভয় আমাদেরকে তাড়া করে ফিরতো।

আমরা দুই-একটা হামলার জন্য গোপনে আফগানিস্তান যেতাম। একদিকে আমেরিকান সৈন্যরা, অপরদিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের তালাশে পাগল হয়ে ছিল। কিন্তু আমরা পাকিস্তানিদের সাথে লড়তে চাইতাম না। কারণ তারা ছিল মুসলিম। আমরা তাদের মুখোমুখি না হতে পূর্ণ চেষ্টা করতাম। এখনও তিন শতাংশের চেয়েও কম মুজাহিদ তাদের বিরোধী। তবে আমরা পাকিস্তানের ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখি, পাকিস্তান আমাদের ব্যাপারে মোটেও তেমনভাবে চিন্তা করতো না। ওরা ছিল জালেম! খোদ আমেরিকানদের চেয়েও কঠোর এবং সঙ্কীর্ণমনা জালেম।

আমাদের এক ভাই ছিল। কাশ্মীর জিহাদে আমরা একসাথে লড়েছিলাম। তাঁর নাম হলো উমার। সে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদের শক্ত বিরোধিতা করতো। যখনই আমরা ওদের বিরুদ্ধে কোনো অপারেশনে যেতাম, উমার পৃথক হয়ে যেত। যাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়তে না হয়।

একবার ISI তাকে গ্রেপ্তার করে নিল। তারা উমারকে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে উরুতে ছুরি দিয়ে সতেরটা যখম করলো। আরও বিভিন্নভাবে নির্যাতন করলো। কঠিন অত্যাচারের পর উমারের টিকে থাকাই ছিল আশ্চর্যের। শেষে ওরা তাকে ছেড়ে দিল। আমরা ভেবেছিলাম উমারের আর জিহাদে যাওয়ার অবস্থা নেই। কিন্তু মোটেও সেরকমটা হলো না। তখন উমার একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী মুজাহিদ। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘোর বিরোধী।

এই ধরনের অনেক ঘটনায় অনেক ভাইয়েরা আমাদের ক্যাম্পে এসে জড়ো হলো। এখন তাদের বুঝে এসেছে যে, কাশ্মীরে তাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে লড়ানো হতো। তাদের মধ্যে পরিবর্তনের মূল জযবাটা সৃষ্টি করে দিয়েছে আল-কায়েদা।

আবু মারওয়ান নামে আল-কায়েদার একজন নেতা ছিলেন। তাঁকে বাজাউর এজেন্সিতে সিকিউরিটি ফোর্স শহীদ করে দিয়েছিল। আবু মারওয়ানকে (আমেরিকা / পাকিস্তানের) সরাসরি কোনো কমান্ডো বাহিনী শহীদ করলে এতটা অনুতাপ হতো না। এমন একজন ব্যক্তির সেই চামচা বাহিনীর হাতে মারা যাওয়াটা নিতান্তই লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল।

সেদিন আবু মারওয়ান একটি বাসে সফর করছিলেন। তখন তাঁকে একজন আরব হিসেবে চিহ্নিত করে বাস থেকে নামানো হলো। আবু মারওয়ান নিজের রিভলবার বের করে বললেন, “আমি একজন মুজাহিদ। আর আমি কোনো মুসলিমকে মারতে চাই না। অতএব আমার পথ ছেড়ে দাও।” দালালেরা এই কথা হেসে উড়িয়ে দিল।

আরবদের ব্যাপারে তো আপনি জানেনেই। তারা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যায়; ময়দানে কখনোই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। কিন্তু আবু মারওয়ান সেখান থেকে পালাতে শুরু করেছিলেন। যাতে মুসলিমদের রক্ত না ঝরাতে হয় — শুধুমাত্র এই কারণে। সেসময় দালালগুলো তাঁকে শহীদ করে দিল।

তাঁর পবিত্র দেহটির বেশ কিছু ছবি তুলে আমেরিকানদের দেখানো হলো। হত্যাকারীদেরকে আমেরিকার পক্ষ থেকে রাজকীয় সম্মাননা জানানো হলো। প্রত্যেক মুজাহিদ খুবই মর্মাহত হলো। ভাই! বুকে হাত দিয়ে বলছি, আমাদের রক্ত এতটা ফেলনা নয় যে এক নিকৃষ্ট কুকুরের দল তা নিয়ে খেলা করবে!

মুজাহিদরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলো। সবাই নিজেদের গোপন ঘাঁটি থেকে বের হয়ে আসলো। আবু মারওয়ানের শাহাদাত তখন আন্দোলনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। পুরো বাজাউরজুড়ে তাঁর শাহাদাত একটি উপাখ্যানরূপে গৃহীত হলো। বাজাউর থেকে একটি

জোশ উঠল। অল্প কয়েকদিনের তীব্র আক্রমণে পাকিস্তানি দালাল বাহিনী রীতিমত ধ্বংস হয়ে গেল। সেনাবাহিনীরা অপারেশন শুরু করলে তাদেরকেও জাহান্নামের পথে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমাদের একতরফা বিজয়ে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে জড়ো হলো আমাদের পাশে।

আপনি তো জানেন, আমাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার মাওলানা ফকির মুহাম্মাদকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সহায়তা দিয়েছিল। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের পর সেই সেনাবাহিনীই তার ভাইকে গ্রেপ্তার করে এবং কঠিন অত্যাচার করে শহীদ করে ফেলে।

২০০5-এ তালেবান শুধু উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল। আর মোহমান্দ এজেন্সিতে সৈন্য ছিল মাত্র কয়েক ডজন। কিন্তু এখন পাকিস্তানি সৈন্য থেকে আমাদের সৈন্য আঠারো হাজারেরও বেশি।"

আল-কায়েদা এই সমস্ত উন্নতি-অগ্রগতি ও পরিবর্তন গভীর পর্যবেক্ষণে রেখেছিল। পাকিস্তানি গোত্রগুলোর মাঝে আল-কায়েদার বহু মিত্র আর সহযোগী ছিল। কিন্তু তারা কোনো আফগান মিত্রের তালাশ করছিল — যাকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যায়। এমন কেউ — যে হবে সিরাজউদ্দিনের মতো, যে হবে তালেবান জিহাদের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোনো ব্যক্তিত্ব, আর কাজ করবে আল-কায়েদার আদর্শিক নীতিতে। কিছুদিন পরেই এমন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। ISI-এর নরজবন্দিতে থেকে তিনি পুরোপুরি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঘোর বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। আর তালেবানের নীতি অনুযায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরার পক্ষে তিনি ছিলেন না। তাঁর নাম কমান্ডার জিয়াউর রহমান।

জিয়াউর রহমান ছিলেন অখ্যাত একজন মানুষ। ২০০৮-এর মাঝামাঝি এসে কুনার, বাজাউর, মোহমান্দ এবং নুরিস্তানে তাঁর পরিচিতি বাড়তে লাগলো। ২০০৯-এ নুরিস্তানে ন্যাটো বাহিনীকে পরাজিত করেন। ফলে ন্যাটো বাহিনী নুরিস্তানকে তাদের ক্যাম্পশূণ্য করতে বাধ্য হয়।। এর আগ পর্যন্ত ন্যাটো এবং পাকিস্তান বাহিনী তাঁকে অন্য সাধারণ তালেবান কমান্ডারদের মতোই ভেবে এসেছিল। কিন্তু গোপনে গোপনে আল-কায়েদা তাঁকে প্রভাবশালী করে তোলে।

আমি কুনার উপত্যকায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম ২০০৮-এর মে মাসে। তখন খুব কম লোকই তাঁকে চিনতো। কমান্ডার জিয়াউর রহমান (সিরাজউদ্দিন হাক্কানির মতো) কোনো বড় মুজাহিদের সন্তান ছিলেন না। অখ্যাত একজন আলেম মাওলানা দিলবরের ছেলে ছিলেন তিনি। জিয়াউর রহমানের সম্পর্ক ছিল আমিরুল মুজাহিদিন উসামা বিন লাদেনের সাথে, ISI-এর সাথে না। উসামা বিন লাদেন তাঁর বাবার কাছে হাদিসের দারস গ্রহণ করেছিলেন। তিন বছর বয়সে তিনি আরব যোদ্ধাদের ক্যাম্পে যুদ্ধনীতি শিক্ষা করেছিলেন। তারাই মূলত জিয়াউর রহমানের মন-মননে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেতনা প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। শুধু আফগানিস্তানেই না, পুরো দুনিয়াজুড়ে জিহাদের জযবা সৃষ্টির কথা বলেছিলেন তারা।

জিয়াউর রহমান উত্তরাধিকার ভিত্তিতে কমান্ডার পদ পাননি। বরং জিহাদের ময়দানে নিজ যোগ্যতায় কমান্ডার হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি কুনার এবং নুরিস্তানে জিহাদ করেছেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি কর্নিগাল উপত্যকায় আমেরিকার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং নুরিস্তানে দ্বিতীয় বৃহত্তম যুদ্ধ করেছেন। ন্যাটো বাহিনীর হামলা থেকে বাঁচতে তিনি বাজাউর এসে পৌঁছান। সেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেয়। কিছুদিন পরই বন্দি বিনিময় চুক্তিতে তাঁকে মুক্ত করা হয়।

২০০৮-এর মে মাসে আমি তাঁর ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম, আল-কায়েদার সাথে কতোটা মজবুতভাবে জড়িত তিনি! এই কারণেই আমি এশিয়া টাইমসে খুব আস্থার সাথে ধারণা করেছিলাম যে, জিয়াউর রহমান এই এলাকার বড় একজন কমান্ডার প্রমাণিত হবেন। এর কয়েক মাস পরেই আফগানিস্তানের কুনার উপত্যকায় 'অপারেশন লায়ন হার্ট' এবং পাকিস্তানের বাজাউর ও মোহমান্দে 'অপারেশন শেরদিল' শুরু হলো। [63] জিয়াউর রহমান প্রধান কমান্ডারের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বুঝে গেল, হিন্দুকুশ সীমান্তে তালেবান ও আল-কায়েদার কমান্ডার চীফ জিয়াউর রহমানই। তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। অন্য কমান্ডারদের মতো পাকিস্তান বাহিনীর প্রতি বিন্দুমাত্র সহনশীল ছিলেন না তিনি।

---

63. এই দুটো মূলত ছিল একই অপারেশন। স্রেফ আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের সীমান্তরেখার এপাশে-ওপাশে ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল। আফগানিস্তানের কুনার এবং নুরিস্তান প্রদেশে আমেরিকা ও পাকিস্তানের যৌথভাবে ড্রোন হামলার নাম দেওয়া হয় — Operation Lion Heart। আর পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা বাজাউর ও মোহমান্দে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী পরিচালিত ড্রোন হামলার নামকরণ করা হয় — 'অপারেশন শেরদিল' (অপারেশন লায়ন হার্টের-ই উর্দু অনুবাদ)।

২০০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানি সিকিউরিটি ফোর্স দাবি করে বসে যে, জিয়াউর রহমান কুনারে হাজার হাজার চেচেন, আফগান ও আরব সেনাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং মোহমান্দ এজেন্সিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করছেন। ২০০৯-এর নভেম্বর মাসে তাঁর কমান্ডে তালেবান যোদ্ধারা আমেরিকান বাহিনীর ওপর শক্তিশালী হামলা করে এবং তাদেরকে ক্যাম্প খালি করতে বাধ্য করে। দেখতে দেখতেই জিয়াউর রহমান ন্যাটো বাহিনীর ত্রাস হয়ে ওঠেন। আল-কায়েদার দরকার ছিল জিয়াউর রহমানের মতো কমান্ডারের। যারা মূলত তালেবানের ছায়াতলে স্থানীয় যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবে এবং বাস্তবে আল-কায়েদার পলিসিতে কাজ করে যাবে।

এই সময়টাতে আল-কায়েদার সমরনীতি বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন কিছু ভাবছিলেন। ২০০৬-০৭ এর মাঝামাঝিতে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন — এই নতুন বাহিনীকে একটি নিয়মিত ছায়া-বাহিনী হিসেবে কার্যকর করবেন। মোল্লা দাদুল্লাহ এবং আখতার উসমানির মতো প্রসিদ্ধ তালেবান নেতাদেরকে শুধু দেখানোর জন্য সামনে আনা হলো। যেন আমেরিকা তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আমেরিকার এই বেখেয়ালির সুযোগ নিয়েই একটি ছায়া-বাহিনী গড়ে উঠবে। তারা আড়ালে থেকেই মরণকামড় বসাতে থাকবে। আর ন্যাটো কিংবা অন্য সমস্ত বাহিনীই এই ছায়া-বাহিনী সম্পর্কে অন্ধকারেই থেকে যাবে!

আমি ইতোপূর্বে কয়েকজন কমান্ডারের সাথে দেখা করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে জিয়াউর রহমানই ছিলেন সবচেয়ে আলাদা। আল-কায়েদা তাঁকে একেবারেই ভিন্নরূপে নিয়ে এসেছিল। তখন তিনি স্রেফ ভয়ানক এক যোদ্ধাই ছিলেন না; বরং তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল আল-কায়েদার চিন্তাচেতনা। আমি যখন কুনার উপত্যকায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি, তিনি আমার জন্য স্বচ্ছ রুচিসম্মত খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি কয়েকজন সঙ্গীসহ সেখানে পৌঁছলেন। তাঁর সাথে ছিল AK-47 এবং রকেট লঞ্চার। তাঁর সঙ্গীরা সবাই ছিল আফগানি এবং পাকিস্তানি। খাবার পরিবেশন করা হলো। সবাই মাটিতে বসে খাবার গ্রহণ করলো। জিয়াউর রহমান ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেহারায় হাসি ফুটিয়ে বলছিলেন, তিনি দুপুরের পর খাবার খান না। এতে তাঁর নামাজ কাযা হয়ে যায় এবং আল্লাহর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু অনর্গল আরবিতে কথা বলতে পারতেন। যখন তিনি তালেবান জামানায় তালিম দেওয়ার কেন্দ্র গঠন করেছিলেন, তখন আরবদের থেকে আরবি ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান ছিলেন সালাফি মতাদর্শী। তাঁর হস্তক্ষেপেই গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এর পূর্বে আফগানি ও পাকিস্তানিরা কেবল নিজেদের কমান্ডারের কথাই মেনে চলতো; অন্যের কমান্ডে যেতে পছন্দ করতো না।

জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা সবাই এক। সকল মুসলিম ভাই-ভাই। কেউ উত্তর থেকে এসে থাকুক অথবা দক্ষিণ থেকে, আরব হোক কিংবা পাকিস্তানি হোক — সবার জন্যই একজন আল্লাহ আর সবাই সেই একজনের জন্যই।"

এলাকাজুড়ে প্রশাসনের চিত্র পালটে গিয়েছিল। পুরো এলাকা তখন পাকিস্তানি শোষণের চরম বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং আল-কায়েদার অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিল। এই মাটিতে তখন একের পর এক জিয়াউর রহমানরা জন্ম নিতে থাকে — যাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য থাকে আল-কায়েদার বিশুদ্ধ চেতনার ধারক হওয়া। হিন্দুকুশে জিয়াউর রহমানের এই আত্মপ্রকাশ সবকিছু বদলে ফেলল। বাজাউর আর মোহমান্দের গোত্রসমূহ পাকিস্তানি প্রশাসন এবং পাকিস্তানের বন্ধু তালেবান-কমান্ডারদের হাত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে পড়লো।

ন্যাটো এবং পাকিস্তানের সম্মিলিত 'অপারেশন লায়ন হার্ট' (পাকিস্তানে 'অপারেশন শেরদিল' নামে) তালেবানের এই নতুন শাখাটিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই শুরু হয়েছিল। ন্যাটো আফগানিস্তানের কুনার ও নুরিস্তান প্রদেশে অপারেশন চালায় আর পাকিস্তান অপারেশন চালায় বাজাউর ও মোহমান্দ প্রদেশে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে চলল এই অপারেশন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং ন্যাটো বিজয়ের ঘোষণাও দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু ২০০৯-এর নভেম্বর মাসে মুজাহিদরা তাড়া খাওয়া বাঘের মতো উঠে দাঁড়াল! আমেরিকান বাহিনীর সীমান্ত-ঘাটিগুলোয় ধ্বংসাত্মক সব হামলা করলো তারা। প্রায় নয়জন আমেরিকান সেনা ধ্বংস হয়ে গেল। আফগান সেনাবাহিনীর বেশকিছু সেনাকে হত্যা এবং অনেক সেনাকে বন্দি করা হয়েছিল। ২০০৯-এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জিয়াউর রহমানের কমান্ডে যোদ্ধারা আমেরিকান ঘাঁটিগুলো দখল করে নেয়। এবং এদিকে বিশ্ব-মিডিয়ার দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করে। তাদেরকে এই বিজয়নামা লেখার প্রতি আহ্বান করে। মোহমান্দ এবং বাজাউরে জিয়াউর রহমানের সেনা ব্যাটালিয়ন দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করলো। এবার পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্সের ওপর তারা আগের চেয়ে ভয়ানক হামলা শুরু হয় এবং সীমান্ত এলাকাগুলো খালি করতে বাধ্য করা হয়।

২০০৯-এর ডিসেম্বরে তুষারপাত শুরু হলো। হিন্দুকুশের তুষারমালা দেখছিল আল-কায়েদার বিজয়োৎসব! অসমাপ্ত এই যুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলছিল। এই সূত্র ধরেই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে শুরু হলো আরও একটি অপারেশন।

নতুন রূপে আল-কায়েদা

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার মুখপাত্র এবিসি নিউজকে জানায়, আফগানিস্তানে আল-কায়েদার প্রায় একশয়ের মতো সদস্য এখনও রয়ে গেছে। আমেরিকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করতে পারার ক্ষেত্রে এটাও ছিল আরেক দৃষ্টান্ত। আফগানিস্তানে ওবামা সরকারের তিন হাজারের মতো অধিক সেনা মোতায়নের সিদ্ধান্ত আল-কায়েদাকে দমনের জন্যই নেওয়া হয়েছিল। ২০০২ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া আল-কায়েদার বিস্তারের ব্যাপারে ওয়াশিংটন অবগত ছিল না। ২০০২-এর বালি বোম্বিংয়ের মতো সীমাবদ্ধ লক্ষ্য হাসিলের জায়গায় আল-কায়েদা এখন আর নেই। বরং সেই লক্ষ্য মোড় নিয়েছে আফগানিস্তানের সীমান্ত ছাড়িয়ে পুরো বিশ্বেজুড়ে আমেরিকান সাপ্লাই লাইন ধ্বংসের দিকে।

২০০৭ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যকার ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, বর্তমান আল-কায়েদা ৯/১১-এর অবস্থান থেকে আরও উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে। তাদের খেল এখন কেবল দৃষ্টিসীমার মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ নয়। এখন আল-কায়েদা এক নতুন প্রজন্মের ভেতর নিজ সত্ত্বার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, যেটা হলো শ্যাডো আর্মি (মোটামোটি বাংলায় ছায়া বাহিনী / গোপন বাহিনী)।

নিজেদের প্রাথমিক অবস্থার সীমাবদ্ধ যুদ্ধকৌশল থেকে বেরিয়ে এসে আল-কায়েদা এই শ্যাডো আর্মির মাধ্যমে বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আল-কায়েদা পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকাগুলোতে 'জুনদুল্লাহ'-এর মতো সামরিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল আগেই। কিন্তু এখন 'শ্যাডো আর্মি' গঠনের মাধ্যমে আল-কায়েদার শক্তি ও বিস্তৃতি আরও বেড়ে যায়।

তেহরিকে তালেবানের মতো স্থানীয় গ্রুপগুলো পাকিস্তানের গোত্রীয় ও শহুরে অঞ্চল এবং আফগানিস্তানে আল-কায়েদার হয়ে সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল। পুরোনো কায়েদার সাথে এই শ্যাডো আর্মির সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। নব্বইয়ের দশকের দিকে আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামি বিশ্বকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ইয়েমেনে ইউএস স্কুল এবং ২০০১ সালে আমেরিকাতে বিভিন্ন হামলাগুলো ছিল সেটারই বহিঃপ্রকাশ। পশ্চিমা বিশ্বকে পরাজিত করার নিমিত্তে আল-কায়েদা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রশস্ত করে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ব থেকে বিদ্যমান গ্রুপগুলো

যেমন - তেহরিকে তালেবানকে সাংগঠনিক রূপ না দিয়ে আল-কায়েদা কেন আলাদাভাবে ছায়াবাহিনী গঠন করার প্রতি মনোনিবেশ করলো? ২০০২ সালের পর আল-কায়েদা এমনই এক ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিল, যার ফলশ্রুতিতে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজে নিজেই বিভিন্ন গ্রুপ জন্ম নিতে থাকে। তেহরিকে তালেবান সেই ব্যবস্থাপনারই সৃষ্টি ছিল। এই ব্যবস্থাপনা খুবই স্পর্শকাতর ও সুগঠিত। উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকা এবং তার মিত্র পাকিস্তানের পক্ষ থেকে হামলা হলে কায়েদা ও তার সমস্ত মাধ্যমকে রক্ষার জন্য পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এবং অস্থির করে তোলা।

এই সংগঠনগুলোর প্রধানেরা স্থানীয় গোত্রীয় ব্যক্তিত্ব এবং পাকিস্তানের ময়দানের লোক ছিলেন। কিন্তু তেহরিকে তালেবানের মতো দলগুলোর ওপর আল-কায়েদার প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। এই গ্রুপগুলো এমন এমন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, যা মূলত আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অপছন্দ করতো। কিন্তু প্রয়োজনবশত সেগুলোকে আপাত বরদাস্ত করা হতো এবং আল-কায়েদা জেনে বুঝেই সেসব কর্মকান্ডের ব্যাপারে চোখ বুজে থাকতো। এই সময়টা ছিল আল-কায়েদার পরিবর্তনের জামানা। এই পর্যায়ে আল-কায়েদা কিছুটা সময় নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল এবং পাশাপাশি অনুসারীদের সংঘবদ্ধ করে প্রকৃত (দ্বীনের) ভাই হিসেবে গড়ে তুলছিল। আল-কায়েদা দৃঢ় ছিল যে, সংঘাতের সময় পরিস্থিতির পাল তাদের দিকেই ভিড়বে।

৯/১১-এর পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশীয় যুদ্ধের ময়দানে আল-কায়েদা নেতৃত্ব প্রথমদিকে বেশ কিছু সময় চুপচাপ মানিয়ে চলেছিল। তালেবান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী ছিল। তারা পুরুষদের দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করা এবং অশ্লীলতা বিস্তারকারী বিভিন্ন বিউটি পার্লার উচ্ছেদ তাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানের তেহরিকে তালেবান (TTP) গঠনের পর তারা মাঝে মাঝেই স্বাধীনভাবে এমনটা করতো।

আল-কায়েদা নেতৃত্ব এই বিষয়টি ভালো করেই জানতো যে, এই ধরনের কার্যকলাপ স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে তালেবান ও তাদের বিরোধী বানিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এটাও বাস্তব সত্য ছিল যে, পৃথিবীর বুকে আফগান তালেবান ও পাকিস্তানি তালেবান ছাড়া তাদের আপাতত আশ্রয় ছিল না। আল-কায়েদা জানতো যে, তারা স্থানীয় এই ধরনের বিষয়ে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু করলে অনেকেই না বুঝে বিরোধিতা শুরু করবে।

আর ফলস্বরূপ তালেবানের সমর্থন হারানোও অসম্ভব কিছু না। তাই তারা স্থানীয় রীতিনীতি সংশোধন করতে এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় জিহাদি দলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাময়িক আপস করে। তবে একইসাথে আল-কায়েদা কৌশলীভাবে এমন একটি অবস্থান তৈরি জন্য কাজ করে যেতে থাকে, যেখানে তারা আর অন্য কারও ওপর নির্ভরশীল হবে না। বরং নিজেদের সকল বিষয় সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

আল-কায়েদা দৃঢ়ভাবে নতুন প্রজন্মের একদল কমান্ডারদেরকে নিজেদের আদর্শে লালন করতে থাকে। একইসাথে সিরাজউদ্দিন হাক্কানি ও জিয়াউর রহমানের মতো মানুষদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তবে একটি কাজ তখনো বাকি ছিল, আর তা হলো আল-কায়েদার সত্ত্বাকে রক্ষা করা এবং তাদের আন্দোলনের এই মিশনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে আল-কায়েদার সত্ত্বাকে নতুন কোনো দেহে প্রবেশ করানো (অর্থাৎ আল-কায়েদাকে নব একটি সংস্থায় রূপান্তর করা)। কিন্তু একটি নতুন সিস্টেমের মধ্যে আল-কায়েদার সত্ত্বার সংরক্ষণ এবং রূপান্তরের কাজটি ছিল অত্যন্ত জটিল ও নাজুক।

আল-কায়েদার চূড়ান্ত ভিশন ছিল — এক খিলাফাতের অধীনে একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু এটি জোরপূর্বক ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না। বরং আল-কায়েদা ছিল পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন। তারা আশাবাদী ছিল যে, এটা ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল দলসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে লড়াইয়ের বিপরীতে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টে জমা করবে। আল-কায়েদা ও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মধ্যে এটি ছিল এক মৌলিক পার্থক্য। আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরির বিশ্বাস ছিল, যতক্ষণ পশ্চিমা প্রভাব ও আধিপত্য মুসলিম বিশ্ব থেকে মুছে ফেলা না হয় এবং মুসলিম দেশগুলোর সমস্ত কর্মকান্ড থেকে এই প্রভাব দূরীভূ না হয়, ততক্ষণ শরীয়াহর চূড়ান্ত বিজয় আসবে না।

ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'-এর প্রতিষ্ঠাতা শাইখ হাসান আল-বান্নার (মৃত্যু: ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন করেছিলেন, যিনি ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে মিশরে ইসলামি মূল্যবোধ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তা কেবল ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়াও ডা. আজ-জাওয়াহিরি

ইখওয়ানের আরও একজন নেতার দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন - সাইয়্যেদ কুতুব (মৃত্যু: ১৯৬৬ সাল, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল), যিনি পশ্চিমা সমাজকে 'জাহিলিয়্যাহ' হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং ইসলামি বিপ্লব ও ইসলামি হুকুমতকে পশ্চিমা আচার-সংস্কৃতি ও চালচলন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আল-কায়েদা অধিকাংশ সময় সৌদি আরবের উপমা পেশ করে থাকে। সেখানে ইসলামি বিধানসমূহের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু রাষ্ট্রটি পশ্চিমা উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছার গোলাম। আল-কায়েদা পশ্চিমা ঠিকাদারির বিরুদ্ধে ইসলামি বিশ্বের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। আর এই কাজে (লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে) পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামি, মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিন, সোমালিয়ার ইসলামিক কোর্ট ইউনিয়ন, ইরাকের হিযবে ইসলামিকে নাকচ করে দেয়।

আল-কায়েদার মতে, যদিও এই সংগঠনগুলো ইসলামের নামসর্বস্ব পতাকাধারী, কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমা দাসত্বপূর্ণ অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এই সংগঠনগুলো মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোতে টিকে আছে আমেরিকার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হেফাজতের কাজে নিয়োজিত পশ্চিমা সংস্থাগুলোর সাথে নানাপদের চুক্তির কারণেই।

একইভাবে আল-কায়েদার মতামত হলো, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নামধারী সেনাবাহিনী পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠা পাবার পথে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। হামাস এবং ইসলামিক জিহাদও এই কাতারে শামিল। যারা ঘুরেফিরে পশ্চিমাদের বানানো নিয়মনীতিরই আনুগত্য করে। আল-কায়েদার চেষ্টা প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল মুসলিম বিশ্বের সশস্ত্র বাহিনী, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমেরিকার প্রভাব প্রতিপত্তি খতম করা।

৯/১১-এর পূর্বে আল-কায়েদার কাছে খালিদ শাইখ মুহাম্মাদের মতো অভিজ্ঞ সমরবিদ ছিলেন। কিন্তু সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিদ্রোহ করার মতো অভিজ্ঞ কেউ ছিল না। গুলবুদিন হেকমতিয়ারের মতো মানুষও আল-কায়েদার মিত্র ছিল ঠিকই। কিন্তু তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা এবং নিজস্ব নীতি ছিল। সে যে সাময়িকভাবে কাজে আসবে, তা মোটামোটি নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু এই আশঙ্কাও সবসময় ছিল যে, সে কঠিন মুহূর্তে সঙ্গ ত্যাগ করে বসবে। আল-কায়েদা নেতৃত্ব এমন একজন লোকের সন্ধানে ছিল, যে আন্তর্জাতিকভাবে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী এবং নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে চিন্তা করতে পারবে।

কাশ্মীরের জিহাদি ক্যাম্পগুলোতে অধঃপতন পুনরায় আল-কায়েদাকে একটি নতুন দলের মাঝে নিজেদের প্রাণ সঞ্চারের সুযোগ তৈরি করে দেয়। এই সুযোগ মিলেছিল ২০০৩ সালে মোশাররফের ওপর হামলার পরে, যখন নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে গ্রেপ্তারি শুরু হয়েছিল। সেই সময় গোয়েন্দাদের দৃষ্টিতে কোনো জিহাদি মজলিসের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক রাখার সন্দেহ হলেই কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সেটা যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতো। চাই তার সম্পর্ক পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যতই ভালো হোক না কেন। যখন জানা গেল, আসিফ চুটু নামের এক ব্যক্তি হামলা করার জন্য অর্থায়ন করেছে তখন জাইশে মুহাম্মাদের সুপ্রিম কমান্ডার আবদুল্লাহ শাহ মাযহারকেও ISI তুলে নিয়ে যায়।

আসিফ চুটু কোনো এক সময় জাইশে মুহাম্মাদের সদস্য ছিল। পরবর্তীতে সে আল-কায়েদায় যোগ দিয়েছিল। আবদুল্লাহ শাহ মাযহার জেলখানায় অতিবাহিত করা দিনগুলোর কষ্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

“আমাকে করাচি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং একটি গাড়িতে নিয়ে ঢোকানো হলো। সর্বশেষ আমি যে বিল্ডিং দেখেছিলাম, সেটা ছিল ডিফেন্সের সুলতান মসজিদ। এরপর আমার চোখে পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর একটি বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাকে ভালো খাবার দেওয়া হলো। ভালো ব্যবহার করা হলো। এরপর আমাকে আসিফের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলো যে, আমি তার সম্পর্কে কতটুকু জানি এবং মোশাররফের ওপর হামলার ব্যাপারে আমার জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে কিনা?

আমি তাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি, যদিও আমি আর আসিফ একইসাথে একই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি। কিন্তু তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমার কিছু জানা ছিল না। আর না মোশাররফকে হত্যার ষড়যন্ত্রে আমার কোনো হাত ছিল। সেনা অফিসার বললো, আমার হাতে চিন্তাভাবনার জন্য তিন দিন সময় আছে। এরপর আমাকে সেসব লোকের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া হবে, যারা আমার সাথে ভালো আচরণ করবে না। আমার জবাব একই ছিল যে - আসিফ চুটু কী করে সেসম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

তিন দিন পরে আমাকে আরেকটা জায়গায় স্থানান্তর করা হলো। কেউ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতো না। কেবল একটি লোক ছাড়া - যে আমাকে খাবারদাবার দিতো। এরপর

একদিন আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হলো এবং অন্য একটি শহরে (সম্ভবত লাহোর) পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সেখানে আমাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। তারা আমাকে ছাদের সাথে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিল, যেন বিক্রির জন্য জবাই করে কসাই মুরগি ঝুলিয়েছে। তেমনি আমার হাতপাগুলো একসাথে বেঁধে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। শরীরের সব রগ ব্যথায় ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এক ঘন্টা পরে আমাকে নিচে নামানো হলো, এবং আমার সেলোয়ার খুলে আমার সতরে বেত দিয়ে পিটানো শুরু করলো। বেতের আঘাতে আমার চামড়া ফেটে পড়লো। এই অবস্থায় কেউ আমার সাথে কোনো কথা বলেনি।

যখন আমি অর্ধ বেহুঁশ হয়ে পড়লাম, তখন আমাকে একটি ছোট কামরায় রেখে আসা হলো। কয়েক ঘন্টা পরে এক লোক আসলো এবং দরজার ছোট একটি ছিদ্র খুলে আমাকে বাহিরে হাত বের করার জন্য বললো। আমি হাত বের করার পরে সে আমার হাতে একটি মলম দিল এবং ক্ষতস্থানগুলোতে লাগাতে বললো।

এরপর একটি সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আমাকে একাকি বন্দী করে রাখা হলো। প্রয়োজন সারতে একটি লোটা দেওয়া হলো।

এরপর ছয় মাস পরে আমাকে বেকসুর খালাস দেয়। এক ব্রিগেডিয়ার এসে এসব আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলো। সে এর জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণও দিয়ে দিল। কিন্তু আমি নিতে অস্বীকার করি।"

আবদুল্লাহ এরপর আবার করাচিতে চলে যায় এবং নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার অন্তরে প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো জযবা ছিল না। কিন্তু একইভাবে বন্দিশালায় বিনইয়ামিনের মতো লোককেও আনা হয়েছে এবং এমন জেলখানায় রাখা হয়েছে যে, সে নিজের ওপর হওয়া সেসকল কঠোরতাকে ভুলতে পারছিল না। বিনইয়ামিন পরবর্তীতে সোয়াত উপত্যকার তালেবানের প্রভাবশালী কমান্ডার হয়েছিল।

আরেকজন ব্যক্তি যিনি মাজহারের বিপরীতে পাকিস্তানি নেতৃত্বের বিরোধিতা করার রাস্তা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন কমান্ডার মুহাম্মাদ ইলিয়াস কাশ্মীরি। তাঁর নাম শুনলে এখনও ভারতের সামরিক বাহিনীর নেতারা ভয়ে কাঁপে। নতুন কমান্ডার হিসেবে দুনিয়ার সমস্ত গেরিলা কমান্ডারদের মধ্যেও কেউ এতটা সফলতা লাভ করেনি, যতটা তিনি

অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রাক্তন রেকর্ড এবং আল-কায়েদার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য আল-কায়েদা নেতৃত্বকে অনেক প্রভাবিত করেছিল। ফলে খুব শীঘ্রই তিনি আল-কায়েদার শুরার সদস্য হয়ে যান। এবং পরবর্তীতে জিহাদি অপারেশনের দায়িত্ব তাঁকে সোপর্দ করা হয়। এটা আল-কায়েদার ইতিহাসে এক নতুন টার্নিং পয়েন্ট ছিল। তখনই আল-কায়েদা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। কমান্ডার ইলিয়াস কাশ্মীরি, জিয়াউর রহমান এবং সিরাজউদ্দিন হাক্কানির মতো কমান্ডারদেরকে একত্রিত করে শ্যাডো আর্মির সংগঠন গড়ে তোলেন। আল-কায়েদার উর্বর মস্তিষ্ক মেজর হারুণ এবং জিয়াউর রহমানের মতো মানুষেরা শ্যাডো আর্মির সদস্য ছিলেন। এটা আফগান যুদ্ধের নতুন এক পর্যায়ের সূচনা ছিল। এই উত্থান ঠেকাতে পশ্চিমা জোট বাহিনী প্রস্তুত ছিল এবং তাদের হাজার হাজার সৈন্য জড়ো হচ্ছিল। এই পর্যায়ে ভারতও পশ্চিমা জোটের সহযোগিতা করতে লাগলো। এই সময়েই ভারতের পক্ষ থেকে পশ্চিমা জোটের অধীনে পাকিস্তানি যোদ্ধাদের (জঙ্গি) বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আল-কায়েদার আরব্য রজনীর এক নতুন দাস্তানের সূচনা হলো। এই পর্যায়ে যদিও আফগানিস্তানই কেন্দ্রীয় ময়দান ছিল। তবে আল-কায়েদা পশ্চিমা শক্তি ধ্বংস করার জন্য আরও নতুন কিছু ময়দান তৈরি এবং ইরাকে উত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। ২০০৮-এবং ২০০৯-এ শ্যাডো আর্মি আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে তালেবানের সফলতার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। তা সত্ত্বেও আল-কায়েদা পরবর্তীতে আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ময়দানে এই বাহিনীর মনোযোগ সৃষ্টি করে। যাতে করে আল-কায়েদার ব্যাপক বিস্তৃত উদ্দেশ্য হাসিল করতে আদর্শিক এবং সামরিক কার্যক্রম চলতে থাকে। নতুন এই কাঠামোতে মেজর হারুণ এবং জিয়াউর রহমানের মতো ব্যক্তিদের সহযোগিতা থাকার ফলে তালেবানের প্রতি নির্ভরশীলতার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শ্যাডো আর্মির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে তারা প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে পারতো। আর দিনশেষে বারবার তা ন্যাটোর বিরুদ্ধে তালেবানের জন্যই উপকারি প্রমাণিত হতো।

শ্যাডো আর্মি আল-কায়েদার প্রোগ্রাম এক লেভেল এগিয়ে দেয়। আল-কায়েদার পরবর্তী লক্ষ্য ছিল পুরো দুনিয়ায় ইসলামের জন্য নিবেদিত গেরিলা যোদ্ধা ও রণকৌশলী ব্যক্তিদেরকে এক ছাদের নিচে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদেরকে রক্তের (দ্বীনি) ভাই বানানো। আল-কায়েদার শেষ লক্ষ্য ছিল, স্থানীয় মুসলিমদের বিদ্রোহী আন্দোলনগুলোর

ওপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেন আঞ্চলিক জিহাদি এজেন্ডাগুলো আল-কায়েদার আন্তর্জাতিক পলিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। সেই দলগুলোর মাঝে তালেবান, ইরাকি এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পাশাপাশি আল-কায়েদা চাইছিল পাকিস্তান, সৌদি আরব, জর্ডান, মিশরের মতো রাষ্ট্রের ওপর শ্যাডো আর্মির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে, যেন তারা পশ্চিমাদেরকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে।

ওবামা প্রশাসন এই পরিস্থিতির ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ ছিল। তারা কেবল আফগানিস্তানের দিকেই মনোযোগী ছিল এবং আরও ত্রিশ হাজার অতিরিক্ত সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে মোতায়ন করলো। আমেরিকা আল-কায়েদা এবং তালেবানকে খতম করার জন্য তাদের জোটকেও অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর জন্য আহ্বান জানালো। যখন ওবামা প্রশাসন (স্রেফ আফগানিস্তানে) নতুন পলিসি কার্যকর করার পদক্ষেপ নিচ্ছিল, তখন আল-কায়েদা পুরো ন্যাটোকে মোকাবেলা করার জন্য ইতোমধ্যেই নতুন নতুন ময়দান খুঁজে নিয়েছিল। আল-কায়েদা তার শ্যাডো সোলজারদের মাধ্যমে আমেরিকার মোকাবিলা করার জন্য ইয়েমেন এবং সোমালিয়ার ময়দানে পৌঁছে গিয়েছিল।

সোমালিয়া ও ইয়েমেন: আল-কায়েদার ভাই

সোমালি জিহাদি ওয়েবসাইটে [64] প্রকাশিত একটি বিবৃতি:

'আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন প্রিয় শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বিকে, যিনি ভাইদেরকে সোমালিয়ার জলে-স্থলে হামলা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন -

> *"সামুদ্রিক গনিমতও জায়েজ। এবং তা স্থল যুদ্ধে অর্জনকৃত গনিমতের মতোই ভাগ করা যায়। আধুনিক যুগে সামুদ্রিক গনিমত অনেক বেশি এবং বরকতময়। আর এর ওপর হামলা করা বেশ উপভোগ্যও বটে। কুফফারদের একটি সামুদ্রিক জাহাজ দখল করে যে পরিমাণ সম্পদ অর্জন করা যায়, তা এক ডজন স্থল হামলায় প্রাপ্ত সম্পদের চেয়েও অধিক।*
>
> *বর্তমানে জাহাজ এতই বড় বড় যে, তার আয়তন একটি গ্রামের মতো। এগুলোতে অনেক মূল্যবান সামগ্রী থাকে। যেগুলো দিয়ে লোকেরা অনেক উপকৃত হতে পারে। এজন্য কাফিররা একটি জাহাজ ফেরত নেওয়ার জন্য কোটি অঙ্কের অর্থ বিনিময় দিতেও প্রস্তুত থাকে।*
>
> *আমার মতামত হলো, সেসব গনিমতের মালের সবচেয়ে বেশি হকদার ও মুখাপেক্ষী মুজাহিদরাই। তাদের মধ্যে অধিকাংশই এই বিষয়ে চিন্তিত যে, তাঁদের কাছে খরচ করার মতো কোনো অর্থ নেই।" '*

এই ছিল আল-কায়েদার সোমালিয়া ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা। ২০০৪ সাল পর্যন্ত সোমালিয়ায় আল-কায়েদার অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। কিন্তু যখন তারা পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতা (নিজেদের অর্থনৈতিক ও জনশক্তি ব্যবহারের পরিবর্তে স্থানীয় ইসলামপন্থীদেরকে নিজেদের আপন করে নেওয়া) সেখানেও প্রয়োগ করলো, তখন সোমালিয়াতেও তাদের অবস্থান মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে গেল। এর দ্বারা আফগানিস্তানে তালেবান আর আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পশ্চিমা জোটের ওপর অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি হলো। কেননা ইউরোপ থেকে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

---

64. সাইটটি ছিল http://www.alqimmah.net। পরবর্তীতে সাইটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সোমালিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিও আল-কায়েদাকে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে অনেক সাহায্য করেছে। এর মাঝে অন্যতম ছিল — আফগানিস্তানের তালেবানের পদ্ধতিতে শরীয়াহ কোর্ট ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ, ছয় মাসের মধ্যেই তার বিলুপ্তি। এবং এর পরবর্তীতে, দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া বিশৃঙ্খলা ও ইথিওপিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি।

বাস্তবতা হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট ইউনিয়নের কিছু কাল পরেই আল-কায়েদা সোমালিয়ায় নিজেদের শাখা খোলার জন্য 'লস্করে যিল'-কে কাজে লাগিয়েছিল। যখন ২০০৬ সালের শেষের দিকে আই সি ইউ সরকারের পতনের পরে সোমালিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হলো, তখন 'লস্করে যিল'-এর নেতা ইলিয়াস কাশ্মীরি এবং ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদার পথপ্রদর্শক সালাহ সোমালি এই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা নির্মূল করতে 'হারাকাতুশ শাবাব আল-ইসলামি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল-কায়েদা এই বিষয়টা নিশ্চিত করেছিল যে, 'হারাকাতুশ শাবাব' নামে নবপ্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের কয়েকশত যুবক সোমালিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক অপারেশন পরিচালনা করবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল - এশিয়া থেকে ইউরোপগামী পশ্চিমাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের রাস্তা কেটে দেওয়া।

ঐ বছরেই আল-কায়েদা ইয়েমেনে নিজেদেরকে পুনঃসংগঠিত করে। এখানেও লস্করে যিল এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্তরালে কাজ করেছিল। এবার লস্করে যিলের মাধ্যমে আল-কায়েদা একত্রিত করেছে ইরাক, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশের যোদ্ধাদেরকে। যেন ইয়েমেনে নিজেদেরকে পুনঃসংগঠিত করতে পারে। আল-কায়েদার বিস্তৃত টার্গেটের জন্য ইয়েমেন ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভৌগোলিক অবস্থান। কেননা, এটা আরববিশ্বের 'স্ট্র্যাটেজিক কেন্দ্র' হিসেবে বিবেচিত।

এছাড়া আল-কায়েদার জন্য ইরাকি এবং ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি ছিল। তাই আল-কায়েদা সৌদি আরব, জর্ডান আর মিশরেও পাকিস্তানের পদ্ধতিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ সেসকল দেশ যেন আমেরিকাকে সহায়তা করা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আর এই সমস্ত অঞ্চলে নিজেদের নেটওয়ার্ক মজবুত করতে হবে। আসলে ইয়েমেন এবং সোমালিয়ায় মজবুত অবস্থান তৈরি করা ঘুরেফিরে আল-কায়েদার আফগানিস্তান যুদ্ধের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।

১২ই জুন নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা এক আমেরিকান মুখপাত্রের একটি বক্তব্য প্রকাশ করে যে, আল-কায়েদার সদস্যরা পাকিস্তান থেকে সোমালিয়া এবং ইয়েমেনে

স্থানান্তরিত হচ্ছে। ওয়াশিংটন এই কারণে ভীত যে, লোহিত সাগরের উপকূলীয় দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। আল-কায়েদার সামরিক লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে এটা ছিল একটি অকাট্য রিপোর্ট।

সোমালিয়া এবং ইয়েমেন অবস্থিত লোহিত সাগরের দক্ষিণ অংশের ‘বাব আল-মানদাব স্ট্রেইট’-এ, যা উপসাগরীয় দেশ এবং পশ্চিমা দেশগুলোর মাঝে তেল বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় রুট (পথ)। এডেন উপসাগরে সোমালি যোদ্ধা জলদস্যুদের লুটতরাজের কারণে এই অঞ্চলে আল-কায়েদার ক্রমবর্ধমান রিজার্ভেশন নষ্ট হয়ে যায়।

সৌদি গবেষক মাঈ ইয়ামানির মতে, ইয়েমেন কেবল সৌদি আরবই নয় বরং পুরো দুনিয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। কেননা এটাই একমাত্র জায়গা, যেখান থেকে কোনো সংকীর্ণতা ছাড়াই তেল সরাসরি সমুদ্র পর্যন্ত নেওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে, এই রাস্তা বিপদজ্জনক হওয়ার অর্থ পুরো বিশ্বের অর্থনীতি আশঙ্কায় পড়ে যাওয়া।

এই কার্যক্রম মূলত আল-কায়েদার আফগানিস্তানে বিজয় অর্জন করার জন্য পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে যাওয়া ন্যাটো সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়ার কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে তুফান সৃষ্টি করে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে পশ্চিমাদেরকে পরাজিত করতে চায়।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়েমেন ছিল আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের মধ্যবর্তী গোত্রীয় অঞ্চলের মতো আরববিশ্বের হৃদয়। আর রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের গোত্রীয় অধিবাসীদের মতো এখানকার অধিবাসীরাও ১৯৮০ সালের আফগান জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। এজন্য এটা আল-কায়েদার জন্য মধ্যপ্রাচ্যীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পরিণত হয়। লস্করে যিল এখানে নিজেদের অভিজ্ঞ একটি দল প্রেরণ করে, যেন ‘আবনায়ে ওয়াতান’ (অর্থাৎ স্থানীয় মানুষ, যারা আল-কায়েদার সাথে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু মুজাহিদ যোদ্ধা, তাদেরকে আল-কায়েদার রক্তের ভাইয়ে পরিণত করার) পলিসিকে দ্বিতীয়বারের মতো কার্যকর করা যায়। লড়াই শুরু করার জন্য জমিন পূর্ণ প্রস্তুত ছিল।

৯/১১-এর পূর্বে আল-কায়েদার সমস্ত বড় বড় অপারেশন ইয়েমেন থেকেই পরিচালিত হয়েছিল। ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকান সামুদ্রিক জাহাজের বহর ‘ইউএস কোল’-এর উপরে হামলা, অপারেশন ‘ব্ল্যাক হক ডাউন’-এর জন্য রসদ সরবরাহ ও

প্রস্তুতি, ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ায় আমেরিকার সৈন্যদের হত্যা, ২০০২ সালে কেনিয়া ও মাম্বাসায় ইহুদিদের সম্পত্তির ওপর হামলা, ২০০৩ সালে সৌদি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা — এই সমস্ত অপারেশনই ইয়েমেন থেকে করা হয়েছিল। তাই আফগানিস্তান আর পাকিস্তানে আল-কায়েদার অবস্থান মজবুত হতে যেখানে পাঁচ বছর সময় লেগেছে, সেখানে আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল - সোমালিয়া ও ইয়েমেনে তাদের কাজের ফল পেতে দুই এক বছরের বেশি সময় লাগবে না।

আর তাদের এই বিশ্বাসও ছিল যে, এই সকল কার্যক্রমের তাৎক্ষণিক ফলাফল আফগানিস্তানে পাওয়া যাবে। এসব অঞ্চলে রাজনৈতিক এবং সামরিক অবরোধের পরে আফগানে পশ্চিমা দলগুলোর টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। রসদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরে তারা লোহিত সাগরের দিক থেকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আর এভাবেই পশ্চিমাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে।

পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল, ২০১২ সাল পর্যন্ত এদিকে কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকবে। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই সময়ের মধ্যেই তারা মধ্যপ্রাচ্যের শেষ জামানার লড়াইয়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন কালিমায়ে তাইয়্যেবা খচিত কালো পতাকা উড়িয়ে; আফগান, আরব ও মধ্যএশিয়ার মুসলিম গোত্রগুলো পাহাড় থেকে নেমে এসে প্রত্যাশিত বিজয়ের ঘোষণা দিবে। অতঃপর তারা সেখান থেকে মাহদি ও প্রতিশ্রুত ঈসা মাসিহের নেতৃত্বে এক সর্ব যুদ্ধের সূচনা করবে। এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যুদ্ধের জন্য পশ্চিমা বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এভাবেই বিশ্বব্যাপী ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দাজ্জালকে পরাজিত করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ঈমান ও কুফরের বিভাজন

- এমন মুসলিম শাসক, যে কিনা কোনো মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে অন্য কোনো কাফির শাসকের (ইসলাম বিরোধী) নীতির সাহায্য সহযোগিতা করে, সে কি ইসলামি আকিদার দৃষ্টিতে মুসলিম থাকে? নাকি সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়?

- ঐ সেনাবাহিনী কি মুসলিম, যারা কিনা জন্মসূত্রে মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে গঠিত, কিন্তু তারা সেই মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে জুলুমরত, যারা কাফির সেনাবাহিনীর হামলা-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত?

- মুসলিম জনসাধারণ, যারা মুসলিমদের খিলাফাতের রাজনৈতিক নীতিমালাকে অস্বীকার করে, তার বিপরীতে পশ্চিমা লিবারেল গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সোশ্যালিজম, কিংবা মানবরচিত অন্য কোনো ব্যবস্থার আনুগত্য করে, এমতাবস্থায় কি তারা মুসলিম থাকে? কিংবা কোনো কুফরি শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেওয়ার পরও কি সে ইসলামি আকিদার ওপর থাকে?

- সেই মুসলিমরা, যারা ইসলামি জীবনব্যবস্থা ত্যাগ করে পশ্চিমা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করে, তারা কি মুসলিম থাকে, নাকি কাফির হয়ে যায়?

বিগত বিশ বছরে বেশ কয়েকবারই এমন লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে, যাতে এই প্রশ্নগুলোর ওপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। এই ব্যাপারগুলোর বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই ফলাফলে পৌঁছেছেন যে, নিজেদের মুসলিম দাবি করা অনেকেই আসলে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

এটা স্রেফ কোনো ইলমি (জ্ঞানতাত্ত্বিক) আলোচনা বা কোনো দলান্ধ মৌলভীর সাধারণ গবেষণার ফল নয়। বরং যুগ যুগ ধরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রতিষ্ঠিত আকিদাহ। আর এটাই হলো মূলত আল-কায়েদার দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি, যা আজকের বিশ্বকেও ঈমান ও কুফরের দুটি সুস্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত করতে এবং ভবিষ্যতে এই চিন্তাকে কার্যকর করতে চাইছিল। এই আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং এর থেকে গৃহীত ফলাফল খিলাফাতের পতন পরবর্তী সময়ে সালাফগণের (পূর্ববর্তী আলেমগণের)

কিতাবপত্র পুনরায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছিল। আর আফগানিস্তানে রুশদের আগমনের পর আফগানিস্তানে লড়াইয়ে যাওয়া যোদ্ধারা পৃথিবীর সকল অধিকৃত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকেই পশ্চিমাদের উপস্থিতি ও তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এবং ইসলামি খিলাফাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের আন্দোলন হিসেবে 'কায়েদাতুল জিহাদ' বা 'আল-কায়েদা' প্রতিষ্ঠা করে।

এতদসত্ত্বেও তাদের এই ধারণা হলো যে, পশ্চিমাদের প্রভাবশালী পদ্ধতির মোকাবিলার সাথে আবশ্যক হলো, নতুন মুসলিম শাসকদের সামগ্রিক কাজ, চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তারা কি মুসলিম নাকি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে - এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা। এভাবে সত্যিকারের মুসলিম সমাজকে আল-কায়েদার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া হলো, যেন সহজলভ্য উপায় উপকরণ হাতে নিয়েই মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব কাজকর্মে পূর্ণ স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা যায়।

এই আদর্শিক প্রচারণার মাধ্যমে আল-কায়েদা তিনটি ফলাফলের আশা করে -

১. মুসলিম শাসক, মুসলিম সেনাবাহিনী এবং মুসলিম জনগণের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যেন তারা পশ্চিমাদের আর তাদের মিত্রজোটের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এবং এর মাধ্যমে ইসলামি খিলাফাত প্রতিষ্ঠা, অধিকৃত মুসলিম ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ও ইসলামপ্রিয় লোকদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

২. মুসলিম সমাজের এই ধরনের মেরুকরণ তৈরি করা, যেন সেসব দেশের শাসকবর্গ কর্তৃক ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বাহিনীর সহায়তা এই পরিমাণ দুর্বল হয়ে যায় যে, এক পর্যায়ে যেন তা প্রভাবহীন হয়ে পড়ে।

৩. মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে ইসলামের উপস্থিতিকে জয়যুক্ত করা। এবং সরাসরি পশ্চিমা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সীনা টান করে দাঁড়িয়ে যাওয়া। মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা ও খিলাফাতের অধীনে ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠার কাজ করা।

এই তিনটি ফলাফলের যেকোনো একটি আল-কায়েদার গ্রহণ করার মতো ছিল। আল-কায়েদা মুসলিম দেশেগুলো এবং মুসলিম সমাজসমূহে সত্যিকার মুসলিমদের শনাক্তকরণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিকে সামনে নিয়ে আসে।

৬৬১ হিজরির পর থেকে 'ইসলামি খিলাফাত' আদতে নেতৃত্বের বদলে এক নামকা ওয়াস্তে খিলাফাতে পরিণত হয়েছিল। তবুও সর্বশেষ উসমানি খলিফা পর্যন্ত খিলাফাতের উপস্থিতি মুসলিমদের সামগ্রিক ফায়দা, বিশেষ করে মুসলিম ভূমি প্রতিরক্ষার জন্য মুসলিমদের একতাবদ্ধ রেখেছিল। খিলাফাতের পতনের পর পশ্চিমারা ব্যাপকহারে মুসলিমদের ভূমিগুলোতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। যদিও পরবর্তীতে সেগুলো আবার স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু তাদের শাসনব্যবস্থা রয়ে গিয়েছে পশ্চিমাদের আদলেই। আর তাদের পররাষ্ট্রনীতি নিয়োজিত থেকেছে পশ্চিমাদের স্বার্থ সংরক্ষণে।

যদিও অধিকাংশ আরবরা খিলাফাতে উসমানির পতনে খুশি হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশদের অধীন হিন্দুস্তান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র খিলাফাতে উসমানির পতনে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। সেসময় ড. মুহাম্মাদ ইকবাল সেই নগণ্য সংখ্যক মানুষদের একজন ছিলেন, যারা নিজেদের কবিতা ও লেখনীর মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে জাগরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলিমরা একক একটি জাতি, এবং তাদেরকে বিদেশি দখলদারের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। ড. ইকবাল নয়া মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে পশ্চিমা গণতন্ত্রেরও বিরোধী ছিলেন। মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন এবং দক্ষিণ এশিয়াতে জামায়াতে ইসলামি ধারাবাহিকভাবে ১৯২০ হতে ১৯৩০ পর্যন্ত ইকবালের চিন্তাধারার প্রচার প্রসার করেছিল।

এভাবে যখন কয়েকটা মুসলিমপ্রধান দেশ খিলাফাতে উসমানি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে যায়, তখন ইসলামের ব্যাপারে তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তবে সেসকল প্রশ্ন আল-কায়েদার 'কুফর হওয়ার' মতামতের তুলনায় শিথিল পর্যায়ের ছিল। সমকালীন সময়ের অন্যতম ইসলামি ব্যক্তিত্ব জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মওদুদী ফাতওয়া দিয়েছিলেন, *"যদি কোনো মুসলিম সমাজ জেনে বুঝে শরীয়াহ (ইসলামি জীবনব্যবস্থা) কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নিজেরাই আইনকানুন তৈরি করে, অথবা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো মানবরচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এমন সমাজ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলেছে। এবং তাদেরকে 'ইসলামি' বলার কোনো অধিকার থাকে না।"*

মাওলানা মওদুদী ও সাইয়্যেদ কুতুবের মতো ইসলামি আন্দোলনের চিন্তাবিদরা স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, মুসলিম সমাজে শরীয়াহ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে হবে। তবে তাদের বর্ণনাভঙ্গি এতটা দ্ব্যর্থহীন, কঠোর ও সংঘাতময় ছিল না।

ইতোপূর্বের ইসলামি আন্দোলনগুলো ইসলামি রাজনীতিতে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা, ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন, মুসলিম ভূমিগুলোর স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলতো। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে মিশর ইসরায়েলের মাঝে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরির ফলে মিশর, জর্ডান ও ফিলিস্তিনিদের ওপর হওয়া জুলুম মুসলিম দুনিয়াকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরপর যখন আরও কিছু মুসলিম রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করলো এবং ইসলামি আন্দোলনগুলোকে দমন করতে শুরু করলো, তখন এই অস্থিরতা আরও বাড়তে লাগলো। বিশেষ করে যখন ১৯৯০ সালে সৌদি আরব আমেরিকার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি বসলো এবং আমেরিকান সৈন্যদেরকে নিজদেশে আমন্ত্রণ জানালো, তখন সৌদি সরকার সেসব আলেমের পিছু নিয়েছিল, যারা এই চুক্তির বিরোধিতা করেছে। আর এই বিরোধপূর্ণ অবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন আমেরিকা ২০০১ সালে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের (তালেবানের ইসলামি সরকার) ওপর আক্রমণ করে। যাকে (সৌদির বেতনভোগী কিছু আলেমরা ছাড়া) অধিকাংশ উলামায়ে কেরামই ইসলামি দেশ হিসেবেই জানতেন। আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার হামলায় অনেক মুসলিম রাষ্ট্র এমনকি প্রতিবেশি পাকিস্তানও আমেরিকার সহযোগিতা করেছে। এরপর আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাকের ওপর হামলা করে। এই হামলার সময়ও আমেরিকাকে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েতের মতো মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা প্রকৃত অবস্থাকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

১৯৭৯ সালের মক্কা অবরোধের আমির জুহাইমিন ইবনু সাইফ আল-উতাইবিকে আল-কায়েদা কখনোই একজন নেতা কিংবা আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। আর না আল-কায়েদা জুহাইমিনের দাবিকৃত ‘মাহদি’ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-কাহতানিকে সত্যিকার মাহদি হিসেবে মেনে নিয়েছে। (কিন্তু তার সৌদি শাসন বিরোধিতার শারঈ এবং ঐতিহাসিক দলিল ছিল) হযরত হুসাইন ইবনু আলি ﵁ সর্বপ্রথম উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, যখন ইয়াজিদ মুসলিমদের সন্তুষ্টির বিপরীতে গিয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে খিলাফাত দখল করে নিয়েছিল। উমাইয়া এবং আব্বাসি খিলাফাতের সময়ও বিদ্রোহ চলমান ছিল। কিন্তু সেগুলো হুকুমতের পতন ঘটাতে ব্যর্থ হতে থাকে।

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ আধুনিক যুগে মুসলিম সরকারগুলোর সাথে পশ্চিমাদের সম্পর্ক এবং জোটকে খতম করার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। পশ্চিমা শিক্ষা সংস্কৃতি এবং ইসলামি বিশ্বের ওপর তাদের প্রভাব আল-কায়েদাকে ধাবিত করে একটি শক্তিশালী

মুসলিম বাহিনী গঠনের প্রতি ধাবিত করে। তাদের মতে, খিলাফাতে উসমানির পরে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সরকারগুলো পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষায় অগ্রগামী মোর্চার ভূমিকা পালন করছে। তাই এগুলোর পতন আবশ্যক। ফলস্বরূপ আল-কায়েদা এমন এক জাঁদরেল পদ্ধতি উদ্ভাবন করলো, যা পরবর্তীতে শেষ জামানার লড়াইয়ের জন্য আবশ্যক অবস্থা তৈরি করে দিয়েছে।

(লেখকের ধারণা) মক্কা অবরোধের জের ধরে মিশরীয় ক্যাম্পগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয় অনৈতিকতা, অনৈসলামিক রীতি, পশ্চিমা সরকারগুলোর সাথে জোট গঠনের মতো সমস্যাগুলোর তাৎক্ষণিক বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে। তবে পাশাপাশি আরব যোদ্ধারা বিভিন্ন দিক থেকে জুহাইমিনের ওপর আপত্তি তুলতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তারা আবদুল্লাহ আল কাহতানিকে 'মাহদি' বানানোর ব্যাপারে জুহাইমিনের ওপর আপত্তি তুলেছিল এবং তার ন্যাক্কারজনক অপারেশনের ওপরও আপত্তি করেছিল। [65]

---

65. ১৯৭৯ থেকে ৯/১১-এর ঘটনায় জোর করে যোগসূত্রতা আনতে গিয়ে লেখক একাধিকবার মক্কা অবরোধের ঘটনাকে আফগান মুজাহিদদের চিন্তাচেতনার সাথ জড়িয়ে ফেলেছেন। অথচ আল-কায়েদা, তালেবান বা কোনো মুজাহিদ দলই মক্কা অবরোধের ঘটনার বৈধতা দেন নাই, যা লেখক আগের একটি প্যারায় এবং এই প্যারাতেও স্বীকার করেছেন।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদের শরিয়াহ দিয়ে শাসন না করার ফলে মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপার তাতারদের সময়েই আসা ফিতনাহে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবনুল কায়্যিম এবং ইমাম ইবনু কাসিরের অবস্থান থেকেই মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। সাইয়্যেদ কুতুবের মতো ইসলামি বিশেষজ্ঞ সেই একই ফাতওয়া সেসময়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেখিয়েছিলেন।

এমনকি ইমাম আবদুল্লাহ আযযামও তাঁর খুতবাহ সমগ্র 'তাফসিরে সূরাহ তাওবাহ'-তে কয়েক জায়গায় এই ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। তাতারি এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার ব্যাপার লেখক পরবর্তীতে নিজেই আলোচনা করেছন। মোদ্দাকথা হলো, এইসব প্রতিষ্ঠিত আকিদাহ ইসলামি আন্দোলনগুলো আগ থেকেই ধারণ করতো। মোদ্দাকথা, আফগানের মুজাহিদদেরও এহেন চিন্তাভাবনাগুলো আদৌ কেবল মক্কা অবরোধের জের ধরে ছিল না।

আফগানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ সমাপ্ত হওয়ার পর আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা হলে সৌদি আরব, পাকিস্তান সহ অন্যান্য মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোর পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াহ আইন দিয়ে শাসন না করা এবং কাফিরদেরকে সহায়তা করার কারণে মুরতাদ হওয়ার প্রসঙ্গ আরেকবার সামনে আসে। তখন সেইসব দেশের শাসকপন্থী আলেমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হওয়া মুজাহিদদেরকে খারেজি তকমা লাগিয়ে দেয় এবং জুহাইমিনের মক্কা অবরোধের ঘটনা টেনে এনে উদাহরণ দেওয়া শুরু করে। এভাবেই মূলত আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা মুজাহিদদের সাথে মক্কা অবরোধের ঘটনাকে মিলিয়ে উপস্থাপনার সূচনা হয়।

খিলাফাতের পতনের পরে মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমাদের মাঝে ফিলিস্তিন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ চলছিল। ইসলামে হিজাজ ভূমির পর ফিলিস্তিন পবিত্র ভূমি। সেজন্য পুরো মুসলিম বিশ্বের জন্যই ফিলিস্তিনের সংকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক মুসলিম সংস্থা, বিশেষ করে মুতামির আলমে ইসলামি, রাবেতায়ে আলমে ইসলামি, ইসলামি রাষ্ট্রের তানজিমে খিলাফাতের গুরুত্ব পেয়েছে। ফিলিস্তিন সংকটকে কেন্দ্র করে আরব সরকারগুলোর পক্ষ থেকে নেওয়া রাজনৈতিক এবং সামরিক পলিসির ওপর ইসলামি মুজাহিদদের সর্বদা আপত্তি ছিল। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের কারণও ছিল এই চাটুকার শাসকরা। তাছাড়া মিশর এবং ইসরায়েলের মাঝে নিরাপত্তা চুক্তি একটি দুঃখজনক এবং ক্রোধের বিষয় ছিল। আফগানের মুজাহিদরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারগুলোকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে সেসব সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অতঃপর তারা এই শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পাল্টা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের শাসকবৃন্দ ও মুজাহিদদের মধ্যকার সংঘাতের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। মিশরে ইসরায়েলের সাথে চুক্তি এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের পরে বিদ্রোহের এক নয়া জোয়ার ওঠে। এটা কেবল কয়েকটা মারাত্মক ঘটনার ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল না। Egyptian Islamic Jihad গ্রুপ ইসরায়েলের সাথে নিরাপত্তা চুক্তির কারণে আনওয়ার সাদাতকে মুরতাদ ঘোষণা করেছিল এবং তাকে হটানোর জন্য একটি দলও তৈরি করেছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, কায়রোর কয়েকটা এলাকা দখল করে আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করার কথা ছিল। বিভিন্ন গ্রুপকে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহের পূর্বেই সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে হাজার হাজার মুজাহিদ গ্রেপ্তার হয়। এতদসত্ত্বেও খালিদ ইস্তাম্বুলির নেতৃত্বে একটি গোপন দল সেনাবাহিনীর প্যারেডে আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে ফেলেছিল।

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইসলামি বিশ্বে দ্বন্দ্ব সংঘাত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর অধিকাংশ শাসকরা ছিল জাতীয়তাবাদী আরব বাদশাহরা, যারা পশ্চিমা পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট ছিল। সামগ্রিকভাবে নিজেদের দুর্নীতি অনিয়মের কারণে তারা জনসমর্থন হারানোর পথে ছিল। এই সুযোগে ওইসব মুসলিম গ্রুপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, যাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে এবং কিছু ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়াতেও খারাপ চোখে দেখা হতো। ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দ সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত ইত্যাদির নির্বাসিত ছিলেন এবং তার সদস্যরা, যারা বিভিন্ন পেশায় অভিজ্ঞ; যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ও শিক্ষাবিদ ছিলেন, তারা দক্ষিণ আমেরিকা

ও ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামি জাগরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন।

১৯৮৯ সালে ইসলামি যোদ্ধারা দ্রুততার সাথে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছিলেন এবং পাকিস্তানের ইসলামপন্থী প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসি দিয়ে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। জেনারেল জিয়াউল হক দেশব্যাপী ইসলামের প্রসার ঘটান এবং কট্টরপন্থী ইসলামি গ্রুপগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাকিস্তান রুশ বিরোধী যোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। তিনি দেশে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইখওয়ান সম্পৃক্ত আলেম ও শিক্ষাবিদদের সেখানে আমন্ত্রণ করেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ফিলিস্তিনি ড. আবদুল্লাহ আযযাম, যিনি পরবর্তীতে আফগানিস্তান যুদ্ধে আরব যুবকদের রিক্রুটিং ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণের জন্য ‘মাকতাবুল ফিকির’ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইখওয়ান, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন, বার্মা ও ফিলিপাইনের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত যুবকরা সেই আন্তর্জাতিক ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। মূলত তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ড. আবদুল্লাহ আযযাম ও অন্যান্য উস্তাদদের সান্নিধ্যে এসে পশ্চিমা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। ইসলামি ইউনিভার্সিটি থেকে এই ছাত্ররা পেশোয়ারের ‘মাকতাবুল ফিকির’ হয়ে আফগানিস্তান চলে যেত। এভাবে হাজারো মুসলিম যুবক যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিতা, এবং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন চিন্তাচেতনা ও চেষ্টা সংগ্রামকে পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ করার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অর্জন করেছিল। এই বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিবেশ বিপ্লবী মুসলিমদের নতুন প্রজন্মের উত্থান ঘটায়।

এর ওপর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কিছু ঘটনাবলি, যা যোদ্ধাদের মুসলিম শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দলিলসমূহকে আরও শক্তিশালী করে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ ঘটনা ছিল, ইরাকের কুয়েত আক্রমণ, যা জ্বলন্ত আগুনে তেল ঢেলে দিয়েছিল। সৌদি আরব তখন ইরাকের আক্রমণের ভয়ে আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করে এবং দেশে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে অবস্থানের সুযোগ দেয়। সমস্ত ছোট ছোট আরব রাষ্ট্র কুয়েত এবং জর্ডানসহ আমেরিকার ইরাক আক্রমণ ও তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধকে জোর সহায়তা দেয়। ৯/১১-এর পর আফগানিস্তানে আমেরিকার আক্রমণে পাকিস্তান সহায়তা করে। এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র ও আফগানিস্তানের মুজাহিদদের দূরত্ব বাড়তেই থাকে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে পরাজিত হয় এবং ১৯৮৯ সালে তার সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। যাওয়ার সময় তারা এক দুর্বল কমিউনিস্ট সরকার রেখে যায়, যার ১৯৯০-এর সূচনালগ্নেই পতন হয়। এরপর যোদ্ধারা ক্ষমতা লাভ করে। মুসলিমদের সবগুলো বিপ্লবী গ্রুপ তখন প্রতীক্ষায় ছিল যে, এখন কি হবে। বৈশ্বিক পরিবেশ ইসলামি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল।

১৯৮৭ সালে এক নতুন বিপ্লবী দল হামাসের প্রতিষ্ঠা হয়। তা ইসলামের পতাকাতলে ফিলিস্তিনের সবগুলো ইসলামি দলকে নতুন প্রাণসঞ্চার করে। ১৯৮৯-এর পরবর্তী সময়ে আফগান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধারা অধিকৃত কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে দেয়। আফগানিস্তান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আবু সাইয়াফ ফিলিপাইন গিয়ে ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দেয়। চেচনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও আফগানিস্তান থেকে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলে। এভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বার্মা ও ইরিত্রিয়া গিয়ে সবুজ পতাকা উত্তোলন করে। হাজারো যুবক পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা জালের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নব্য স্বাধীনতা লাভ করা মুসলিম ভূখন্ডে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ইউরোপীয় ছাত্রদের আনাগোনা বেড়ে যায়। মধ্যএশিয়ার মতো দেশগুলোতে হিজবুত তাহরিরের মতো গ্রুপের উত্থান ঘটে।

পাকিস্তান, যা ইতোপূর্বে রুশ বিরোধী আফগান যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিক ময়দান ছিল, ইসলামপন্থার নতুন জোয়ারে তা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। পাকিস্তানের ইসলামি মাদ্রাসাগুলো ঐতিহ্যবাহী ধারার ছিল। কিন্তু এই নতুন জোয়ার ছাত্রদের মধ্যে এক নতুন প্রজন্মের জন্ম দিল। এই ছাত্রদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুযোগ হয়েছিল এবং তাদের রক্ত ছিল গরম। এই ছাত্ররাই পরবর্তীতে এসব মাদ্রাসার শিক্ষক হয় এবং এই মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা দীক্ষার সাথে সাথে জিহাদি জযবার ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এর একটি দৃষ্টান্ত ছিল করাচির বিন্নুরী টাউনের জামিয়া ইসলামিয়া। বিন্নুরী টাউন দেওবন্দি ঘরানার একটি প্রসিদ্ধ ইসলামি বিদ্যাপীঠ ছিল। এখান থেকে অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ ও আলেম এসেছেন। এমনকি ১৯৯০-এ এসব মাদ্রাসায় জিহাদি চিন্তাধারা একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। এমন হয়নি যে, মাদ্রাসার সিলেবাস পরিবর্তন হয়েছে। বরং এসব মাদ্রাসার ছাত্ররা আফগানযুদ্ধের সময় সেখানে গিয়ে লড়াই করেছিল এবং সেখানকার জিহাদি চিন্তাধারার মাদ্রাসাগুলোর ছাত্রদের সাথে থেকে এই চিন্তাকে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এই ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীতে বিন্নুরী টাউনের শিক্ষক হয় এবং সেখানের ছাত্রদেরকে

নিজেদের রঙে রাঙিয়ে নেয়। যেমন মুফতি নিজামউদ্দিন শামযাঈ এই মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে আগমন করেন এবং পুরো মাদ্রাসার পরিবেশ একদম বদলে দিয়ে তাকে একটি জিহাদি ঘাঁটিতে পরিণত করেন। ২০০৪-এ মুফতি নিজামউদ্দিন শামযাঈয়ের শাহাদাতের পর এই মাদ্রাসা আবার আগের মতো কেবল শিক্ষার্জনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। জামিয়া ফারুকিয়া করাচি ও আকুড়াখাট্টাকের ইতিহাসও এর চেয়ে ভিন্ন নয়।

১৯৯৪ পর্যন্ত ইসলামি মাদ্রাসাগুলোর আফগান ছাত্ররা বিভিন্ন আফগান যুদ্ধবাজ নেতা এবং তাদের অসাধুতার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। ১৯৯৬ পর্যন্ত তারা ইমারাতে ইসলামিয়ার পতাকা উত্তোলন করে রেখেছিল। এর দ্বারা পাকিস্তানের মসজিদ মাদ্রাসাগুলোয় বিপ্লবীদের কার্যক্রম বেড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এই সব ঘটনা আল-কায়েদাকে সরাসরি বিশেষ কোনো ফায়দা দেয়নি। যদিও আল-কায়েদা তা থেকে ফায়দা আদায় করতে পারতো।

এক পর্যায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব কঠোরতা দেখায় এবং তালেবানের ওপর ও তাদের কাবুল সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে। অতঃপর পাকিস্তানি সেনা নেতৃত্ব মাদ্রাসাগুলোর সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে দেয় এবং গোয়েন্দা সংস্থা ISI জিহাদি সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের শক্তিকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করে। পাকিস্তানি নেতৃত্ব আফগানিস্তানকে তাদের কৌশলগত ভূমি হিসেবে ব্যবহার করে এবং নিজেদের রাষ্ট্রীয় সিক্রেট এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে।

ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের সরকার, ইরানের ইসলামি সরকার, সিরিয়া সরকার, সৌদি রাজতন্ত্র, ফিলিস্তিনি ইসলামপ্রিয় জিহাদি এবং হামাসের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। আল-কায়েদার দৃষ্টিতে, ইসলামি দলগুলো আর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাসীনদের মাঝে এই লিয়াজো এবং আফগান জিহাদের পরে উন্নতি সাধনের নিমিত্তে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও ইচ্ছা মুসলিম বিশ্বের শাসকদের নিজেদের প্রভাব মজবুত করার জন্য ছিল।

১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে আল-কায়েদার সংক্ষিপ্ত একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এই নতুন ইশতেহারের ভিত্তি ছিল কুরআনি শিক্ষা, রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাদিস ও তাঁর উত্তম আদর্শ এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি। ১৪০০ বছরের উলামায়ে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরামের রায় এবং ফাতওয়াসমূহও এখানে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

এছাড়াও সেগুলোকে উসমানি খিলাফাতের পরবর্তী সমকালীন দুনিয়ার ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। ইসলামি দুনিয়ার ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, বাদশাহদের ব্যক্তিস্বার্থ, পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনাও ছিল।

মজার বিষয় হচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর ইসলামি আন্দোলনগুলোর তৈরি করা ইশতেহারের টার্গেট পাঠক ছিল শিক্ষিত যুবকরা। কিন্তু আল-কায়েদার টার্গেট পাঠক সাধারণ মানুষজন ছিল না। বরং ছিল সমাজের সেই স্তরের মুসলিমেরা, যারা আগে থেকেই প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ছিল। আল-কায়েদা সেই ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিদেরকে এই কথার ওপর আশ্বস্ত করার কাজ করেছে যে, ইসলামি বিশ্বে চলমান সমকালীন আকিদা, সরকার ব্যবস্থাপনা, পররাষ্ট্রনীতি - সবই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করতে হবে। এর সাথে সাথে এই নয়া ইশতেহারে কেবল মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মতো বুনিয়াদি তাওহিদ সম্পর্কিত বিষয়কে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। বরং সেই ইশতেহারে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর দৃষ্টিভঙ্গিকে একত্র করে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হয়েছে।

ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের একটি সত্তাগত বৈশিষ্ট্য হলো, তার কর্মকৌশল এবং চেষ্টা সাধনা সর্বদাই চেতনাসমৃদ্ধ বিপ্লবী আদর্শের রচনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। খিলাফাতে উসমানির বিলুপ্তির সময় মুহাম্মাদ আবদুহু মিসরি, সাইয়্যেদ জামালউদ্দিন আফগানি, আল্লামা ইকবালের মতো জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ 'প্যান ইসলামিজম'-এর প্রচারণার কাজ করেছিলেন, যার দ্বারা নতুন ইসলামি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তারা যে সাহিত্য নির্মাণ করে গেছেন, তাকে অবলম্বন করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর চেষ্টা সাধনার পর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে ইরানি ইনকিলাব, আফগান জিহাদের মতো ঘটনায় পরিণতি পায়। এমনিভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় মোঘলদের পতনের পর শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচনাকর্মে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিমদের সমাজিক ও রাজনৈতিক অধপতনের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়, যা সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ দেহলবীর শিখদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল।

শাহ ইসমাঈল শহীদ সেসময় শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের পূর্বে 'তাকউইয়াতুল ঈমান' রচনা করেন। এই বই ইসলামের চেতনা বিশ্বাস এবং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা তৎকালীন মুসলিম সমাজে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।

হিন্দুস্তানি মুসলিমদের সবসময় মধ্যএশিয়ার জন্য আক্রমণাত্মক ও হুমকিরূপে মনে করা হতো। মধ্যএশিয়ায় মুসলিমদের এই অবস্থান এবং অগ্রহণযোগ্যতার শুরু হয়েছিল বাদশাহ আকবরের সময়। তখন ফার্সির সাথে এক নতুন হিন্দুস্তানি ভাষা উর্দুরও প্রচলন ঘটে। উর্দুর ওপর স্থানীয় বিভিন্ন ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনিভাবে মুসলিমরা শিখ ও হিন্দুদের চাল চলনের প্রভাব ও তাদের অনেক সংস্কৃতিও গ্রহণ করে নেয়। এই প্রভাবগুলো সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের ওপর বিস্তার লাভ করে এবং হিন্দুদের ভজন, গীত ও কাওয়ালির মতো বিষয় মুসলিমদের সংস্কৃতির অংশ বনে যায়। মুসলিম ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য অধিবাসীদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার পার্থক্যরেখা বিলীন হতে থাকে।

জিহাদি আন্দোলনের নেতা শাহ ইসমাইল শহীদ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ভূমি ও প্রেক্ষাপট নির্মাণ করতে চাইছিলেন। 'তাকউইয়াতুল ঈমান' গ্রন্থে তিনি ইসলামি আকিদাকে নব আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেন এবং হিন্দুস্তানে সমাজ থেকে মুসলিমদের ভিতর প্রবেশ করা সবধরনের কুসংস্কার পরিত্যাগ করার তাগিদ দেন এবং মুসলিমদের ওপর এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে সচেষ্ট হন যে, তারা অন্যান্য সমাজ ও জাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সবসময় এক জাতিকে আরেক জাতির সামনে দাঁড়াতে বাধ্য করে। শাহ ইসমাইল শহীদ হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে ইসলামি তাওহিদের ওপর জোর দিয়ে তার মিশনকে বাস্তবায়ন করেন। এভাবে তিনি হাজার হাজার মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হন, যারা পাঞ্জাবের শিখ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

আল-কায়েদাও পূর্ববর্তী জিহাদি আন্দোলনগুলোর ব্যতিক্রম ছিল না। সাইয়্যেদ কুতুবের সাহিত্যকর্মকে আল-কায়েদা তাদের আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু শেষমেশ আল-কায়েদার চিন্তাবিদগণ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্যের আলোকে এই আকিদার ব্যাখ্যা করেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ ছিলেন তাতার-বিরোধী ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের সেনানায়ক এবং একজন ইতিহাসখ্যাত ইমাম। ইবনু তাইমিয়্যাহও তাওহিদের ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন এবং আকিদাকে নব আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি তাতারদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যবোধকে সুস্পষ্ট করেছিলেন এবং মুসলিমদেরকে বাগদাদে মঙ্গল-আধিপত্যের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তৈরি করেছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে আল-কায়েদা মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের রচনাবলি গ্রহণ করে, যেখানে ইসলামের তাওহিদি চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের রচনাবলিতে একটি ত্রুটি ছিল। তা হলো, যদিও তাঁর রচনাবলি 'ওয়ালা বারা' তথা মিত্রতা ও শত্রুতার মতো মৌলিক আকিদাহনির্ভর ছিল, কিন্তু তিনি সৌদ পরিবারের প্রচারক হওয়ার কারণে খিলাফাতে উসমানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেউ এইকথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব মুসলিম জনসাধারণকে সুফিবাদি ইসলাম, যা তাঁর মতে বিদআত ও শিরক ছিল, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে খিলাফাতে উসমানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহার করেছিলেন। এভাবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব, হয়তো নিজের অজান্তেই খিলাফাতের পতনে এবং ঔপনিবেশবাদের উত্থানে ভূমিকা রেখেছিলেন। [66]

আল-কায়েদা এমনভাবে আলোচনাকে সামনে আনলো, যেখানে ইসলামের স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য তাওহিদকে আধুনিক সেক্যুলারিজম ও শিরকি গণতন্ত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে দাঁড় করানো হলো। এই ধরনের আলোচনা পশ্চিমের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের ধারণাকে সাধারণের সামনে স্পষ্ট ও প্রসারিত করে।

ইসলামি আকিদার এরূপ আলোচনা শুরু হয়েছিল আফগানে সোভিয়েত পতনের পর। নতুন লেখালেখিতে শিরক এবং পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে দাঁড় করানো হয় তাওহিদের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যকে। সেসব আলোচনা ও রচনাকর্মের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মধ্য থাকা পশ্চিমা চিন্তাচেতনার বাস্তবতা স্পষ্ট করা। ফলে, যেসব ইতোমধ্যেই সমাজ পশ্চিমা প্রভাবিত ছিল, সেখানে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

---

66. মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের বিরুদ্ধে উসমানি খিলাফাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারটি বিশুদ্ধ নয়। ওয়াহাবি আন্দোলন পুরোপুরিভাবেই আকিদাহকেন্দ্রিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু সেই সময় সুফিবাদি রসমসমূহের পক্ষাবলম্বনকারীরা ওয়াহাবি আন্দোলনের বিরোধিতা করতে গিয়ে এইসব কথাবার্তা প্রচার করতে শুরু করে। বিরোধিতাকারীদের অন্যতম ছিল প্যান ইসলামিক আন্দোলন হিযবুত তাহরিরের নেতা আবদুল কাদিম যাল্লুম যিনি সম্ভবত সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের বিরুদ্ধে এমন দাবি তুলেছিলেন। লেখকও সম্ভবত এমন কোথাও থেকেই এই ধরনের বক্তব্য পেয়েছেন।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের অঞ্চল 'নজদ' কখনও উসমানি খিলাফাতের অধীনেই ছিল না। আর মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নিজ অঞ্চলেই কবরপূজা সহ বিভিন্ন ধরনের শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব কিংবা তাঁর আকিদাহকেন্দ্রিক ওয়াহাবি আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কখনও উসমানি খিলাফাতের বিরুদ্ধে ছিল না।

৯/১১, যা যুদ্ধের ঘোষণা করে দিয়েছিল, সে পর্যন্ত আল-কায়েদার নতুন রচনাকর্মের মাধ্যমে ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের ভিত্তি রচিত হয়ে গিয়েছিল। ৯/১১-এর ঘটনা পুরো পৃথিবীতে বিতর্ক সৃষ্টি করলো; এবং প্রাথমিকভাবে পুরো পৃথিবীকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে দিল। এক. আমেরিকান শিবির। দুই. আমেরিকা-বিরোধী শিবির। এই বিভক্তির প্রভাব মুসলিম সমাজের সেই সুশীলশ্রেণির ওপর ভালভাবে গিয়ে পড়লো, যারা ছিল দারুণ মাত্রায় পশ্চিমঘেঁষা। এই সিদ্ধান্তকর পর্যায়ের পর মুসলিমদের সাধারণ জনগণ ও সুশীলশ্রেণির মাঝে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে যায়।

আসন্ন বছরগুলোতে আল-কায়েদা আমেরিকা-বিরোধী যুদ্ধে মুসলিম প্রশাসনগুলোকে দুর্বল রাখার জন্য এই বিভক্তিকে আরও তীব্র করে দেয়। স্ট্র্যাটেজিকভাবে আল-কায়েদা সফলতার সাথেই ৯/১১-এর দিন আমেরিকার গালে এক শক্ত চপেটাঘাত করতে সক্ষম হয়। আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণ করলো, আল-কায়েদার মতে আমেরিকা তাদের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিল। তবে আল-কায়েদার এই কৌশল ব্যর্থ হয়ে যেত, যদি না তারা ৯/১১-এর পর মুসলিম সমাজের আদর্শিক দ্বন্দ্বকে তীব্র করতে পারতো।

আল-কায়েদা সামরিক বাহিনীর দ্বীনদার অফিসার, ইসলামি দল, ও মাদ্রাসার প্রভাবশালী আলেমদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই মিশনকে চালু রাখে। পাশাপাশি আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রের যোগানোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আল-কায়েদা-রচিত সাহিত্যকর্মের সাথে সম্পৃক্ত আলেমগণ একজন মুসলিমের জন্য ঈমান ও কুফরের মূলনীতি নির্ধারণ করেন। তবে দ্বান্দ্বিক অঙ্গনে অন্য অনেক মেধাই কাজ করছিল।

৯/১১-এর প্রতিউত্তরে করা আমেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আল-কায়েদা মুসলিমদের ভেতর রাজনৈতিক জনমত তৈরি করাকে নিজের লক্ষ্যে পরিণত করেছিল, তবে এই ব্যাপারেও তাদের ধারণা ছিল যে, মুসলিমদের পক্ষ থেকেও এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। কেননা মুসলিম দেশগুলো রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমের হাতের পুতুল। সৌদি আরব, জর্ডান, কুয়েত ও পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রগুলোতে তো সেটা ছিল এক সুস্পষ্ট বাস্তবতা।

আল-কায়েদা কখনও এই চিন্তা করেনি যে, আমেরিকা যদি ৯/১১-এর প্রতিশোধ আক্রমণ করে, তাহলে পশ্চিমাদের সাহায্যে না এসে মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলো নিরপেক্ষ বসে

থাকবে। আল-কায়েদা শতভাগ নিশ্চিত ছিল যে, ওয়াশিংটন আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে কিছু মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রগুলোও ওয়াশিংটনের সঙ্গ দেবে।

৯/১১-এর হামলার বিশেষ এক উদ্দেশ্যে ছিল, আমেরিকাকে আফগানিস্তানের পাতা ফাঁদে টেনে আনা। এরপর মুসলিমদের মাঝে রাজনৈতিক মতবিরোধ দেখা দিবে এবং পরিশেষে মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমা বিশ্বে মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হবে। আল-কায়েদার জানা ছিল যে আমেরিকার যুদ্ধের সরঞ্জামাদি আফগানের পাথুরে পাহাড়ি ভূমিতে নিয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু সাথে সাথে তাদের এটাও জানা ছিল যে, এটা কোনো বিজয়ের নিদর্শন নয়। পশ্চিমাদের ওপর বিজয় অর্জন করতে হলে প্রয়োজন ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী চেষ্টা সংগ্রাম, কর্মপরিকল্পনা, সফল অভিযান ও কর্মকৌশলের। আর এজন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক পরিমাণ অস্ত্রের। আর এক বিশাল পরিমাণ অস্ত্র ছিল পাশ্চাত্যের বন্ধু মুসলিম সরকারগুলোর কব্জায়।

এজন্য ৯/১১-এর হামলা এবং তার পাল্টা জবাবে আল-কায়েদার নীতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলিম সরকারগুলোর পাশ্চাত্যের সাথে রাজনৈতিক ঐক্যের সাংঘর্ষিক বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তাদের অকৃতকার্যতা প্রকাশ করে দেওয়া। যখন সত্যিই পাশ্চাত্যের সাথে সেই মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর সত্যিকারের আনুগত্য প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তখন আল-কায়েদা তাদেরকে 'তাকফির' [67] করলো। আর তারপর সামরিক বাহিনী, ইসলামি রাজনৈতিক দলসমূহ ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদেরকে সুশীলশ্রেণির বিরুদ্ধে দাওয়াহ কার্যক্রমে কাজে লাগানো হলো। এমনিভাবে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধে ওই সকল লোকদের অংশগ্রহণ সহজ হয়ে গেছে।

তাকফিরের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শক্তিকে একত্রিত করে তা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। কিন্তু আল-কায়েদা ভালোভাবেই জানতো মুসলিমপ্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা এক দীর্ঘমেয়াদী ও ক্লান্তিকর কাজ হবে। এজন্য প্রচুর পরিমাণ পান্ডিত্যের প্রয়োজন। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, ইসলামি গণজাগরণ সৃষ্টি করা হবে, এবং বিশ্বব্যাপী জিহাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামি খিলাফাত পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

---

67. 'তাকফির' অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি বা দলকে 'কাফির সাব্যস্ত করা'। এটা ঈমান ও কুফরের বুনিয়াদি মাসআলা। শারঈভাবে করা তাকফির আদৌ দোষের কিছু নয়।

বিশ্বব্যাপী খিলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা-সাধনা ১৯২০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ে করা হয়েছে, তা এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল, যেখানে ইসলামি ধারণা থেকে পাশ্চাত্যের চিন্তাচেতনাকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭০-এর পর মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে লাগলো। এর পূর্বে ইসলামি আন্দোলনের নেতা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী গণতন্ত্রকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উত্তম মাধ্যম সাব্যস্ত করেছিলেন। সাইয়্যেদ মওদুদী ধারণা ছিল ইসলামি শক্তিগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে একবার রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনে সফল হলেই তারা ইসলামি জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে মৌলিক সংস্করণ করতে পারবে। ফলে পরবর্তীতে রাজনীতিতে কেবল ইসলামপন্থীরাই অংশগ্রহণ করতে পারবে। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে নাস্তিক্যবাদের অবসান ঘটবে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনও ৭০-এর দশকে একই চিন্তা ধারণ করে। তবে কুফরে পতিত হওয়া শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ধারণাও আগে থেকেই চলে এসেছে। আফগানিস্তানে আরব মুজাহিদরা ইখওয়ানের সাইয়্যেদ কুতুবের লেখালেখি পড়ছিলেন, যার মধ্যে 'মায়ালিম ফিত-তারিক' ছিল অন্যতম। এমনিভাবে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদীর রচনাবলিও অধ্যয়নাধীন ছিল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদীর কিতাবগুলো তখনও পর্যন্ত তাদের তাওহিদের আকিদাকে মজবুত করার মাধ্যম ছিল। যোদ্ধাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য তিনি যেসকল নিয়মনীতির বর্ণনা করেছেন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তা বাস্তবায়ন করছে না। অপরদিকে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহারের লেখালেখির সাথে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় ছিল যে, এগুলো উসমানি খিলাফাতের সময় লেখা হয়েছিল। এবং বিংশ শতাব্দীতে এর রাষ্ট্রে প্রভাব অনেক কমে গিয়ছিল।

একইভাবে সাইয়্যেদ কুতুবের বিপ্লবী সাহিত্যকর্মও তাদের চিন্তার সুস্পষ্ট ভিত্তি ছিল, কিন্তু যোদ্ধারা অনুভব করলো যে, ইসলামি চিন্তা-চেতনার আধুনিক ব্যাখ্যার জন্য এমন আলোচনার প্রয়োজন, যার মধ্যে ইসলামি এবং অনৈসলামিক রাজনীতির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে এবং আল-কায়েদার কৌশল প্রয়োগের জন্য সেই রচনাকে ভবিষ্যতে শত্র-মিত্রের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের পর আরব যোদ্ধারা ইসলামি বিশ্বে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের চিন্তা লালন করতো। তারা তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে একত্রিত করে এবং ১৯৯৪-এ তাকফিরের মূলনীতি প্রকাশ করেন।

তাকফির: সংঘর্ষের মূলনীতি

খিলাফাতের অধীনে সমস্ত মুসলিম নিজেদের ব্যক্তিসত্তা, বংশ এবং গোত্রীয় ধারণা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে এক জাতি, এক উম্মাহ ছিল। রাজনৈতিকভাবে খলিফা ছিলেন সবার প্রধান। পুরো পৃথিবী রাজনৈতিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল — মুসলিম এবং কাফির।

সামগ্রিক স্বার্থ ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে দিয়ে সকল মুসলিম এক জাতি ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে ছিল আলাদা। মুসলিমদের এই চিন্তা-চেতনা দীর্ঘ তেরশত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। কিন্তু ১৯২০-এর দশকে খিলাফাতে উসমানিয়া ধ্বংসের পর এই আদর্শের বিলুপ্তি ঘটে।

উসমানি খিলাফাত যখন ধ্বংসের পথে, তখন পশ্চিমা ঔপনিবেশবাদের এক দীর্ঘ যুগের সূচনা হলো। যেখানে কলোনিয়াল বা ঔপনিবেশিক আইনের অধীনে পরিচালনা করার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত করা হলো।

এসকল রাজ্যগুলোর স্বাধীনতার পর সেই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা জারি থাকে। মুসলিমদেরকে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। অধিকাংশ মুসলিম দেশে, পশ্চিমা কলোনিয়াল শক্তিগুলো, যেমন - ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালির পশ্চিমা চিন্তার ধারক বাহকরা ক্ষমতার মঞ্চে আরোহন করে। ফলে সদ্য স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা শাসনব্যবস্থাই বাস্তবায়িত হয়, হোক সেটা গণতান্ত্রিক কিংবা রাজতান্ত্রিক আদলে। ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেকোনো রূপে ও অবয়বে অতীতের গল্পে পরিণত হয়।

পশ্চিমা ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই সকল মুসলিম জাতিরাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদ। তাদের বৈশ্বিক সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে। মুসলিম দেশগুলোর এহেন আধুনিকায়নে বিশ্বে শাসনের অংশীদারদের ভ্রাতৃত্বের সহায়তা অর্জিত হয়েছিল এবং ইসলামপন্থীদেরকে এই ব্যবস্থা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

এভাবেই উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া পর্যন্ত সকল মুসলিম রাষ্ট্রই পশ্চিমা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিল। তবে মুসলিম উলামাদের একটি বড় অংশ খিলাফাতের ওপর বিশ্বাস অটল রেখে নিজেদেরকে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে পৃথক রেখেছিলেন।

আশির দশকে আফগান প্রতিরোধযুদ্ধ তাদেরকে খিলাফাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ এনে দিল। দশকব্যাপী প্রতিরোধযুদ্ধ যোদ্ধাদেরকে সোভিয়েত-পরবর্তী উদ্ভূত সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবেলা সম্পর্কে ভাবার সুযোগ দিল।

এরপর ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে আফগানিস্তানের মাটিতে, এবং মুজাহিদদের শাসনামলে নতুন উদ্যমে ইসলামি সাহিত্যের প্রচারণা শুরু হলো।

যে সাহিত্য চিন্তা বিনির্মাণ করে

“ মুসলিম বিশ্ব কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো তাকফিরের সমস্যা। যারা সালাফদের তাকফিরের ক্ষেত্রে বেধে দেওয়া মূলনীতি অতিরিক্ত করে ফেলে, তারা খারেজিদের অনুসারী সাব্যস্ত হয়। প্রথমত খারেজি ছিল সেই দল, যাদের আবির্ভাব হয়েছিল আলি ও মুআবিয়ার যুদ্ধের সময়। তারা তাকফিরের ক্ষেত্রে এমন মূলনীতি তৈরি করেছিল, যার মাধ্যমে তারা আলি ও মুআবিয়া উভয় সাহাবিকেই কাফির সাব্যস্ত করেছিল এবং এবং তাদেরকে হত্যার ফাতওয়া জারি করেছিল। খারেজিরা আমলবিহীন মুসলিমদেরকে কাফির ঘোষণা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়।

তারা ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’-এর আকিদাহ গ্রহণ করেছিল এবং তার ওপর ভিত্তি করে অনেক সর্বজনবিদিত ব্যক্তির ওপর অনৈতিকতার অভিযোগ এনেছিল। এই বিশ্বাস তারা বর্জন করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত সাহাবিই ছিলেন সত্যের পতাকাবাহী ও হকের মাপকাঠি। নবি ﷺ এই বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তাদের নিদর্শন বলে গিয়েছিলেন যে, তারা প্রত্যেক মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, কিন্তু মুশরিকদেরকে ছেড়ে কথা বলবে। নবি ﷺ এটাও বলেছিলেন যে, এরা যদি আমার সময়েই প্রকাশিত হয়, তাহলে আমি তাদেরকে আদ জাতির মতো হত্যা করবো। এরপর নবি ﷺ-এর একজন সাহাবি এই কথাও স্পষ্ট করেছেন যে, এই দলের লোকেরা পবিত্র কুরআনে কাফিরদের ব্যাপারে বর্ণিত আয়াত মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে।

এক্ষেত্রে এক দিকে তো আছে খারেজিরা, যারা তাকফিরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, আর অপরদিকে আছে মুরজিয়া ও জাহমিয়া সম্প্রদায় - যারা তাকফিরের ব্যাপারে নিতান্তই বিশ্বাস রাখে না। তারা মুসলিম নামসর্বস্ব সেক্যুলার ও কমিউনিস্টদেরও মুসলিম আখ্যা দিয়ে দেয় আর ইসলাম ও মুসলিমদের অবজ্ঞা করে। এই লোকদের বিশ্বাস এমন যে - একবার কারও মুসলিম পরিচিতির আইডি কার্ড পাওয়া এরপর যতই তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির হয়ে কাজ করুক না কেন, তাদেরকে আর কেউই ‘ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে’ সাব্যস্ত করতে পারে না। (অর্থাৎ তারা তাকফিরের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি করে)”

- ভূমিকা, তাকফিরের মূলনীতি, আবু বাসির আত-তারতুসি

শাইখ আবদুল মুনইম মুস্তাফা হালিমা আবু বাসির ওরফে আবু বাসির তারতুসি একজন লন্ডন প্রবাসী সিরিয়ান মুসলিম আলেম। তিনি জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য মৌলিক সালাফদের আকিদাহ উপস্থাপন করেন। তাঁর লিখিত 'কাওয়াঈদুত তাকফির' আল-কায়েদার সিলেবাসভুক্ত এবং তাকফির ও বিদ্রোহ বিষয়ক তাদের প্রথমসারির একটি বই। ১৯৯৪ সালে লিখিত এই বই ইসলামের তাওহিদ ও পশ্চাত্যের শিরকের মধ্যে পরিস্কার বিভাজন রেখা টেনে দেয়। কেননা পশ্চিমা দর্শনে রয়েছে গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম ইত্যাদির মতো বিষয়ের ছড়াছড়ি, যা ওয়াহির সত্যতাকে অস্বীকার করে মানবরচিত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই বইটি মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে প্রান্তিক চিন্তা-চেতনা প্রসারিত করে এবং মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ পুরো আধুনিক ইসলামি ব্যবস্থাকে 'তাকফির' তথা কাফির সাব্যস্ত করে।

তারতুসি তাকফিরের সব মৌলিক আকিদাহ ব্যাখ্যা করেন। যেমন প্রচলিত ধারায় কুফরের একক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে পর্যায়ভিত্তিক ব্যাখা করতে গিয়ে একাধিক সংজ্ঞা চলে এসেছে। যেমন কুফরের পর্যায়গুলো হচ্ছে — কুফরে আকবর, কুফরে আমাল, কুফরে তাকাব্বুর, কুফরে জুহুদ ও কুফরে তাওয়াল্লি ইত্যাদি।

তিনি এই সমস্ত সংজ্ঞাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং কুফরের এই পর্যায়গুলোতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এই সমাজ ও এই দেশকে আদৌ ইসলামি বলা যায় না। এভাবে তিনি শিরক, ফিসক, জুলুম, নিফাক, যান্দাকা, রিদ্দাহ, নফস, মুয়ালাত, ঈমান ইত্যাদি ইসলামি পরিভাষাগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রতিটি ব্যাখ্যা কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের বর্ণনার আলোকে স্পষ্ট করে আধুনিক পৃথিবীর সাথে এগুলোর প্রায়োগিক দিকগুলো তুলে এনেছেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি সূরাহ তাওবার ৪৪-৪৫ নং আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্য তুলে ধরেন,

"এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবি ﷺ-কে বলেছেন, যে-ই জিহাদ থেকে অব্যহতি চাইবে, সে কাফির। যদিও কুরআনের হুকুম ঐ লোকদের ক্ষেত্রে ছিল, যারা অপারগতাবশত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তাহলে তো বোঝাই যায়, যারা স্বেচ্ছায় জিহাদ পরিত্যাগ করে, তাদের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা আরও ভয়াবহ।"

তারতুসি সেখানে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর এই ব্যাখার আলোকে সমকালীন দুনিয়ার পরিস্থিতি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন যে, আজকে যেসমস্ত লোক জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করছে, তাদের হুকুম কী হবে? অর্থাৎ সেইসব ব্যক্তি, যারা মুজাহিদদের জঙ্গি-সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে, অপরাধী সাব্যস্ত করে, এবং যারা জিহাদের জন্য ভিত্তিহীন শর্তাবলির অবতারণা করে, যেমন জিহাদ কেবল সরকার বা ইমামের অনুমতিক্রমে রাষ্ট্রের অধীনেই বৈধ, এবং যেখানে রাষ্ট্র ও সরকারও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর এই গণতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ইসলামবিরোধী চিন্তা-চেতনার ওপর। নিঃসন্দেহে এরা মুনাফিক এবং বিশুদ্ধ আকিদাহ থেকে পদচ্যুত। যারা জিহাদের বিরোধিতা করে, তারা যেন নিজেদের ভেতর দায়বদ্ধতার উপলব্ধি তৈরি করে আল্লাহর শত্রুদের সাহায্য করা থেকে ফিরে আসে। চাই এই সাহায্য মৌখিক বা প্রায়োগিকভাবে মুজাহিদদের পথে বাধা বিঘ্নতা সৃষ্টি করা হোক। এমনসব মানুষের নিজের ঈমান নবায়ন করে নেওয়া উচিত। কেননা, একসময় তারা আদতে মুসলিম থাকলেও তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তারতুসির তাকফিরের বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক লিখনী ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম ১৯৯০-এর পর লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং আপন অবস্থায় ছিল। ততদিনে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং তাদের একটি অবস্থানও তৈরি হয়ে গেছে।

তবে চূড়ান্ত কট্টরপন্থী 'তাকফির ওয়াল হিজরাহ'-এর মতো দলও সামনে এসেছিল। 'তাকফির ওয়াল হিজরাহ' ছিল ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন, যখন জামাল আবদুন নাসের ইখওয়ানিদের প্রতি সহিংস পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের নেতৃত্ব ও সদস্যদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। এছাড়া সেসময় সিরিয়া, মিশর, ইরাক আর লিবিয়ার সোশ্যালিস্ট সরকার ইসলামপন্থীদের প্রতি অসভ্য ও বর্বর হিসেবে প্রদর্শন করে। তখন ইসলামপন্থীরা সৌদি, কুয়েত, কাতার, আমেরিকা, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এসব দেশে আশ্রয় শুধু অবস্থান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, কোনো ধরনের দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুমতি পাওয়ার প্রশ্নই ছিল না।

আশির দশক থেকে যে প্রশ্নগুলো ঘুরেফিরে এসেছে, তা হলো —

১. সেই ব্যক্তি কি মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে, যার জন্ম মুসলিমের ঘরে হলেও ইসলামের ওপর তার ঈমান নেই?

২. সেই রাষ্ট্র কি সত্যিকারের ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ

মানুষ নিজেদের বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিলেও রাজনৈতিকভাবে এক অনৈসলামিক ব্যবস্থার মাঝে জীবনযাপন করে?

৩. সেই রাষ্ট্র কি ইসলামি রাষ্ট্র, যেখানে ইসলামের ভিত্তিতে ইবাদত হয়, কিন্তু সেই রাষ্ট্রটি ইসলামবিরোধী কাফির শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার?

যখন রাশিয়া ১৯৭৯-এর ২৭ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে আক্রমণ করে বসলো, তখন ইসলামপন্থীদের একটি কাজের ঠিকানা তৈরি হলো। তখন মুসলিম যুবকদেরকে তাদের আফগান ভাইদের সাথে মিলে রাশিয়ান নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়ানো হলো, যেখানে পাকিস্তান ও সৌদি আরব ছিল সবার সামনে।

কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুবকরা ইসলামি শাসনব্যবস্থার পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে মুসলিম সমাজে নিজেদের দাওয়াতি প্রক্রিয়া শুরু করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পুনরায় সংগঠিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে, নতুন উদ্যমে এবং নতুন লক্ষ্যে ইসলামপন্থী মুসলিমদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এরপর তারা নিজেদের দাওয়াতকে যতোই বেগবান করেছেন, ইসলামি বিশ্বের সুশীল শ্রেণির দলগুলোর সাথে তাদের বিরোধ তীব্র হয়েছে। তারা রাখঢাক ছাড়াই মুসলিমপ্রধান শাসকদের পশ্চিমা দালাল হওয়ার বাস্তবতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এবং তাদের অবস্থান তুলে ধরে। এই চেষ্টা-সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, আল-কায়েদার অধীনে বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা অবস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। এই দাওয়াতি প্রচেষ্টা এখনও চলমান এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে।

যে সময় তারতুসি ও অন্যান্য আরব আলেমগণ ঈমান ও কুফরের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে কিতাবাদি রচনা করছেন, একই সময়ে হাজার হাজার মুসলিম যুবক পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ফিলিস্তিন, মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব, ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশ থেকে আফগান জিহাদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে। এই যুবকেরা আমেরিকাবিরোধী ও আঞ্চলিক দালাল সরকারবিরোধী আদর্শে উজ্জীবিত হয়।

১৯৯৪ সালে যখন এই যুবকেরা আফগানিস্তান ছেড়েছে, অথবা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই তাদের পশ্চিমের সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাওহিদের চেতনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেসময় তারতুসি ও অন্যান্য আলেমদের লেখা ‘তাকফিরের মূলনীতি’ ধরনের কিতাবাদি রুশ-আফগান যুদ্ধের পরও তাদের আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ رحمه الله

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর ইসলামি সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে আদর্শিক বিবর্তন সবচেয়ে বেশি ছিল তাতারদের যুগে। তাতাররা আক্রমণ করে আব্বাসি খিলাফাতের একেকটি ইট খুলে নিল। ইসলামি ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে সঙ্কটাপন্ন সময়গুলোর একটি। মুসলিমরা পুরো পৃথিবীর প্রধানতম শক্তি ছিল, কিন্তু সহসাই তা পতনের মুখোমুখি হয়ে গেল। আব্বাসি খিলাফাতের পতন হলো এবং তার সাথে সাথেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা, ইসলামের নীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরও সমাধি রচিত হলো। প্রতিটি বিষয় তাতারিদের চিন্তার অনুগামী হয়ে গেল। ইসলামি বিশ্বের অনেক অঞ্চলই তাতারি আগ্রাসন থেকে নিরাপদ ছিল, কিন্তু স্থানীয় শাসকদের সেই সাহসটুকু অবশিষ্ট ছিল না যে, তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারা মঙ্গোলদের (তাতারিদের) শক্তি ও বর্বরতার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। আসলে তারা বাগদাদের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাইছিল না, যেখানকার সব মানুষকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে ফেলা হয়েছিল এবং পুরো সভ্যতাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইসলামি ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে মুসলিম সমাজ ও তার শাসকগোষ্ঠীর অক্ষমতা, খিলাফাতে আব্বাসিয়্যার পতনের পর বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞ, এক স্বেচ্ছাসেবক ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্ম দেয়। তাতারি ও তাদের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্থান হওয়া এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ঘোষক ও সিপাহসালার ছিলেন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (১২৬৩ - ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ)।

ইবনু তাইমিয়্যাহ এরিস্টটলের মতো গ্রিক দার্শনিকদের শক্ত সমালোচক ছিলেন। তিনি তাদের দার্শনিক লেখালেখির খণ্ডনমূলক বিশ্লেষণ লিখেন এবং সেগুলোর সমপর্যায়ের যৌক্তিক ইসলামি চিন্তাচেতনাকে সামনে আনেন। তিনি গ্রিক দর্শন ও ইসলামি আকিদাহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন এবং যুক্তির নিরিখে ইসলামকে উন্নত প্রমাণ করেন। ইবনু তাইমিয়্যাহর আবির্ভাবের সময় মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানই তাতারদের হাতে পদানত হয়েছিল।

যদিও তাতাররা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু প্রথমদিকে তারা মুসলিম সমাজে নিজস্ব নীতিমালা ও আইনকানুনের প্রচলন ঘটিয়েছিল। তাতারি শাসকবর্গ মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সম্পূর্ণরূপে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল এবং

মুসলিম সমাজের প্রধান প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিরা তাদের অনুগামী হয়ে গিয়েছিল। এই আলেমরা হালাকু খানকে ন্যায়পরায়ণ শাসক ঘোষণা করেছিল এবং ফাতওয়া প্রদান করেছিল যে, একজন স্বৈরাচারী মুসলিম শাসকের চেয়ে নাকি একজন ন্যায়পরায়ণ কাফির শাসক উত্তম।[68]

তাতাররা দুটি বিপরীতমুখী আইন চালু করেছিল। মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে যেমন বিয়ে-শাদি ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামি আইন অনুসারে আর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব আইনব্যবস্থা 'ইয়াসিক' দ্বারা ফয়সালা করা হতো।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এই তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরজ ঘোষণা করেন। তাঁর সেই ফাতওয়ার ভিত্তি এই ছিল যে, যদিও তাতাররা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যিকার মুসলিম হতে পারেনি, কেননা তারা ইসলামি বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইনের প্রচলন করেছে। সুতরাং এখনও তারা জাহেলি যুগেই রয়েছে।[69]

এভাবে ইবনু তাইমিয়্যাহ সুফি এবং সুফিবাদের অনেক ধারাকেও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি শিয়াদের মুরতাদ এবং ইসলামের বিশ্বাসঘাতক আখ্যায়িত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কাজ করার ঘোষণা করেন। তিনি এই ঘোষণাও করেন যে, যে ইসলামি দলই ইসলামের সীমাকে লঙ্ঘন করবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে, যদিও তারা নিজেদের ইসলামি আকিদাহের ধারক দাবি করে থাকে।

---

68. যে আলেমরা শরিয়াহ দ্বারা শাসন / বিচার না করা শাসকদের আনুগত্য করতে ডাকতো, তাদের ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ফাতওয়া দেন, *"যদি কোনো আলেম কুরআন ও সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে যে কিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষানুযায়ী ফায়সালা করে না, সে তখন একজন মুরতাদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত। এই হুকুম সেই সমস্ত আলেমদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা ভয়ের কারণে তাতারদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং এর মাধ্যমে লাভবান হতে চেয়েছিল। এই আলেমরা অযুহাত দিয়েছিল যে মোঙ্গলদের মধ্যে কেউ কেউ কালিমা পড়ছিল; আর তাই নাকি তারা মুসলিম।"* [মাজমুউল ফাতওয়া, ৩৫ / ৩৭৩]

69. এই ব্যাপারে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ফাতওয়া দেন, "আমরা বলি, এমন কোনো দল / ফিরকা / জামাআত যা ইসলামের তর্কাতীত, সন্দেহাতীত, অনস্বীকার্য এমন কোনো বিধান ত্যাগ করে, যার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর প্রজন্মের পর প্রজন্ম কোনো রকম বিরাম ছাড়াই একমত; তবে বিধান ত্যাগকারী সেই দলের বিরুদ্ধে ইমামদের ইজমা অনুযায়ী যুদ্ধ করা আবশ্যক। এমনকি যদি তারা দুটি কালিমার সাক্ষ্য দেয় (আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তবুও।" [মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড ৪, বাব উল-জিহাদ]

মামলুক শাসক নাসিরউদ্দিন প্রথমদিকে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে এবং নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করে। ইবনু তাইমিয়্যাহ এই মিশরীয় শাসককে হুঁশিয়ার করেন যে, 'যদি তিনি নিরপেক্ষতার নীতি জারি রাখেন এবং তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করেন, তাহলে সবার আগে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবো এবং শক্তি অর্জন করে নিজেই তাতারদের বিরুদ্ধে লড়ব।' ফলে নাসিরুদ্দিন যুদ্ধে বাধ্য হয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ একইসাথে একজন আলেম, সেনানায়ক এবং একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ইবনু তাইমিয়্যাহর চিন্তাধারা তাতার বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি ইসলামের তাওহিদের আকিদাহ এবং মঙ্গল-তাতারদের শিরকি আকিদাহ সুস্পষ্ট করে এই সংগ্রামের আদর্শিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি লেবাননের শিয়া, আশাইরা, জাহমিয়ার সুফিবাদ এবং মুতাজিলি আকিদাহের ধারক বাহকদের কাফির সাব্যস্ত করেন। আল-কায়েদা ইবনু তাইমিয়্যাহর সংগ্রামী দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং নিজেদের অবস্থানে ইবনু তাইমিয়্যাহকে দলিল হিসেবে পেশ করে। খিলাফাত-পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর ইসলামি আন্দোলনগুলোর অধিকাংশই ইবনু তাইমিয়্যাহর চিন্তার ধারক।

দক্ষিণ এশিয়ায় জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ মওদুদী ও ইখওয়ানের চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুব মিলে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর চিন্তাধারাকে সমকালীন ইসলামি চিন্তার ছাঁচে প্রয়োগ করেন। তারা সমকালীন প্রেক্ষাপটে 'জাহিলিয়াহ' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর সময়ে গ্রিক, রোমান ও তাতারি দর্শন, নীতিমালা ও আইনকানুনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর এই মুসলিম চিন্তাবিদগণ সোশ্যালিজম, সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্রকে 'জাহিলিয়াহ' পরিভাষায় গণ্য করে ইবনু তাইমিয়্যাহর চিন্তা চেতনায় ব্যাপকতা এনেছেন।

মাওলানা মওদুদী পশ্চিমা গণতন্ত্র, সোশ্যালিজম এবং পশ্চিমা সমাজ সংস্কৃতির সমালোচনা করেছেন। তিনি ইসলামি জীবনব্যবস্থার সামগ্রিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে তিনি ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জিহাদি পন্থার প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি এর পথ ও পন্থা নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং এমন পন্থা উদ্ভাবন করেন, যা আধুনিক চিন্তা ও আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে যাবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের 'ভোটদান পদ্ধতির' সমর্থন করেন এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যান।

অন্যদিকে সাইয়্যেদ কুতুব পশ্চিমা গণতন্ত্র ও সোশ্যালিজমের সমালোচনায় ব্যাপকতা আনতে গিয়ে বলেন যে, মুসলিমরা পশ্চিমের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে ইসলামি বিপ্লবের জন্য যাবতীয় চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

আল-কায়েদার আদর্শিক ভ্রমণ ইবনু তাইমিয়্যাহ থেকে শুরু হয়ে সাইয়্যেদ কুতুব পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়। তবে এই আদর্শ আধুনিক প্রেক্ষাপটে কোনো বাস্তবসম্মত কর্মপন্থা, বা সুস্পষ্ট নীতিমালা বাতলে দেয়নি। তাই আল-কায়েদার কর্মপন্থায় এসে ইবনু তাইমিয়্যাহ বা সাইয়্যেদ কুতুব কারও চিন্তাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না।

১৯৬৬ সালে সাইয়্যেদ কুতুবের ফাঁসির পর ইখওয়ানের পুরো নেতৃত্ব ভেঙ্গে যায় কিংবা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। দলের তৃণমূল কর্মীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, কিংবা অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনে গিয়ে যোগ দেয়। জামায়াতে ইসলামি ও মাওলানা মওদুদী নাসের প্রশাসন ও ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের মাঝে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা পালন করেন এবং ইখওয়ানকে মিশরের সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। ১৯৬০ সালের পর ইখওয়ান ও বিশ্বের অন্যান্য ইসলামি আন্দোলনগুলো নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করে এবং এভাবে তারা সামাজিক প্রশাসনের অংশ হয়ে যায়।

এই পুরো সময়টাতে আল-কায়েদার আদর্শের ধারকেরা, যারা বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের অংশ ছিল, সেই প্রতীক্ষিত মূহুর্তের অন্বেষণে থাকে, যেখানে তাদের চিন্তা একটি আন্দোলনের রূপ নিবে। আর আফগানযুদ্ধ তাদের হাতে সেই সুযোগ এনে দেয়।

আফগান জিহাদ আল-কায়েদার ইসলামি আন্দোলনকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলে শক্ত ঘাঁটি ও আশ্রয়স্থল দান করে। এখান থেকে আল-কায়েদা প্রথমে আফগানিস্তান-পাকিস্তান, অতঃপর পুরো বিশ্বের উপযোগী আদর্শিক ও সামরিক নীতিমালা প্রণয়ন করে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিরোধ-যুদ্ধের বৈধতা

৯/১১-এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আল-কায়েদার হামলার মাধ্যমে আমেরিকা আর আল-কায়েদার প্রকাশ্য যুদ্ধের সূচনা হয়। আমেরিকা ২০০১-এর অক্টোবরে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং ডিসেম্বরে এসে তালেবান পরাজিত হয়ে পিছু হটে যায়। ওয়াশিংটন আফগান বিজয়ের ঘোষণা করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করে দেয়। তালেবান আর আল-কায়েদা তখন আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পশ্চিমা দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দেয়। আফগানিস্তান ছিল কেন্দ্রীয় রণাঙ্গন আর পাকিস্তান হয় সামরিক আশ্রয়স্থল ও ঘাঁটি। এক্ষেত্রে এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে দুটি প্রধান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এক. আফগানিস্তানে অবস্থিত দখলদার সৈন্য, দুই. আমেরিকার শক্তিশালী মিত্র পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্স। ফলে আল-কায়েদার এমন নীতিমালা তৈরি করতে হয়, যা একইসাথে এই উভয় সমস্যারই মোকাবেলা করবে।

আফগানিস্তানে তালেবানের বড় মাপের প্রতিরোধ শুরু হয় ২০০৬ সালে। আর আল-কায়েদা সেটিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে। আল-কায়েদা বিভিন্ন পেশাজীবী মুসলিম, রাশিয়া বিরোধী যুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিভিন্ন জিহাদি দল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইসলামি ঘরানার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ইত্যাদিকে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত করার ব্যাপারে মনোযোগী হয়; একইসাথে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধপ্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়। এই কাজের ক্ষেত্রে পাকিস্তান ছিল আল-কায়েদার স্ট্র্যাটেজিক ঘাঁটি। এতে করে আমেরিকার চাপের মুখে পাকিস্তান আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়। আর এর ফলস্বরূপ যুদ্ধের পরিধি এতটা বিস্তৃত হয়ে যায় যে, আফগানযুদ্ধের জন্য তৈরি করা পলিসিকে 'আফ-পাক স্ট্র্যাটেজি' নামে অভিহিত করা হয়।

আমেরিকা ২০০৩ সালে যখন ইরাক আক্রমণ করে, তখন দ্বিতীয়বারের মতো আল-কায়েদাকে একই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। আল-কায়েদা ও ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একদিকের শত্রু তো ছিল ইরাকে অবস্থিত আগ্রাসী সৈন্যরা, অপরদিকে জর্ডান ও সৌদি আরবের সিকিউরিটি ফোর্সও ছিল তাদের শত্রু। এইজন্য আল-কায়েদা ২০০৩-এর পর তাদের আফগান পলিসি পুরো দুনিয়াজুড়েই প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আফগানিস্তানের মতো ইরাককে কেন্দ্রীয় রণাঙ্গন স্থির করে শত্রুর সহায়তাকারী পার্শ্ববর্তী দেশ; যেমন সৌদি আরব, জর্ডান, সিরিয়া, মিশর ইত্যাদি পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোকেও শত্রু আখ্যায়িত করা হয়। ইরাকের পার্শ্ববর্তী হওয়ার কারণে এইসব দেশের জমিনকে ইরাক প্রতিরোধযুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিক ঘাঁটি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এইজন্য আল-কায়েদাকে এই দেশগুলোতেও কঠিন হুমকির সম্মুখীন হতে হয়।

এরপর আমেরিকার সাপ্লাই লাইন ধ্বংস করার জন্য আল-কায়েদা সোমালিয়া আর ইয়েমেনেও ঘাঁটি গাড়ে। আসলে ২০০৬ সাল নাগাদ ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলই রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ, সংঘাত-সংঘর্ষ, ফিদায়ি হামলা ইত্যাদি একেবারে সাধারণ বিষয় বনে গিয়েছিল। এইসব মুসলিমপ্রধান দেশের শাসকবর্গ স্পষ্টতই লক্ষ্য করেছিল যে, এই সমস্ত সমস্যার গোড়া মূলত আফগানিস্তান ও ইরাক। যদিও নীতিগতভাবে এইসব দেশের শাসকেরা আফগানিস্তান আর ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরোধী ছিল, কিন্তু শেষমেশ তারা এই যুদ্ধে আমেরিকারই সঙ্গ দিয়েছিল।

এরপর এই মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে সংঘাত-সংঘর্ষ ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সরকারি ফাতওয়া জারি করা শুরু হলো। পাকিস্তান, জর্ডান, কুয়েত ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো ক্রমাগত আমেরিকার সাহায্য করে যাচ্ছিল, তাই তারাও টার্গেটে পড়ে গেল। আল-কায়েদা এই যুদ্ধে আমেরিকার সমস্ত মিত্রকেই শত্রু আখ্যায়িত করে। তারা আমেরিকা ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের পাশাপাশি মুসলিম মিত্রদের ওপরও অপারেশন পরিচালনা করে। এর ফলে ওইসব মুসলিমপ্রধান দেশে আল-কায়েদার আফগান ও ইরাক যুদ্ধের শারঈ অবস্থান ও বৈধতা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

এই আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রথম সূচনা হয় মধ্যপ্রাচ্যে। আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী মুসলিম বিপ্লবীদের নব্য খারেজি আখ্যায়িত করেন এবং বলেন,—

“ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইসলামের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ধারণা রাখা নব্য খারেজি প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটলো। তাদের ধারণা, শাসকবর্গ পরিপূর্ণ ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠিত করেনি। এইজন্য এই নতুন প্রজন্ম মুসলিম উলামা, ফুকাহা ও নির্ভরযোগ্য চিন্তাবিদদের পরামর্শ ছাড়াই সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কট তৈরি করছে। তারা মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়াতে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে। ইতোপূর্বে তারা মক্কার মসজিদুল হারামে হামলা করেছিল। অতএব এই লোকেরা রাসূল ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদিসের বিরোধিতা করে এবং খারেজিপন্থা ছাড়া প্রত্যেক ইসলামি কাজকে অস্বীকার করে।”

যখন একজন সৌদি সালাফি আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো, এখনও কি এমন কেউ বিদ্যমান আছে, যারা খারেজিপন্থা অনুসরণ করে? তখন তিনি এর প্রতিউত্তরে দীর্ঘ আলোচনা করে বলেন,

"তাহলে খারেজিদের বিশ্বাস ও কর্মপন্থা আর কী ছিল? এটাই যে, মুসলিমদের মুরতাদ ঘোষণা করা। যার নিকৃষ্ট তরিকা হলো, মুসলিমদের হত্যা করা এবং তাদের ওপর জুলুম করা। খারেজিদের মূল আকিদাহ তিনটি -

এক. মুসলিমদের মুরতাদ আখ্যায়িত করা

দুই. সশস্ত্র বিপ্লব করে শাসনব্যবস্থা ও সরকারি প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করা।

তিন. মুসলিম হত্যার বৈধতা দেওয়া।

যদি কোনো ব্যক্তি উপরোক্ত বিশ্বাস লালন করে, তাহলে সে খারেজি সাব্যস্ত হবে, চাই এমন বিভ্রান্ত দলগুলোর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ততা প্রকাশ করুক, বা না করুক।"

— জিহাদের মূলনীতি, সালিহ আল-ফাওযান

কিন্তু সন্দেহাতীতভাবেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আল-কায়েদার বিরুদ্ধে হওয়া এমন ইলমকেন্দ্রিক আলোচনাগুলোয় এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে যে, মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে আল-কায়েদার এই যুদ্ধ কোনো অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নীতিগত দ্বন্দ্বের ফলাফল নয়। বরং এই যুদ্ধের ভিত্তি ছিল পুরোপুরি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে, যেখানে এইসব নামধারী মুসলিম রাষ্ট্র কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে লড়াইরত ছিল। এইজন্য তাদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার কুফরির ফাতওয়া আরোপ আদতে অযৌক্তিক নয়। মুসলিম বিপ্লবীদের মূল যুদ্ধ ছিল ফিলিস্তিন, ইরাক ও আফগানিস্তানের দখলদারদের বিরুদ্ধে। সৌদি আরব, জর্ডান, পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে নবোদ্ভূত সমস্যাগুলো আমেরিকান মিত্রতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছিল।

৯/১১-এর পর পাকিস্তান প্রশাসন আফগান তালেবানের বিরুদ্ধে বিমানহামলার জন্য ন্যাটোকে তাদের বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল। এমনকি আফগানিস্তানে ন্যাটোর রসদ সরবরাহের জন্য নিজ দেশের রাস্তাও দিয়েছিল। এছাড়া পাকিস্তান

আল-কায়েদার অনেক নেতা ও সদস্যকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। জর্ডান, কুয়েত, তুরস্ক, সৌদি আরব এবং কিছু ক্ষেত্রে ইরানও সাদ্দাম প্রশাসনের পতন ও ইরাকের ওপর আমেরিকান দখলদারিত্বের জন্য লজিস্টিক এবং ইন্টেলিজেন্স সাপোর্ট প্রদান করেছিল।

সৌদি আরব ও পাকিস্তানে আগ থেকেই চলে আসা রাজনৈতিক বিরোধ এই দেশ দুটোকে দুর্বল করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আল-কায়েদার যোদ্ধারা পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশাররফ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী আজম শাওকাত আজিজকে হত্যার জন্য চেষ্টা চালায় এবং পাকিস্তানের পশ্চিমাপন্থী রাজনৈতিক নেতা বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করে। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যোদ্ধাদেরকে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। ২০০৭ নাগাদ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উপলব্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, যতদিন পর্যন্ত ইরাক ও আফগান প্রতিরোধযুদ্ধ চলমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামপন্থীদের এই সংগ্রাম বন্ধ করার কোনো পথ নেই।

সেই পর্যায়ে তাদের মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লেখালেখি ও টিভি টকশোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হলো, যেখানে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকরা ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধ কথিত সঠিক রূপরেখা ও শারঈ নীতিমালার বর্ণনা দিতে শুরু করেন। এইসমস্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সাধারণ জনমত তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, ইরাক আফগানিস্তানের ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধ নাকি শারঈ মানদণ্ড অনুযায়ী সঠিক নয়!

বিভিন্ন আলেমগণ তথাকথিত 'বৈধ পন্থায়' ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের নিম্নবর্ণিত নীতিমালা উপস্থাপন করলেন —

১. যুদ্ধের উপযোগী উপকরণ ও সরঞ্জাম থাকতে হবে।

২. নবি ﷺ মদিনায় হিজরত করে সেখানে রাষ্ট্রগঠনের আগ পর্যন্ত জিহাদ করেননি। অতএব কোনো রাষ্ট্র ও দুর্গের অনুপস্থিতিতে কোনো ধরনের প্রতিরোধযুদ্ধ ইসলামি নীতিতে বৈধ নয়।

৩. মুসলিম সৈন্যসংখ্যা শত্রুর সেনাদের চেয়ে অর্ধেকের কম হতে পারবে না।

৪. শর্তগুলোর অনুপস্থিতিতে কোনো যুদ্ধই ইসলামি হিসেবে বিবেচিত হবে না।

রেডিও, টেলিভিশন, পত্রপত্রিকা ও ধর্মীয় ফাতওয়া ইত্যাদি এইধরনের চিন্তা ও গবেষণা বারংবার ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হতে থাকে। কিন্তু এইসব অপপ্রচার আল-কায়েদার ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধ স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। [70]

70. এখানে উল্লেখিত ১ম, ৩য় ও ৪র্থ পয়েন্টে উল্লেখিত ব্যাপারগুলো মূলত ইসলামের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বা ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমগণের ফিকহশাস্ত্র চষে আনা হয়। বলাই বাহুল্য যে, এইসমস্ত শর্ত ইসলামের প্রতিরোধ যুদ্ধ বা দিফায়ি জিহাদের জন্য আদৌ প্রযোজ্য নয়।

আর ২য় যে পয়েন্টে মদিনা রাষ্ট্রের উপস্থিতিকে শর্ত করা হয়েছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন। কেননা তাহলে প্রশ্ন আসে যে, মদিনা রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে তো ইসলামের অনেক বিধানই অপূর্ণ ছিল। যেমন: মদিনা রাষ্ট্রের আগে রমযানের রোযা ফরজ ছিল না, মদ হারাম ছিল না, সুদ হারাম ছিল না; এমনকি আযানেরও প্রচলন ছিল না। এখন প্রতিরোধ যুদ্ধের বিধানকে যদি মদিনা রাষ্ট্রের শর্তে ফেলা হয়, তাহলে অন্যান্য বিধানকেও ফেলতে হবে। আর এভাবে পুরো দ্বীনকেই পঙ্গু করে ফেলা হয়।

এভাবেই এই ধরনের বক্তব্যগুলো অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হলেও শারঈ ভিত্তি না থাকার কারণে ইসলামের আলেমগণের মধ্যে নিরপেক্ষ দল এবং মুজাহিদদের মাঝেও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

গঠন ও বিন্যাস

উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বিপজ্জনক ভূমিতে আল-কায়েদা নেতা আবু উমার আবদুর রহমান আল-হাকিম ওরফে শাইখ ঈসা অবস্থান করছিলেন। সেখানে পাঞ্জাবি, পশতুন ও আফগান যোদ্ধাদের পৌঁছা খুবই সহজ ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই সমস্ত ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের সূচনা হয়েছে একজন মুসলিম শাসকের বিভ্রান্তি ও তার কাফিরে পরিণত হয়ে যাবার কারণে। এর মাধ্যমে এটা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, খেলায় কে কোন পক্ষ নিয়েছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানের পতনের পর আল-কায়েদা বাঁচা মরার লড়াই করছিল। শাইখ ঈসা দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য কার্যকর একটি কর্মপন্থা তৈরি করেন। সেই কর্মপন্থা ছিল - পাকিস্তানের ইসলামপন্থী ও সেক্যুলারদের মধ্যকার মৌলিক দ্বন্দ্বকে সুস্পষ্ট করার মাধ্যমে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যে, পাকিস্তান হয় আমেরিকার সঙ্গ ত্যাগ করবে, নয়তো আল-কায়েদার সাথে হাত মিলিয়ে আমেরিকান বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ন্যাটো বিরোধী লড়াইয়ে তখন আল-কায়েদার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশের কন্ট্রোল হাতে নেওয়া।

সত্তরের কোঠায় পা দেওয়া শাইখ ঈসার সমস্ত শরীর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রায় পচে গিয়েছিল। সর্বশেষ তিনি আঙ্গোরাড্ডায় পাকিস্তানি সেনাদের এক অপারেশনে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আবেগ ও প্রেরণার এক সমুদ্র। শাইখ ঈসা মিশরের ইখওয়ানের চিন্তাবিদ আবদুল কাদির আওদার সহপাঠী ছিলেন। আওদাকে গত ষাটের দশকে নাসের প্রশাসন হত্যা করে। শাইখ ঈসা কলেজ অব কমার্সের একজন গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। আউদার হত্যাকাণ্ডের পর তিনি মিশর প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর তাগুত সরকারকে স্পষ্টভাবে কাফির ফাতওয়া দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফলস্বরূপ মিশরে অনেক জুলুম-নিপীড়ন সহ্য করেন। কিন্তু সেইসব জুলুম-অত্যাচার তাঁর সংকল্পে আরও দৃঢ়তা এনে দেয়, এবং এইসব (কুফরি) শাসনের প্রতি তাঁর ঘৃণা বাড়তে থাকে।

মিশরে আনোয়ার সাদাতের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিদ্রোহে তিনি শামিল ছিলেন এবং সাদাত হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তির পর তিনি 'আল-আযহার' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ধর্মশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি সোভিয়েত বিরোধী

আফগান যুদ্ধে শরিক হন এবং আবদুল্লাহ আযযাম ও সাইয়্যেদ ইমামের ঘনিষ্ঠভাজনে পরিণত হন। ১৯৯২ সালে মাদ্রাসায় শিক্ষকতার জন্য তিনি ইয়েমেন চলে যান। কিন্তু ১৯৯৬ সালে যখন তালেবান শক্তিশালী অবস্থানে চলে আসে, তখন পুনরায় তিনি আফগানিস্তানে চলে আসেন। এরপর ২০০১-এ আফগানিস্তানে তালেবানের পতন হলে তিনি ওয়াজিরিস্তানে হিজরত করেন।

দুর্বলতা, বয়োবৃদ্ধি ও কোমরের ব্যাথায় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণে যদিও তিনি সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না, কিন্তু গোত্রীয় অঞ্চলে আসা যাওয়া করা যোদ্ধাদের জন্য তিনি যেন ছিলেন বরকতের ঝর্ণাধারা। পাঞ্জাব থেকে আসা যোদ্ধারাও তাঁকে বেশ সম্মান করতো। তারা মোহগ্রস্তের মতো তাঁর সামনে বসে তাঁর তাকফির সংক্রান্ত আলোচনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনতো। তারা শাইখ ঈসার লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'-এর দরস তাঁর কাছ থেকেই নিতো। সেই গ্রন্থে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতার মৌলিক নীতিমালা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিবৃত হয়েছে। এছাড়াও সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আদ্যোপান্ত প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে, কেননা এই ব্যবস্থা সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলকে লিবারেলিজমের দিকে ঠেলে দেয়। শাইখ ঈসার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল - যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো ইসলামি দল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও যায়, তবুও তারা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, যা সত্যিকার অর্থেই ইসলামের আত্মাকে ধারণ করে। তিনি মনে করতেন, এভাবে ইসলামের প্রভাব একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে যায়, এবং বৈশ্বিক জিহাদের ডাক আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার ওপর স্থান পায় না। তাঁর লিখিত গ্রন্থে তিনি কাফির শাসক ও কুফুরী শাসনব্যবস্থার সহযোগীদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। শাইখ ঈসা সেইসব নীতিমালা স্পষ্টরূপে তুলে ধরেন, যেগুলোর ভিত্তিতে পাকিস্তান আফগানিস্তানে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাফির আমেরিকানদের সাহায্য করার কারণে দারুল হারবে পরিণত হয়েছে।

খুব শীঘ্রই পাকিস্তানের জিহাদপন্থী, বিশেষ করে লস্করে জাংভীর নেতৃবৃন্দ শাইখ ঈসার মজলিসের নিয়মিত ছাত্রে পরিণত হয়। বিশেষত তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন — কারী জফর, মুহাম্মাদ আফজাল, ডাক্তার উমার, ফারায আলি শামী, শোয়াইব ইসহাক, সাঈদ, ডাক্তার হামিদ, হাজি তারিক, হাকিম তাহের আবদুল্লাহ, ইশতিয়াক, সানাউল্লাহ, শাইখ নেসার এবং ইফতেখার কোরাইশি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া উত্তর ওয়াজিরিস্তানের কমান্ডার ও আলেম মৌলভী সাদেক নূর এবং আবদুল খালেকও অংশগ্রহণ করতেন।

শাইখ ঈসা পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন যে, কারও ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে কি এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে যায় যে, সে কোনো মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে? (অথচ সে কিনা ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে!)

তিনি একজন সত্যিকারের মুসলিম হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করেন এবং 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'-কে ঈমানের মাপকাঠি নির্ধারণ করেন। তাঁর সেই গ্রন্থ অনূদিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত গ্রন্থটি সাধারণ মুসলিমদের জন্য লিখা ছিল না, বরং তা লিখা হয়েছিল প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের জন্য। শাইখ ঈসা সেক্যুলার শক্তির সাথে ইসলামপন্থীদের সংঘাতময় অবস্থার বাস্তবতা স্পষ্ট করতে চাইছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করাও ছিল আবশ্যক।

'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' গ্রন্থে তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বরাত দিয়ে বলেন —

"একজন মুসলিম যদি অপর মুসলিমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্যও হয়, তবুও তার জন্য নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই না করা আবশ্যক। এমনকি যদিও তার আশঙ্কা হয় যে এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে যেতে পারে।" আর সেখানে আজকের এই পাকিস্তানি সৈন্যরা বেতনের জন্য অপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। অতএব, আমি ওদেরকে নির্দ্বিধায় মুরতাদ বলি।"

শাইখ ঈসা তাঁর উক্ত গ্রন্থে কুরআন, হাদিস এবং নির্ভরযোগ্য আলেমদের উদ্ধৃতি এনেছেন। এবং তিনি এইসব দলিল-প্রমাণকে আমেরিকার 'War on Terror'-এ সহায়তার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন।[71] শাইখ ঈসার দৃষ্টি ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, ধর্মীয় সংগঠন আর জিহাদি দলসমূহের ইসলামপ্রিয় মানুষদের প্রতি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল - যদি পাকিস্তানের ইসলামপন্থীদেরকে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করানো যায় যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তা করার জন্য পাকিস্তান মোটেও ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পাবার যোগ্য নয়, তাহলে পাকিস্তানে ইসলামি আন্দোলন সহজ হয়ে যেত।

---

71. ইসলামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফরি শক্তিকে সাহায্য করা হলো ইরতিদাদ বা দ্বীন ত্যাগ করে বের হয়ে যাওয়া। শাইখ ঈসা শুধু এই ব্যাপারটিই পাকিস্তান প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রমে তা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন।

পাকিস্তানের মুরতাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাওয়াহ কার্যক্রমে শাইখ ঈসার লক্ষ্য ছিল —

১। আফগান যুদ্ধে আমেরিকার সহায়তা করার শক্তি হ্রাস করা,

২। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক অবস্থানে থাকা মুসলিমদের সামনে শত্রু-মিত্র স্পষ্ট করা,

৩। বিদ্রোহ সফল হওয়ার সাপেক্ষে (পাকিস্তানেও) বৈশ্বিক জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

সহসাই শাইখ ঈসা পাকিস্তানের সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থার টার্গেট হয়ে যান। আর যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে উর্দু ও পুশতু বলতে পারতেন, কিন্তু আরবীয় অবয়বের কারণে তাঁকে খুব সহজেই আল-কায়েদার নেতা হিসেবে চেনা যেত। তবুও তিনি সবধরনের আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে পাকিস্তানের শহরাঞ্চল মুলতান, ফয়সালাবাদ, লাহোর ইত্যাদিতে সফর করেন। লাহোর সফরের সময় তাঁর লিখিত বইটির কয়েকটি কপিও তাঁর সাথে ছিল। তিনি তানযিমে ইসলামের নেতা ডাক্তার ইসরার আহমেদ, জামায়াতে ইসলামির নেতা কারী হুসাইন আহমেদ এবং লস্করে তইয়্যেবার নেতা হাফিয মুহাম্মাদ সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি নিজ কিতাবের কিছু অংশ তাদেরকে পড়ে শোনান এবং জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি ভুলের ওপর আছি, নাকি সঠিক? কেউই তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি। তখন শাইখ ঈসা জিজ্ঞেস করেন, "যদি আমার এসব কথা ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে কেন আপনারা পাকিস্তানের সেই সেনাদেরকে মুরতাদ বলছেন না, যারা কিনা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের মানুষদের ওপর শুধু ইসলামি প্রতিরোধযুদ্ধের সহায়তার কারণেই অপারেশন পরিচালনা করছে?"

কারী হুসাইন আহমাদ নাকি উত্তরে বলেছিলেন যে, মৌলিকভাবে যদিও আপনার কথাই সঠিক, কিন্তু বিদ্যমান অবস্থায় আপনার মতামত মেনে নিলে এর দ্বারা ভারত, আমেরিকা ইত্যাদি শত্রুদেরই বেশি উপকার হবে।[72] এই জাতীয় জবাবে শাইখ ঈসা তাঁর উদ্যম হারাননি। তিনি দেশের অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে মেলামেশা চালু রাখেন এবং এই সফরেই তিনি ইসলামাবাদের লাল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আবদুল আজিজের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। লাল মসজিদ সংলগ্ন খুব সাধারণ একটি জায়গা, যা ছিল ISI-এর হেডকোয়ার্টার থেকে বড়জোর এক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত, সেখানেই বসে তিনি মাওলানা আবদুল আজিজের নিকট তাঁর সেই একই প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করেন।

72. এটা ছিল ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। কীভাবে মুশরিক আর কাফিরদের উপকার হবে, তা স্পষ্ট করেননি।

মাওলানা আবদুল আজিজ ছিলেন একজন খোলামনের নম্র-ভদ্র মানুষ। শাইখ ঈসার কথাবার্তা এবং তাঁর রচিত গ্রন্থটি মাওলানার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করলো।

মাওলানা আবদুল আজিজ কোনো সাধারণ পর্যায়ের মৌলভী কিংবা সাধারণ কোনো ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খুব প্রিয়ভাজন মানুষ ছিলেন। কেননা, তিনি কাশ্মীরের জন্য হাজার হাজার যুবক প্রস্তুত করে দিতেন। প্রত্যেক বছর কাশ্মীরভিত্তিক জিহাদি সংগঠন 'হরকাতুল মুজাহিদিন'-এর নেতা এসে তাঁর নিকট অবস্থান করতেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাওলানার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মাদ্রাসাপড়ুয়া ছাত্ররা কাশ্মীর সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে যেত। তাছাড়া রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদের ইসলামপন্থী সেনা অফিসার ও সরকারি আমলাদের কন্যারা তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা মাদ্রাসা 'জামিয়া হাফসা'-তে অধ্যয়নরত ছিল। এছাড়াও তিনি মাওলানা আবদুর রশিদের সাথে ইসলামাবাদ শহরের নাগরিক অধিকার কমিটির প্রধান ছিলেন। এসমস্ত কারণে মাওলানা আবদুল আজিজ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে পরিগণিত ছিলেন।

শাইখ ঈসার বিশ্বাস ছিল যদি লাল মসজিদ থেকে বিদ্রোহ শুরু করা যায়, তাহলে পুরো পাকিস্তানব্যাপি ইসলামি বিপ্লবের সূচনা হবে। শাইখ ঈসা মাওলানা আবদুল আজিজকে এই দায়বদ্ধতা বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, এই কিতাবটি পড়বার পর এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আবদুল আজিজ খুব ধর্মপরায়ণ ও আবেগী মানুষ ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কাফির ঘোষণা করা মানে ছিল তাঁর (জাগতিক) সমস্ত-সুনাম, সুখ্যাতি-মান মর্যাদা মাটি হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সমস্ত সম্পর্কের ইতি ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু ইসলামি প্রতিরোধযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপারেশন পরিচালনা করা সত্ত্বেও তাঁদের সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ ছিল নিজের ঈমান আকিদাহকে জলাঞ্জলি দেওয়া। মাওলানা আবদুল আজিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ঈমানের পক্ষেই রায় দিলেন।

এরপর মাওলানা আবদুল আজিজ তাঁর দারুল ইফতায় ফাতওয়া দিলেন —

"দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যকার) মৃত্যুবরণকারীদের জানাযা পড়ানো যাবে না, এবং তাদেরকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।"

মাওলানা আবদুল আজিজ এই ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন ২০০৪ সালে। এটাই সেই বিখ্যাত ফাতওয়া, যেটায় ৫০০ জন মুফতি সাহেব সাক্ষর করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ফাতওয়ার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শত শত সেনা তাদের অফিসারদের আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। হাজার হাজার সেনা অফিসার ও জাওয়ানরা চাকরি থেকে ইস্তফা নেওয়ার দরখাস্ত প্রদান করেন। এই অবস্থার ফলে তখন সেনাবাহিনী আত্নসমর্পণ করতে এবং যোদ্ধাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিল। এই আদর্শিক যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানি সেনাদের সামনে ঈমান আকিদাহের সঠিক পথ তুলে ধরা। আর তা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জন্য স্রেফ গোত্রীয় অঞ্চলে ব্যর্থ হওয়ার চেয়েও বেশি ভয়াবহ ছিল। এরপর মোশাররফ সরকার গোত্রীয় অঞ্চলে অপারেশন পরিচালনার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিভিন্ন স্থানের আলেমদের ক্রয় করে এবং মুজাহিদদের আকিদাহ-আমালের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করায়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে অবস্থিত আল-কায়েদার চিন্তাবিদরা সুকৌশলে তা প্রতিরোধ করেছিলেন। [73]

উজবেকিস্তান ইসলামি আন্দোলনের নেতা কারী তাহের ইয়ালদোচিভ সেসময় দেশত্যাগ করে এসে ওয়াজিরিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তিনি শাইখ ঈসার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাওলানা আবদুল আজিজের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। তিনি কয়েকজন উজবেক ব্যক্তিকে মাওলানার কাছে প্রেরণ করেন এবং লিখিত আকারে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর ফাতওয়ার প্রশংসা করে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন।

তিনি লিখেন —

> *“এটাই সর্বোত্তম সময়, যখন এই ফাতওয়াকে একটি সুসংহত আন্দোলনে পরিণত করা যায়। আপনি আপনার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করুন এবং তালেবে ইলম ও আলেমদেরকে ইসলামি বিপ্লবের জন্য, মুজাহিদিনের সাহায্যের জন্য এবং আফগানিস্তানের মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তাকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরোধিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।”*

শাইখ ঈসাও আবদুল আজিজকে নসিহত করেন যে, যুবকদেরকে পাকিস্তানের জন্য কাশ্মীরে না পাঠিয়ে বরং তাদেরকে সত্যিকার ইসলামি বিপ্লবের জন্য গড়ে তুলুন।

---

73. আল-কায়েদার আলেমগণ মোশাররফ সরকারের মদদপুষ্টদের ফাতওয়াগুলোর দালিলিক জবাব দিয়ে খণ্ডন করে দিয়েছিলেন। এর ফলে সাধারণ মানুষদের কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

এপ্রিল, ২০০৭। আমি লাল মসজিদ সংলগ্ন মাওলানা আবদুল আজিজের বাড়িতে এক গাছের ছায়ায় একটি চাটাইয়ের ওপর তাঁর পাশে বসে ছিলাম। তিনি ছাত্রদের বলছিলেন যে, তিনি সন্ধ্যায় বয়ান করবেন। মাওলানা আমাকে বলেন, “মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে নিয়মিত কিছু বয়ান করা আমার সাধারণ নীতি।” আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “মাওলানা! আপনি আফগান তরিকায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে নতুন কোনো তালেবান আন্দোলন শুরু করছেন না তো আবার?”

তিনি উত্তরে বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই করছি। এবং এটাই একমাত্র পথ, যার দ্বারা পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে। পাকিস্তান জাতিগত ও রাজনৈতিক কুসংস্কারের কারণে খুব দ্রুততার সাথে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার শিকার হতে যাচ্ছে।”

নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা প্রশাসনের কাছে রিপোর্টের পর রিপোর্ট দিচ্ছিল যে, লাল মসজিদ দেশে ইসলামি শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবি তুলছে। পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টগুলো এক্ষেত্রে আংশিক সত্য ছিল।

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ লাল মসজিদের খতিবদেরকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানে তালেবানপন্থী দেওবন্দি ঘরানার আনুমানিক ১৩ হাজার পাঁচশত মাদ্রাসা আছে। এগুলো সারা দেশে বিস্তৃত ছিল। আর সেগুলোতে প্রায় আঠারো লক্ষাধিক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছিল। লাল মসজিদের লক্ষ্য ছিল, এই মাদ্রাসাগুলোকে আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানের সহায়তা বন্ধের জন্য বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করা। এই কারণে লাল মসজিদ নেতৃবৃন্দের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল- পাকিস্তানের প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যেন পাকিস্তান আমেরিকাকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অবস্থানরত আল-কায়েদার চিন্তাবিদগণ মাওলানা আবদুল আজিজের মতো আলেমদের প্রতি মুরতাদ প্রশাসনকে স্পষ্টরূপে তাকফির সংক্রান্ত দাওয়াতি কার্যক্রমে জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য স্রেফ এই ছিল না যে, আলেমগণ এই বিষয়গুলো স্রেফ ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকেই খুতবায় তুলে ধরবেন। বরং তাঁরা যেন (ইসলামের এই অকাট্য) ইলমি ব্যাপারগুলো প্রায়োগিকভাবেও তুলে ধরেন এবং এই অনুযায়ীই কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন, আল-কায়েদার চিন্তাবিদগণ সেইদিকেই গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত মাওলানা আবদুল আজিজ পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এককভাবে বিভিন্ন বয়ান বিবৃতি জারি রাখেন। এর ভিত্তিতে ২০০৭ সালে লাল মসজিদ অবরোধ করা হয়। পাকিস্তানের সামরিক নেতৃবৃন্দ লাল মসজিদের আলেমদের নির্দেশ করেন, তাঁরা যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রাখতে সিকিউরিটি ফোর্সকে তাদের কাজে সাহায্য করে। এই পর্যায়ে পাকিস্তান প্রশাসনের ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য পাকিস্তান পুলিশ ইসলামাবাদ গেস্ট হাউজে অভিযান পরিচালনা করে, যেখানে বেশ্যাবৃত্তির কারবার চলতো। (লেখকের মতে) এর ভিত্তিতে লাল মসজিদের উচিত ছিল পাকিস্তান প্রশাসনের প্রশংসা করা। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য কাজ করে যাওয়া। লাল মসজিদ কর্মকর্তারা ইসলামাবাদের মার্কেটে গিয়ে অশ্লীল ফিল্মের সিডি ডিভিডির বিক্রয়কেন্দ্রগুলি গুড়িয়ে দেয়।[74]

এই সময়গুলোতে মাওলানা আবদুল আজিজ প্রায় প্রত্যেক দিনই দেশের সব মাদ্রাসাগুলোকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখেতেন। তিনি গণতন্ত্র এবং আমেরিকার War on Terror-এ পাকিস্তানের সহায়তার বিরুদ্ধে খোলাখুলি কথা বলতে লাগলেন। এবং ভয়হীনভাবে পাকিস্তানের শাসন পদ্ধতিকে কুফর আখ্যায়িত করলেন। সাথে এটাও বললেন যে, গোত্রীয় অঞ্চলে তালেবান আর আল-কায়েদার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করাও কুফরি।

লাল মসজিদ ইসলামাবাদের নাকের ডগায় বসে যা করছিল, তা প্রতিটি মানুষের উপলব্ধির বাহিরে ছিল। শুধু আল-কায়েদার প্রচারকরাই এই বিদ্রোহের চালিকাশক্তি ও তার কার্যকারণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পাকিস্তানের সরাকারী কর্মকর্তারা, বিশেষ করে ধর্মমন্ত্রী ইযাযুল হক খুব বেশি লাল মসজিদে আসা যাওয়া করছিলেন। আবদুল আজিজের পিতা মাওলানা আবদুল্লাহ এবং জেনারেল জিয়াউল হকের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল, এই সম্পর্ক তাদের সন্তানদের মধ্যেও ছিল।

---

74. যেখানে পাকিস্তান প্রশাসনের প্রতি কুফরির ফাতওয়া জারি হয়েছেই 'ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা না করা' এবং 'মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফির আমেরিকাকে সাহায্য করা'-এর ভিত্তিতে, সেখানে স্রেফ লোক দেখানো এক অভিযান দেখেই লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষ প্রশংসায় মেতে না উঠাটাই স্বাভাবিক।

লেখক নিজেই এই বিষয়গুলো ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছেন। আর পাকিস্তান প্রশাসন যদি সত্যিই ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো, তাহলে লাল মসজিদ কর্তৃপক্ষের অশ্লীল ফিল্মের দোকান গুড়িয়ে দেওয়া তো ইসলামি মূল্যবোধের সাথেই যায়। সেটা তো তাহলে কোনো অরাজকতা হয় না।

"মাওলানা! আমি আপনার কাছে হাতজোড় করে মিনতি করছি, আল্লাহর ওয়াস্তে এই সব ছেড়ে দেন। সর্বশেষ এর ফলাফলে এক কঠিন সংঘাত তৈরি হবে। আমি সমনে আগুনের সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।"

ইযাযুল হকের সব আবেদন ছিল নিষ্ফল। মাওলানা আবদুল আজিজ শীতল কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, *"আমি আমার অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও পেছনে হটবো না।"*

মন্ত্রীপরিষদের কিছু মন্ত্রী এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের চৌধুরী শুযাআত হুসাইন এই বিষয়ের নিস্পত্তির জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ব্যাপারে মোশাররফকে বোঝালেন।

সর্বশেষ মাওলানা আবদুল আজিজের মুরুব্বি ও প্রসিদ্ধ আলেম মুফতি তকি উসমানিকে ইসলামাবাদ এসে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য আহ্বান করা হলো। তকি উসমানি সাহেব করাচি থেকে ইসলামাবাদ আগমন করলেন। কিন্তু মাওলানা আবদুল আজিজ তাঁর অবস্থানে অটল থাকেন। [75] মোশাররফ প্রশাসনের সামনে আর কোনো বিকল্প ছিল না। চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হিসেবে কাবার ইমাম আবদুর রহমান আস সুদাইসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, হয়তো মাওলানা আবদুল আজিজ কাবার ইমামের কথা মেনে নিবেন। কিন্তু সুদাইসের প্রচেষ্টাও নিষ্ফল হয়। [76]

অতঃপর মোশাররফের সামরিক প্রশাসন লাল মসজিদে অপারেশন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিল। সৈন্য এবং পুলিশ সদস্যরা মিলে লাল মসজিদকে ঘেরাও করে ফেলল এবং লাল মসজিদের উস্তাদ ও ছাত্রদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিল। মাওলানা আবদুল আজিজ এবং তাঁর ভাই গাজী আবদুর রশিদ তাদের আদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রতিউত্তরে অনলবর্ষী বক্তব্য দিতে লাগলেন। মসজিদে মাত্র এগারোটি একে-৪৭ ছিল, কিন্তু মিডিয়ায় জানানো হলো যে, সৈন্যদের মোকাবেলা করার মতো অস্ত্রশস্ত্র এবং ফিদায়ি হামলাকারী প্রস্তুত আছে।

---

75. মুফতি তকি উসমানি পরবর্তীতে মিডিয়াতে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, মাওলানা আবদুল আজিজ তাঁর সমস্ত কাজ ইখলাসের সাথেই করছেন। কিন্তু তিনি নিজে মাওলানার পন্থাকে সঠিক মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে মুফতি তকি উসমানি এবং মাওলানা আবদুল আজিজের কর্মপন্থা নির্ধারণেরও বুনিয়াদি মাসআলা পাকিস্তান 'দারুল ইসলাম নাকি দারুল হারব' - এখানেই দ্বিমত ছিল। অতএব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁদের কর্মপদ্ধতিগত সিদ্ধান্তও একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

76. মূলত পাকিস্তানপন্থী আলেম মুফতি তকি উসমানি এবং সৌদপন্থী সুদাইসকে এনে মোশাররফ সরকার অভিযান পরিচালনার আগে জনসাধারণের কাছ থেকে একপ্রকার বৈধতা আদায় করে নেয়।

সৈন্যরা এরপর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন 'হরকাতুল মুজাহিদিন'-এর নেতা মাওলানা ফজলুর রহমান খলিলকে লাল মসজিদের অভ্যন্তরে পাঠালেন, যেন তিনি তাদেরকে মানিয়ে নিতে পারেন। ফজলুর রহমান খলিল তাদেরকে সতর্ক করে বললেন, "তোমরা নিজেদের বোকামির কারণে পুরো বিশ্বের দৃষ্টিকে লাল মসজিদের ওপর নিবদ্ধ করে রেখেছো, এবং সেনাদের অপারেশনে বাধ্য করেছো। এই অপারেশন থেকে রক্ষা পাবার একটিই পথ - অস্ত্র সমর্পণ করো।" তিনি তাদেরকে এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হবে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের জামিন মঞ্জুর করা হবে।

লাল মসজিদ অবরোধ হওয়ার পর মাওলানা আবদুল আজিজ উপলব্ধি করলেন যে, খুব বেশি সময় এখানে আর টিকে থাকা যাবে না। তিনি প্ল্যান করলেন যে, তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে তাঁর সঙ্গীরা সহজে অস্ত্র সমর্পণ করে ফেলতে পারবে আর তিনি বাহির থেকে আন্দোলন পরিচালনা করবেন। তিনি বোরকা পড়ে গোপনে মাদরাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাঁকে চিনে ফেলল এবং গ্রেপ্তার করে সেই অবস্থাতেই সরকারি টিভির সামনে তাঁকে অপমান করা হলো।

আবদুল আজিজের পালানোর চেষ্টার কথা শুনে ওয়াজিরিস্তানের আল-কায়েদার নেতারা উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং উজবেক কমান্ডার কারী তাহের ইয়ালদোচিভ নিজে গাজী আবদুর রশিদ ও তাঁর সহযোগী আবদুল কাইউমকে ফোন করে সতর্ক করলেন যে, তাঁরা যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে। এটাই এই বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। যদি তারা অস্ত্র সমর্পণ করে, তাহলে এই ইসলামি বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। গাজী আবদুর রশিদ সেই নির্দেশনাই পালন করলেন। [77]

---

77. এই প্যারায় উল্লেখিত বক্তব্য আদৌ সত্য কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। কেননা, লাল মসজিদ অভিযানের শুরুতেই ফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া যাবতীয় নেটওয়ার্কও ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘেরাওয়ের ফলে কেউ আসা-যাওয়া করাও ছিল দুরূহ। এই অবস্থায় নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে সুদূর ওয়াজিরিস্তান থেকে কারও ফোন করার ব্যাপার আকাশকুসুম জল্পনা ছাড়া আর কিছুই না।

বাস্তবতা হলো, মাওলানা আবদুল আজিজের বেরিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে গাজী আবদুর রশিদ আর তাঁর সঙ্গীরা নিজেরাই লাল মসজিদে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা আগামী ইসলামি বিপ্লবের জন্য জাতিকে উজ্জীবিত করার ব্যাপারটি নিজেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তাঁদের আত্মত্যাগ কবুল করে নিন।

এরপর অপারেশন শুরু করে গাজী আবদুর রশিদ, তাঁর সঙ্গী, তাঁর মা এবং মাওলানা আবদুল আজিজের ছেলে শহীদ করে দেওয়া হয়।

এভাবে লাল মসজিদ অপারেশন দেশের পরিস্থিতিকে যেন চিরকালের জন্যই একেবারে বদলে দিল। এই অপারেশন নতুন সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করলো, যা পরবর্তীতে সমস্ত (মডারেট) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠনকে প্রত্যাখ্যান করে। তবে এর মধ্যেও আল-কায়েদা ও মাওলানা আবদুল আজিজের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছুও ছিল। আর তা হলো, অন্যান্য ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর মাদরাসাগুলো থেকে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও লাল মসজিদের সাহায্যার্থে একজন শিক্ষার্থীও বেরিয়ে আসলো না। অথচ আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ সেখান থেকে এক নতুন তালেবান আন্দোলনের প্রত্যাশা করেছিলেন। এমনকি ইসলামাবাদ আর রাওয়ালপিন্ডির আঠারোটি মাদ্রাসায়ও কোনো হৈচৈও হলো না। [78]

78. লাল মসজিদের ঘটনা থেকে পাকিস্তানসহ পুরো বিশ্বের সাধারণ ইসলামপ্রিয় জনতা যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো যেন ঠিক ততটাই নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই 'লাল মসজিদ' এর ঘটনা ৯/১১-এর মতোই পাকিস্তান এবং বিশ্ববাসীকে আরেকবার দুই ভাগে ভাগ করে দেয়। একদল আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতি আপোষহীন হয়ে যায়। আর অপরদল এই কর্মপন্থাকে সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে দেখে কট্টরপন্থা আখ্যায়িত করে এবং মডারেট আকিদাহ গ্রহণ করে।

বিদ্রোহের সূচনা

আল-কায়েদা লাল মসজিদের ঘটনায় সাহস হারায়নি। যখন লাল মসজিদ শহীদদের দাফন পর্ব চলছিল, তখন আল-কায়েদা সোয়াত উপত্যকায় দলের অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল। সোয়াত তখন তেহরিকে নেফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদীর নেতা মাওলানা ফজলুল্লাহর হাতে ছিল। আর তিনি ছিলেন সূফী মুহাম্মাদের জামাতা। সূফী মুহাম্মাদকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল যে, তিনি ২০০১-এ আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 'অবৈধভাবে' হাজার হাজার যুবককে আফগানিস্তানে পাঠিয়েছিলেন।

আল-কায়েদা তখন ময়দানশাহ থেকে মুফতি আফতাবকে সোয়াতে পাঠিয়ে দিল, যাতে নিজ দলের সোয়াতে থাকা যোদ্ধাদেরকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। তাই এভাবে বলা যায় যে, লাল মসজিদের রক্তাক্ত ঘটনার পর সোয়াত আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্রেফ ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। আর মাওলানা ফজলুল্লাহও সোয়াত অঞ্চলে আল-কায়েদার নেতা ছিলেন না। এখানে আল-কায়েদার প্রকৃত নেতা ছিলেন বিনইয়ামিন।

যেসব লোক ISI-এর বন্দী অবস্থায় বিনইয়ামিনের সাথে ছিল, যারা তাঁর নেতৃত্বে সোয়াতে কাজ করেছে এবং যারা তাঁকে ছোটবেলা থেকেই চিনতো, তারা সবাই বিনইয়ামিনের দুটো বিষয়ে একমত হয়ে যেত — ধারালো মেজাজ, আর হৃদয়কাড়া চোখ। বিনইয়ামিনের উচ্চতা ছিল ছয় ফিট ছয় ইঞ্চি, প্রশস্ত বুক, উজ্জ্বল গায়ের রঙ আর ঘন চুল। তাঁর চিত্তাকর্ষক চোখদুটো ছিল আল্লাহ প্রদত্ত (নেয়ামত)।

মুফতি আফতাব বিনইয়ামিনের ব্যাপারে বিভিন্ন রিপোর্ট একত্রিত করলেন এবং আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠালেন। রিপোর্ট দেখে আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে বিনইয়ামিনই সেই ব্যক্তি, যে ভবিষ্যতে সোয়াত উপত্যকায় পাকিস্তানি প্রশাসনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে।

আল-কায়েদা এই যুদ্ধকে এমন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল, যখন পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তা করতে পারবে না।

আল-কায়েদার নির্দেশনা আর বিনইয়ামিনের তেজোদ্দীপ্ততা একত্রিত হয়ে গেল। ফলে সোয়াতে ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলন চলমান ছিল, তা অচিরেই বিদ্রোহে রূপ নিল।

এটা কমান্ডার বিনইয়ামিনের সৌভাগ্য ছিল নাকি দুর্ভাগ্য ছিল, তা বলা যায় না - তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোয়াতের পিউচার উপত্যকায়, যা ছিল যুদ্ধবাজদের দুর্গ। তাঁর সম্পর্ক ছিল কমলগাঁওয়ের সাথে।

বাহলুলঝাঈ গোত্রে জন্মগ্রহণ করা বিনইয়ামিন কোনো যোদ্ধা বা কবি ছিলেন না। মেট্রিকের সময়ই তিনি স্কুল ছেড়ে দেন। যৌবনের শুরুতেই আফগানিস্তানে চলে যান এবং তালেবানের সঙ্গে আহমাদ শাহ মাসউদের উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথম যুদ্ধেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ প্রায় সাত বছর উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অমানবিক কারাগারে অতিবাহিত করেন। বিনইয়ামিনের অনেক তালেবান সঙ্গী যে তাঁর সামনেই কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেছিল, তা তাঁর ঠিকই মনে ছিল। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের সেই সাত বছরের কারাজীবন তাঁকে অতটা মেজাজী বানায়নি। পাঞ্জশিরের জেল থেকে মুক্তি পাবার পরও তিনি স্বাভাবিক ও নম্র-ভদ্র ছিলেন, সর্বদা এগিয়ে গিয়ে মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতেন।

বিয়ে-শাদী আর প্রেম ভালোবাসা সবসময়ই ছিল একজন পশতুনের জীবনের একান্ত এবং ব্যক্তিগত বিষয়। গ্রামাঞ্চলে বেড়ে ওঠা কোনো পশতুন সাধারণত কখনও মনের এই দিকটাকে প্রকাশ করতো না। কিন্তু বিনইয়ামিন উচ্ছ্বাসভরে বলতেন যে, বিয়ের আগেই তাঁর স্ত্রী তাঁর প্রেমের জালে আটকে গিয়েছিলেন, আর আফগানিস্তানে আটক থাকা অবস্থায়ই তাঁদের বাগদান হয়। কিন্তু গোত্রের সব মানুষ তাঁর স্ত্রীর বাগদান ভেঙ্গে দিয়ে অন্য কারও সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পশতুন ঐতিহ্যের বিপরীতে গিয়ে সেই মেয়ে তার পরিবারের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে এবং জানায় যে, সে বিনইয়ামিনকেই বিয়ে করতে চায়।[79]

সাত বছর পর জেল থেকে মুক্তির পেয়ে বিনইয়ামিন গ্রামে ফিরে আসেন এবং সবার আগে বিবাহ সম্পন্ন করেন। তিনি বলেন, *"বিয়ের পর আমি কারাজীবনের সমস্ত কষ্ট ও ব্যাথা নিমিষেই ভুলে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যে, আমার কিছুই হয়নি।"*

---

79. বিয়ের ক্ষেত্রে নারীরা নিজ পরিবারের সাথে দ্বিমত করা ইসলামে নিষিদ্ধ কিছু নয়।

এভাবেই এক প্রেমময়ী স্ত্রীর সাথে তিনি নতুন জীবন শুরু করলেন। তাঁর এক ছেলে সন্তানও হলো এবং তিনি পেশোয়ার চলে গেলেন।

মোশাররফ সরকারের সময় বিনইয়ামিন নিষিদ্ধ ঘোষিত করা সশস্ত্র সংগঠন জাইশে মুহাম্মাদে যোগদান করেছিলেন। আফগানিস্তানের জেল-ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় তাঁর জানাশোনা বেশি থাকায় তাঁকে জেল বিষয়ক ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আফগানিস্তানের জেলে বন্দী থাকা সঙ্গীদের মুক্তি নিয়ে কাজ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

২০০৩-এর ডিসেম্বরে যখন পরপর দুইবার মোশাররফের হত্যাচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন মুজাহিদদের জীবনে এক নতুন বাঁক আসে। তাদের সাথে অপরাধীদের মতো আচরণ করা শুরু হয়। যে প্রশাসন পাকিস্তানের মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় সহায়তাকারী ও কল্যাণকামী ছিল, তা তখন সম্পূর্ণ বদলে যায়। ফলে অনেক জিহাদি এই পন্থা থেকে পিছিয়ে আসে, আবার অনেকে সরকার বিরোধী হয়ে যায়। বিনইয়ামিন ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের অর্থাৎ সরকার বিরোধী।

২০০৪-এ আগস্টের এক রাতে পাকিস্তানের সিকিউরিটি ফোর্স পেশোয়ারে বিনইয়ামিনের ঘরে এক অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করে। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে ঘুমোচ্ছিলেন। অন্য ঘরে ছিল দুই মুজাহিদ — আসিফ চকওয়ালী এবং মুফতি সগির। আসিফ ও সগির পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পুলিশ ঘরে ঢুকে বিনইয়ামিন ও তাঁর স্ত্রীকে পাকড়াও করে এবং টেনে হিঁচড়ে গাড়ির কাছে নিয়ে যায়। বিনইয়ামিন অধোঘুম থেকে জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু যখনই দেখলেন তাঁর স্ত্রীর গায়ে পরপুরুষের হাত লেগেছে, অমনি তিনি আহত বাঘের মতো সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। ডজন খানেক সৈন্য বেশ কষ্ট করে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করলো।

তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে জেলে বন্দী করে রাখা হলো। পরবর্তীতে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে দেওয়া হলেও বিনইয়ামিন সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে তাঁর স্ত্রীর লাঞ্ছিত হওয়ার কথা ভুলতে পারলেন না। মোশাররফ হত্যাচেষ্টা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি জিজ্ঞাসাবাদকারীদের প্রশ্নের জবাবে তাদের মুখে থুতু নিক্ষেপ করতেন এবং মুক্তির পর তাদের চৌদ্দগোষ্ঠী ধ্বংস করার হুমকি দিতেন। এজন্য তাঁকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

তাঁর জিজ্ঞাসাবাদকারী তাঁকে উল্টো লটকিয়ে পেটায়, কিন্তু তিনি বারবার একই কথা বলতে থাকেন যে, *“যদি একবার আমি এখান থেকে মুক্তি পাই, তাহলে অবশ্যই আমি এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো।”*

দুই মাসের জিজ্ঞাসাবাদ ও কঠর শাস্তির একপর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদকারী আর জেলার ক্লান্ত হয়ে গেল, এবং তাঁকে ISI-এর কারাগারের একটি নির্জন সেলে বন্দী করে রাখা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলাও হলো না, কোনো শুনানিও হলো না। তিনি আড়াই বছর এই নির্জন কয়েদখানায় একাকি কাটালেন। সেসময়ের মধ্যে আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ বা শাস্তি - কিছুই হলো না। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা সামান্যও হ্রাস পায়নি। কারাগারের প্রহরীরা তাঁর মৌখিক আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন; এমনকি তাঁর হুমকি-ধমকি নিয়ে ঠাট্টাও করতেন।

মুক্তির কিছুদিন পূর্বে যখন তিনি তাঁর কাপড়-চোপর আর ব্যবহার্য সামগ্রী গোছাচ্ছিলেন, তখন কারাগারের এক প্রহরী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, *“বিনইয়ামিন! যদি তুমি আমাকে কোনোদিন রাস্তায় হাঁটতে দেখো, তাহলে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে?” বিনইয়ামিনের চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তিনি স্পষ্টভাষায় উত্তর দিলেন, “আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব।”*

২০১০ সালে তালেবানের একজন উচ্চপদস্থ নেতা আমাকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দাওয়াতি পরিস্থিতি তখন এমন ছিল যে, সেখানে একজন সাধারণ মানুষ বিশ দিনের মধ্যেই তাকফির-সংক্রান্ত আকিদাহের ধারক হয়ে উঠে। যখনই বিনইয়ামিন ISI-এর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তখনই তাঁকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ডাকা হলো। সেখানে তাঁর মেজাজকে ইসলামিক আদর্শে সঠিকপথে পরিচালিত করার দীক্ষা দেওয়া হলো। সেসময় মুফতি আফতাব আল-কায়েদার দূত হিসেবে সোয়াতে অবস্থান করছিলেন।

‘বিনইয়ামিন একজন যোদ্ধা, যার জন্ম হয়েছে ইসলামের জন্য, এবং ইসলামের জন্যই তাঁর জীবন উৎসর্গিত’ - আল-কায়েদার দাঈদের নিকট বিনইয়ামিনের জীবনের এছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ইসলামের ব্যাপারে বিনইয়ামিনের জ্ঞান সাধারণ প্রকৃতির ছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ছিল অবর্ণনীয় পর্যায়ের। আর আল-কায়েদা সেটিকে ইসলামের জন্যই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিনইয়ামিনকে তাঁর ক্যাম্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসহ আরব ও উজবেক যোদ্ধাদের একটি দল দেওয়া হলো। তাঁর প্রথম দায়িত্ব ছিল খুব সাধারণ। তাঁকে মাওলানা সূফী মুহাম্মাদের দল 'তেহরিকে নেফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদী'-এর নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে তুলে নিতে হবে, যা সূফী মুহাম্মাদের গ্রেপ্তারির কারণে সেসময় ফজলুল্লাহর নিয়ন্ত্রণে ছিল। হাজার হাজার মানুষ তেহরিকে নেফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা কিনা সোয়াত ও মালাকান্ডে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠায় সুদৃঢ়ভাবে আন্দোলনরত অবস্থায় ছিল। বিনইয়ামিনকে সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হলো।

লাল মসজিদ অপারেশনের পর আল-কায়েদা পার করছিল এক অস্বস্তিকর সময়। অনেক লোক মারা গিয়েছিল এবং ইসলামাবাদে আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র উদ্দেশ্যপূরণের আগেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। একজন মানুষও বিদ্রোহের জন্য দাঁড়ায়নি। মাওলানা আবদুল আজিজ অপমানিত অবস্থায় বন্দী হয়েছিলেন আর মাওলানা আবদুর রশিদকে অন্যান্য শহীদদের সাথে সমাহিত করা হয়েছিল।

এই অবস্থায় উসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের জন্য একজন নেতা নির্ধারণ করলেন। তিনি হলেন আবদুল হামিদ ওরফে আবু উবাইদাহ আল-মিশরী। উসামা বিন লাদেন তাঁকে নির্দেশনা দিলেন, যতদ্রুত সম্ভব বিদ্রোহী আন্দোলন সুবিন্যস্ত করতে। অন্যদিকে আল-কায়েদা তার মধ্যপ্রাচ্যের ডোনারদেরকে জরুরি ভিত্তিতে সাদাকা করে ফান্ড গঠন করতেও তাগাদা দিল।

ফান্ড সংগ্রহ সমাপ্ত হতেই আল-কায়েদা সবগুলো ইউনিটে সমস্ত অর্থ বন্টন করে দিল। সেগুলোর মধ্যে বাইতুল্লাহ মেহসুদ এবং বিনইয়ামিনের ইউনিটও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে জুলুমবাজ প্রাশাসনিক কাঠামোকে ভেঙ্গে (বা দুর্বল করে) দেওয়া। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করা। তিনিই পাকিস্তানের একমাত্র রাজনীতিবিদ ছিলেন, যিনি লাল মসজিদ অপারেশনকে সমর্থন করেছিলেন। তাছাড়াও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যস্ততায় আটকে রাখার জন্য সোয়াত উপত্যকায় বিদ্রোহের সূচনা করা আবশ্যক ছিল।

তাই লাল মসজিদ অপারেশনের পরপরই আল-কায়েদা নিজ যোদ্ধাদের সোয়াতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার নির্দেশ দিল। ফলস্বরূপ, লাল মসজিদের শহীদদের দাফনের তৃতীয় দিনেই সোয়াতে বিদ্রোহের সূচনা হয়ে গেল।

সোয়াত উপত্যকার ইমামঢারিতে মাওলানা ফজলুল্লাহ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা বিষন্ন হয়ে বসা ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের কী সমস্যা হয়েছে?" (লাল মসজিদ অপারেশনের পরপরই আমি তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সোয়াতে পৌঁছে গিয়েছিলাম, যা আমার ধারণায় পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে যাচ্ছিল।) মাওলানা ফজলুল্লাহ আমাকে অভিযোগ করে বললেন, "দেখুন তো, প্রশাসন আমার এফএম রেডিও স্টেশন নিয়ে আপত্তি করছে। আমি তাদের আপত্তি মানি না। আমার রেডিও স্টেশন সম্পূর্ণ অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে আমি শুধু ইসলামি বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে থাকি। অথচ কতো কতো রেডিও স্টেশন আছে, যেগুলো একে তো অবৈধভাবে চলছে, এর ওপর আবার গানবাজনা আর অশ্লীল সব প্রোগ্রাম প্রচার করে যাচ্ছে। অথচ সরকার ওগুলোর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে না।" মাওলানা ফজলুল্লাহর এই বিশ্লেষণ আমাকে অবাক করে দিল।

ইতোপূর্বে সোয়াতে বেশ কয়েকবারই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। যোদ্ধারা অশ্লীল নাটক-সিনেমার দোকান ভাঙচুর করেছিল আর প্রশাসনের ওপর প্রশ্ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তদুপরি লাল মসজিদ অপারেশনের পর প্রথম প্রতিক্রিয়া সোয়াত উপত্যকাতেই সূচিত হয়। সেখানে যোদ্ধারা একটি সেনাদলের ওপর হামলা করে বসে।

ফজলুল্লাহ বলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর মতপার্থক্য আছে। কেননা, তিনি মনে করেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্রিটিশ উপনিবেশবাদেরই ধারাবাহিকতা। কিন্তু তিনি সংঘর্ষের ঘটনাগুলোর সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। যখন আমি সেইদিনই হওয়া হামলার আলোচনা তুললাম, তখন ফজলুল্লাহ বলতে লাগলেন, "*সেনাদলের ওপর আজকের হামলার ক্ষেত্রেও আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে, আমি আগেও মাওলানা আবদুল আজিজের সাথে ছিলাম, এখনও আছি। কিন্তু আমাদের এটা মানতে হবে যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বিষয়টা শাসকদের দায়িত্ব, সাধারণ মানুষের নয়।* [৪০] *আমাদের দাবি শুধু এটুকুই যে, পাকিস্তান সরকার যেন ইসলামি আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। ব্যাস, আর কিছু না।*"

ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে আমি যখন তাঁর বিরুদ্ধে উগ্রবাদ প্রচারের অভিযোগ তুললাম, তখন তিনি বললেন, "সোয়াতে তো অন্যান্য গ্রুপও কাজ করে, যাদের ওপর তাঁর

---

৪০. আর শাসকবর্গ ইসলাম কায়েম না করলে এমন শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলিম জনগণের দায়িত্ব। এই ব্যাপারটিকেই কিছুটা ঘুরিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

কোনো কথা চলে না (অর্থাৎ, তাহলে তাকেই কেন দোষারোপ করা হচ্ছে)। এরপর ফজলুল্লাহ সাহেব যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, ওজর হিসেবে বললেন, "আমাকে এখনই গিয়ে আমার রেডিও স্টেশন থেকে এই ঘোষণা করতে হবে যে, সদ্যঘটিত হামলার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এবং সোয়াতের জনগণের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপস্থিতির ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। আমি এই অঞ্চলের মানুষের সাথে ধারাবাহিক সম্পর্ক রক্ষা করে যাচ্ছি এবং আমি তাদেরকে জবাবি হামলা আর উগ্রতা ছড়ানো বন্ধ করতে বলছি।"

সোয়াতে যোদ্ধাদের সাথে কিছু দিন থেকে আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, ফজলুল্লাহ ও তাঁর দলের চিন্তা শুধু সোয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। আসলে সেটা সোয়াতের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। আর তা ঐ সময় থেকেই, যখন ষাটের দশকে সোয়াতরাজ্য পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনকার আগ পর্যন্ত সোয়াতের আদালতগুলো ইসলামি আইনেই পরিচালিত হতো। তবে এটাও স্পষ্ট যে, সোয়াতের বাহিরে যোদ্ধারা তালেবান প্রতিরোধযুদ্ধের সেভাবেই সহায়তা করতো, যেভাবে বেলুচিস্তান ও পাখতুনখোয়ার যোদ্ধারা করতো। সোয়াতে জিহাদি জযবার জোয়ার থাকা সত্ত্বেও বিপ্লব ছিল এক প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। তাই ২০০৭-এর ডিসেম্বরে সেনাবাহিনীর প্রথম অপারেশনেই মাওলানা ফজলুল্লাহর দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অবস্থা পরিবর্তিতও হয়ে গিয়েছিল।

সোয়াতে যুদ্ধবাজদের সবচেয়ে বড় যে দলটি ছিল, সেটাকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা নাম দেয় 'তোরা-বোরা গ্রুপ'। কেননা তাতে স্থানীয় পশতুন, উজবেক, আরব — সবধরনের যোদ্ধাই ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন বিনইয়ামিন।

২০০৭-এর ডিসেম্বরে ফজলুল্লাহ গ্রুপের পতনের পর বিনইয়ামিন এক বড় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। আর ২০০৮-এর জানুয়ারিতে এসে লোকেরা অবাক হয়ে গেল যে, সোয়াতের এই দরবেশমনা লোকগুলো হঠাৎ কেমন বদলে গেল। বিনইয়ামিনের দল সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করলো, এবং গ্রেপ্তার হওয়া সৈন্যদের জবাই করলো। তিনি এই জবাইয়ের দৃশ্যের ভিডিও ধারণ করলেন এবং সবগুলো মিডিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবেই কারী হুসাইন ও বিনইয়ামিন মিলে সোয়াতে পাকিস্তানের আগ্রাসী বাহিনীর জন্য ত্রাস ছড়িয়ে দিলেন।

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সোয়াতের পুলিশ স্টেশন একেবারে নির্মূল হয়ে গেল এবং সেনাসদস্যরা সোয়াতে পোস্টিং হওয়ার ব্যাপারে ভয় করতে লাগলো। একপর্যায়ে পাকিস্তান প্রশাসন স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু যেই অস্ত্র ওঠাতো, তার মৃত্যু লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। বেরলভীদের প্রসিদ্ধ নেতা পীর সামিউল্লাহ ও তার মুরিদদেরকে পাকিস্তান প্রশাসনের পক্ষ থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার মুরিদরা সেসব কোনো কাজে লাগানোর আগেই দরবারে হামলা করা হলো। পীর সামিউল্লাহ আর তার বেশকিছু মুরিদ মারাও পড়লো।

বিনইয়ামিনের তোরা-বোরা গ্রুপ সোয়াতের সবগুলো ব্যাংক এবং পেশোয়ার থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন নিয়ে আসা গাড়িগুলো লুট করে। এভাবে তিনি নিজস্ব অস্ত্রাগার তৈরি করেন এবং তাঁর অধীনস্থ যোদ্ধাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করেন।

২০০৮-এর শেষ নাগাদ পুরো সোয়াত বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং প্রশাসন অসহায় হয়ে পড়ে। সরকারি সরবরাহের সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় সেনাবাহিনী সব সাধারণ চেকপোস্ট খালি করে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে অবস্থান নেয়, যেখান থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য এই অবস্থা একদম কানাগলির মতো ছিল। এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম খবর প্রচার করে দেয় যে, সোয়াত তালেবানের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে।

রাওয়ালপিন্ডির মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে বসে থাকা বাকরুদ্ধ মিলিটারি কমান্ডার হয়রান ছিলেন যে, এখন কী করবেন। তবে এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, অনেক বড় সেনাবাহিনী ছাড়া অপারেশন পরিচালনা করা অসম্ভব। কিন্তু সেজন্য ভারতীয় সীমান্ত থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে আনতে হবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিস্টরা বহু জল্পনা-কল্পনার পর এই ফলাফলে পৌঁছলো যে – এখন সমাধান একটিই, সোয়াতে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার দাবি আপাতত মেনে নেওয়া।

ISI-এর অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি সেকশনের মতে এই কাজ সূফী মুহাম্মাদের মাধ্যমে করানো যেতে পারে। সূফী মুহাম্মাদের সাথে ISI-এর আগের থেকেই ভালো সম্পর্ক ছিল, তাই তাকে বিলাসবহুল অবস্থান দেওয়া হয়েছিল। সূফী মুহাম্মাদকে জেলে রেখে এটা দেখানো হয়েছিল যে, ২০০১-এ আমেরিকার বিরুদ্ধে হাজার হাজার যুবককে প্রেরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ISI-এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তাকে তুরুপের তাস হিসেবে রেখে দেওয়া, যাতে প্রয়োজনের সময়

ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বাস্তবে সূফী মুহাম্মাদ ISI-এর এজেন্ট ছিলেন না। তিনি সত্যিকারার্থে একজন সাধাসিধে মুসলিম ছিলেন, যিনি সোয়াতে ইসলামি আইনের বাস্তবায়ন কামনা করতেন। আর তেমনটা তো সোয়াতে আগেও ছিল। তবে একইসাথে নিঃসন্দেহে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আর ১৯৯০-এ বেনজির ভুট্টোর প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য রেশম সড়ক বন্ধ করার মাধ্যমে তাকে ধূর্ততার সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর আর কর্নেলেরা সূফী মুহাম্মাদকে এই কথার প্রবক্তা বানালেন, তিনি সোয়াতে চলমান উগ্রতার নিন্দা করবেন এবং তার জামাতা ফজলুল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিবেন। যেহেতু সূফী মুহাম্মাদই ফজলুল্লাহকে গড়ে তুলেছিলেন এবং হাজার হাজার যোদ্ধারা তার জন্য উৎসর্গিত ছিল, তাই ISI-এর পূর্ণ ভরসা ছিল যে, সূফী মুহাম্মাদ সোয়াতের দায়িত্ব সামলে নিলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে অবস্থান করা আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ এই চালকে অন্য দৃষ্টিতে দেখলেন। আল-কায়েদা অত্যন্ত সফলতার সাথে তেহরিকে নেফাজে শরিয়তে মুহাম্মাদী দলটির যোদ্ধাদের চিন্তায় তাঁদের বিশ্বময় ইসলামি আন্দোলনের আদর্শ বুনে দিয়েছিল। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী একপ্রকার চোরাবালিতে আটকে গিয়েছিল। সরবরাহ পৌঁছাতে না পারার কারণে সেনারা যোদ্ধাদের পুনরায় সংগঠিত হওয়া থেকে বাধা দিতে পারলো না। উল্টো যোদ্ধারাই ন্যাটো আর ISAF[81] -এর বিরুদ্ধে নতুন নতুন অপারেশন শুরু করে দিল। অবস্থা আরও যখন শোচনীয় হলো, সাধারণ মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করলো। তারা যোদ্ধাদের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো যে, আমেরিকার আমদানি করা 'War on Terror'-এ যেন সহায়তা বন্ধ করে দেয়।

সূফী মুহাম্মাদের মুক্তি ও সক্রিয়তার সাথে একদিকে সোয়াত অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। অপরদিকে সেই সময়টায় সেনাবাহিনী নিজেদের সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণের সুযোগ পেতো। কিন্তু আল-কায়েদা সূফী মুহাম্মাদের বিরোধিতাও করতে চাইছিল না,

81. International Security Assistance Force (ISAF) আফগানিস্তানে ন্যাটো-নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক মিশন ছিল, জাতিসংঘ সুরক্ষা কাউন্সিল ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর মূল কার্যক্রম ছিল আফগান জাতীয় সুরক্ষা বাহিনীকে (এএনএসএফ) প্রশিক্ষণ দেওয়া।

আবার তাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্যকারী হিসেবেও দেখতে চাইছিল না। তারা চাইলো সূফী মুহাম্মাদকে নিজের করে নিতে এবং সোয়াতকে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করে ফেলতে।

২০০৯-এর জানুয়ারি নাগাদ সোয়াত উপত্যকার ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। কিন্তু (ISI-এর প্ল্যান মোতাবেক) সূফী মুহাম্মাদের আগমনে অবস্থা যেন পুরোপুরি পাল্টে গেল। প্রশাসনের চোখে গতকালই যে কিনা অপরাধী ছিল, একদিনের ব্যবধানে তাকেই পুরো সরকারি সম্মাননায় পেশোয়ার নিয়ে আসা হলো। সেখানে বসে সোয়াত মালাকুন্ড ও কোহেস্তানে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হলো। সূফী মুহাম্মাদ সাংবাদিকদের বললেন, *“আমরা শীঘ্রই (সোয়াতের) তালেবানের সাথে আলোচনায় বসবো এবং তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলবো। আমাদের আশা, তারা আমাদের কথা মেনে নিবে। আমরা নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত সোয়াতে থাকব।”*

রাওয়ালপিন্ডির মিলিটারি কমান্ডাররা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো - তারা সফলতার সাথে দাবার গুটি চালতে পেরেছে আর তখন পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে। মোল্লা ফজলুল্লাহ যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা করলেন। সোয়াতের জনজীবনে স্বাভাবিকতা নেমে আসলো। উপত্যকায় লোকেরা শুকরিয়া আদায় করলো।

কিন্তু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সোয়াতে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তারা এই বিষয়টিকে ভবিষ্যত পরিস্থিতির ‘প্রথম ধাপ’ আখ্যা দিয়ে দিল। এর জের ধরে পাকিস্তান কষ্টেশিষ্টে তার War on Terror-এর মিত্রদের একথা বোঝালো যে, সোয়াতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এর বিকল্প ছিল না। মিত্রদের মন জয় করার জন্য পাকিস্তান তার সৈন্যদের সোয়াত থেকে বের করে এনে গোত্রীয় অঞ্চলের ন্যাটো বিরোধী জিহাদি দলগুলোর বিরুদ্ধে আবার পোস্টিং দিয়ে দিল। “বিশ্বভ্রাতৃত্ব” এই পদক্ষেপের সমর্থন করলো।

এদিকে আল-কায়েদা সোয়াতের দ্রুত পরিবর্তিত এহেন অবস্থার প্রতি নজর রাখছিল। ইসলামের যে মনগড়া ভার্সন সোয়াতে বাস্তবায়ন করা হলো, তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। এছাড়া এই আশঙ্কাও ছিল যে, সোয়াতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেখান থেকে বেরিয়ে গোত্রীয় অঞ্চলে যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু করবে, ফলে আল-কায়েদার আফগানযুদ্ধে বিঘ্ন ঘটবে।

সোয়াতে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল-কায়েদার দূত উঠে দাঁড়ালেন। বিনইয়ামিনকে তাঁর ভূমিকা পালন করতে বলা হলো। যখন সবকিছুই আমেরিকা আর পাকিস্তানের প্ল্যান মোতাবেক চলছিল, তখন বিনইয়ামিন বাহিনী নিয়ে বোনাইর আক্রমণ করে বসলেন। সময়টা ছিল ২০০৯-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, আর বোনাইর হলো ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ৬৫ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। ফলে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি শেষ হয়ে গেল [82] এবং মিডিয়া হাইলাইট করতে শুরু করলো যে, 'ইসলামাবাদ এখন তালেবান নিয়ন্ত্রণ থেকে মাত্র ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত!' এভাবেই ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান প্রশাসনের জন্য ভালো হওয়া পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে এপ্রিলে এসে খারাপ হয়ে গেল।

প্রশাসন আরেকবার ময়দানে নেমে সূফী মুহাম্মাদকে খুঁজলো, কিন্তু কোথাও তার খবর পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টার পর তার ফোন যে রিসিভ করেছিল, সে তার সাথে প্রশাসনের যোগাযোগ করাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছিল।

অচিরেই পরিস্থিতি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লো; বিশেষ করে যখন সূফী মুহাম্মাদ নিরাপত্তা ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণা করলেন। প্রশাসন বিভিন্ন মাধ্যমে সূফী মুহাম্মাদকে খুঁজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু কোথাও তার পাত্তা পাওয়া গেল না। সূফী মুহাম্মাদের সহায়তা পাওয়ার জন্য সেক্যুলার-লিবারেল সুশীলদের আর সেনাবাহিনীর চাপের মুখেও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আসিফ জারদারি বাধ্য হয়ে মালাকুন্ড, সোয়াত ও কোহেস্তানে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন। কিন্তু সেটুকুই আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল না। বরং তাদের লক্ষ্য ছিল এমন এক পরিস্থিতি নিশ্চিত করা, যার ফলে পাকিস্তান আমেরিকার সহায়তা করা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শেষ পর্যন্ত যখন জনসমক্ষে সূফী মুহাম্মাদের আবির্ভাব ঘটলো, তখন সোয়াতের মেঙ্গুরা ময়দানে হাজার হাজার মানুষ তার বক্তব্য শোনার জন্য জমায়েত হয়েছে। সোয়াতের জনগণ ও পাকিস্তানের প্রশাসন — সবাই আশাবাদী ছিল যে, সূফী মুহাম্মাদ হয়তো বুনাইরে তালেবান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তৈরি হওয়া যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। কিন্তু যখন তিনি স্টেজে উঠলেন, তখন একা ছিলেন না। তার সাথে আটজন ফিদায়ি হামলাকারীও ছিল। বিনইয়ামিন সূফী মুহাম্মাদের নিকট এলেন এবং তার হাতে একটি লিখিত পত্র তুলে দিয়ে বললেন, *"এটা মুজাহিদদের পক্ষ থেকে, দয়া করে এটা পড়ুন।"*

---

82. যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি আল-কায়েদা কিংবা তার অনুগত কোনো দলের পক্ষ থেকেই ছিল না। বরং সেটা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একচেটিয়া রকমের এক সাজানো নাটক।

সূফী মুহাম্মাদ সন্তুষ্টচিত্তে নির্দেশ মান্য করলেন। এরপর তিনি সমাবেশ লক্ষ্য করে বক্তব্য শুরু করলেন। প্রতিটি শব্দই যেন ছিল একেকটি হুমকি। তার বক্তব্য নির্দয়ভাবে নিরাপত্তা চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করলো। সূফী মুহাম্মাদ বললেন —

"ইসলামে গণতন্ত্রের কোনো অবকাশ নেই। পশ্চিমা গণতন্ত্র কাফিরদের তৈরি ব্যবস্থা, যা মুসলিমদের আলেম ও সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত করে রেখেছে। সুপ্রিমকোর্ট-হাইকোর্ট ইত্যাদি সবগুলোই একেকটি মন্দির, যা আল্লাহর আইনের বিপরীত ইরতিদাদি [83] *শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে।"*

তিনি মালাকুন্ড ও কোহেস্তানের জজদের চারদিন সময় দিয়ে বললেন, "এর মধ্যেই মামলার শুনানির জন্য 'দারুল কাজা' [84] স্থাপন করতে হবে এবং সরকারের কাজী ও আদালতের বিরুদ্ধে ফয়সালা শোনাতে হবে।" সাথে এই দাবিও তুললেন যে, অন্যান্য জেলা ও অঞ্চলেও কাজী [85] নির্ধারণ করতে হবে।

তিনি হুঁশিয়ার করে আরও বললেন, *"যদি আমাদের দাবি না মানা হয়, তাহলে যা কিছু ঘটবে, তার দায় সরকারের। পুরো পৃথিবীতেই ইসলামি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, কেননা এই জমিন আল্লাহর এবং প্রচলিত আইন আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য।"*

এছাড়া আরও বলেন, *"প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় অ্যাসেম্বলির মৌখিক অর্ডিন্যান্স ছাড়া এই আইন বাস্তবায়নের কোনো বাস্তবতা নেই। কারণ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সহায়তা নেই।"*

সূফী মুহাম্মাদের এই বক্তব্য অবস্থা আমূল বদলে দিল। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম হৈচৈ শুরু করে দিল যে, সোয়াতে তালেবানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বৈশ্বিক খিলাফাতের সূচনা হয়েছে। আমেরিকার পক্ষ থেকে কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

আমেরিকার সিনেটর টেড কাউফম্যান (Ted Kaufman) বললেন, *"এখন আমেরিকার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানে তালেবানের মোকাবেলা করা। পাকিস্তান এখন একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"*

---

83. ইরতিদাদ শব্দের অর্থ দ্বীন থেকে বের করে দেয় এমন কথা, কাজ বা আমল।

84. ইসলামি আদালত

85. ইসলামি আদালতের বিচারক

এই সিনেটর আরও বলেন, *"সোয়াতের তালেবানের সাথে পাকিস্তানের চুক্তি আমাদেরকে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করেছে। প্রথমদিকে আমার ধারণা ছিল, সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পাকিস্তান সরকার তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই প্রস্তুত না। কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম, পাকিস্তানের মূলত এই শক্তি আর ক্ষমতাই নেই। পাকিস্তান সরকার আর সোয়াত তালেবানের মধ্যকার এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইসলামাবাদেও প্রভাব ফেলবে, যা এখান থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরেই অবস্থিত।"*

আল-কায়েদা নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য সংঘাতময় পরিস্থিতির সফল ব্যবহার করেছিল।

২০০৯-এর মে মাসে সোয়াতে দ্বিতীয়বারের মতো বড় অপারেশন শুরু হলো এবং সেনাবাহিনী অপারেশনের জন্য পথ প্রস্তুত করতে লাগলো। এই অপারেশনের ফলে সোয়াত এবং মালাকুন্ডের প্রায় দুই লাখ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের 'মংলা স্ট্রাইক ইউনিট'-এর সদস্যদেরও এই অপারেশনে শামিল করলো, ইতোপূর্বে যাদেরকে কেবল ভারত-বিরোধী লড়াইয়ের জন্যই ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও সেনাবাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিমানবাহিনীরও সহায়তা নিলো আর যোদ্ধাদের আস্তানায় নির্বিচারে বোম্বিং করলো। এবারের সোয়াত অপারেশনে এসএসজি কমান্ডাররাও শরিক ছিল।

শত শত যোদ্ধা ধরা পড়লো এবং কোনো মামলা মোকাদ্দমা ছাড়াই সবাইকে হত্যা করা হলো। এই যুদ্ধ ২০০৯-এর জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত চলমান ছিল। যোদ্ধারা পশ্চাদপসরণ করে হিন্দুকুশ এবং আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশ কুনার ও নুরিস্তানে চলে গেল।

কিন্তু আল-কায়েদার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এতেও সফলতা ছিল, কেননা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দৃষ্টি তখন মোহমান্দ আর বাজাউরের 'অপারেশন লায়ন হার্ট' থেকে প্রায় পুরোপুরিই সরে গিয়েছিল। ফলে সেখানকার যোদ্ধারা দ্বিতীয়বার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ ভালমতো কাজে লাগিয়ে পার্শ্ববর্তী আফগান প্রদেশসমূহে সফল হামলা চালানো শুরু করলো। এভাবেই পাকিস্তান বাহিনীর সফলতায় মোড়া সোয়াতের এই অপারেশনও আসলে ছিল আল-কায়েদার পরিপূর্ণ সফলতা। সোয়াতের সংঘাতময় পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে আল-কায়েদা অন্য জায়গায় (মোহমান্দ এবং বাজাউরে) নিজ লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। অথচ পুরো জাতির দৃষ্টি তখন ছিল সোয়াতে।

এই অবস্থায় পাকিস্তানের সেক্যুলাররা পাকিস্তানের ইসলামপন্থার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলো। তারা পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করার দাবি জানাতে থাকলো। পাকিস্তান প্রশাসন মডারেট সূফীদের ধর্মীয় সমাবেশ আয়োজন করলো। সেখান থেকে স্পষ্টভাবে তালেবানের বিরুদ্ধে বলা হলো। তালেবান ধাপে ধাপে এগুলোর জবাব দিল এই মডারেট সুফিদের প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতা সারফারাজ নুআইমিকে হত্যা করে।

এদিকে দিনদিন মনে হতে থাকলো যে, পরিস্থিতি যোদ্ধাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পর্দার অন্তরালে আল-কায়েদা পাকিস্তানি সমাজের আদর্শিক মতপার্থক্য থেকে ফায়দা উঠিয়ে ইসলামের সাথে অন্যসবের আদর্শিক বিভক্তিকে স্পষ্ট করে দিতে সফল হয়ে গেল। পাকিস্তানের ইসলামপন্থী এবং সেক্যুলারদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সংঘাতময় অবস্থান থেকে আল-কায়েদার লক্ষ্য ছিল এমন অবস্থা তৈরি করা, যাতে পাকিস্তানে সরকার পরিচালনা করাই অসম্ভব হয়ে যায়; এবং যাতে যোদ্ধারা বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখোয়ার কন্ট্রোল নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে পারে। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ এই উভয় প্রদেশকে ন্যাটোর বিরুদ্ধে নিজেদের যুদ্ধ অপারেশন এবং প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করতে চেয়েছিল।

সেই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরছাড়া হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ, নিহত হয়েছিল শত শত। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং পকিস্তান পরিপূর্ণভাবে আমেরিকান সাহায্যের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। আল-কায়েদা পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলসমূহ - বান্নু, লাক্কি মারওয়াত এবং পেশোয়ারের শহরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সফল ছিল, কিন্তু সাথে সাথে তাদের এটাও জানা ছিল যে, এই এলাকাগুলোয় তাদের নিয়ন্ত্রণ কয়েক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হবে না।

কিন্তু সেই অবস্থার সুযোগেই আল-কায়েদা ন্যাটোর রসদবহরে হামলা করেছিল, নিজ অনুগতদের পুনরায় সুসংগঠিত করে নিয়েছিল, আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছিল এবং আফগানিস্তানের প্রায় ৮০ ভাগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সফল হয়েছিল। অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে আমেরিকা আফগানিস্তানে অতিরিক্ত সৈন্য নামাতে বাধ্য হয়েছিল। আল-কায়েদার এহেন সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠুরতা মনে হলেও দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্রের (আমেরিকা ও ন্যাটো জোট) মোকাবেলা করতে এবং যুদ্ধকে ফলাফল পর্যায়ে নিয়ে যেতে এছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

ঈগলের বাসা তৈরি

যারা ২০০১-এ আমেরিকার আফগান হামলার পর তালেবান নিশ্চিহ্ন হওয়ার ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য দিয়ে আসছিল, তাদেরকে তালেবান ২০০৬ সালের মধ্যেই সফল প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পেরেশানিতে ফেলে দিয়েছিল। ২০০১ সালে তালেবান পিছু হটে হিন্দুকুশ এবং এর আশেপাশের পর্বতশ্রেণিতে গোত্রীয় এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

সেখানে তারা নতুন লোকদেরকে যোদ্ধা হওয়ার জন্য উজ্জীবিত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এর সাথে সাথে রসদ ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করে। ফলে তারা পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিল।

পশ্চিমা মিত্রশক্তি যখন এই ব্যাপার বুঝতে পারে, তখন নতুন কৌশলে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। কৌশলটির নামকরণ করা হয়েছিল Af-Pak Strategy। আমেরিকার এই কৌশল মূলত ছিল পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানকে ভবিষ্যতে একই যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করার বৈদেশিক পলিসি। এটা মূলত এই বাস্তবতারই সত্যায়ন ছিল যে, ডুরান্ড লাইনের কেবল পশ্চিমের পাহাড়ি এলাকাই নয়, বরং উভয়দিকের পাহাড়ি এলাকাই যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর দক্ষিণ ও মধ্যএশিয়া থেকে ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল করতে হলে এই এলাকায় পুরো শক্তি লাগিয়েই যুদ্ধ করতে হবে।

অভিজ্ঞ আমেরিকান কূটনীতিক, আমেরিকার পাকিস্তান ও আফগানিস্তান বিষয়ক রাষ্ট্রদূত রিচার্ড হলব্রুক (Richard Holbrooke) ২০০৮ সালের মার্চে 'আফ-পাক স্ট্র্যাটেজি' নামের এই কৌশলটি উদ্ভাবন করেছিলেন। ২০০৮-এর শেষদিকে তিনি এটি স্বীকার করে বলেছিলেন, *"সর্বপ্রথম আমরা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের এই সমস্যাকে 'আফ-পাক স্ট্র্যাটেজি' নামকরণ করছি। এর দ্বারা কোনোরকম করে কাজ শেষ করা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট করা এবং আমাদের মন-মগজে চিত্রায়িত করা যে, (আফগানিস্তান আর পাকিস্তান) উভয় দেশ মিলে একটিই রণক্ষেত্র।*

এই যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে ডুরান্ড লাইন অবস্থিত। যার পশ্চিমে ন্যাটো ও মিত্রশক্তি সফলভাবে লড়তে পারবে। আর পূর্বে রয়েছে সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র। এই পূর্ব দিক হতেই বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য ২০০৮ সালের পর থেকে

আমেরিকা নতুন পলিসি গ্রহণ করেছে, যার দ্বারা ন্যাটো ও মিত্রশক্তি ডুরান্ড লাইনের উভয় দিকেই সামরিক কার্যক্রম চালাতে পারবে। উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি নতুন সামরিক কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আর সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়েছে লাইনের উভয়পাশের জঙ্গিগোষ্ঠীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করা এবং তারপর তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলো নির্মূল করা।

একইসাথে আমেরিকা ও পাকিস্তানের গোপন চুক্তি হয়েছে, যার পরবর্তীতে পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় ড্রোন হামলায় আল-কায়েদার অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছেন। একটি রিপোর্ট অনুসারে, প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটন সফরে এই গোপন চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। চুক্তির পর পাকিস্তান ও আমেরিকা মিলে উচ্চ পর্যায়ের জঙ্গীদের তালিকা করে ড্রোন হামলায় পরস্পরের সহযোগিতার নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে।

এই চুক্তির পেছনে জারদারি সরকার ও পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আশফাক পারভেজ কায়ানীর এই চিন্তা কাজ করেছে যে, মুসলিম জঙ্গিগোষ্ঠী পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য ঘোরতর শত্রু ভারতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।” [86]

২০০৪-এর মে মাস থেকে ২০০৮-এর ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত (চার বছর তিন মাসে) পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় কেবলমাত্র ১৩টি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল। কিন্তু ২০০৮-এর ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২০১০-এর ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত (অর্থাৎ এক বছর সাত মাসেই) সেখানে পৃথক পৃথক লক্ষ্যবস্তুতে ৮৬টি ড্রোন হামলা পরিচালনা করা হয়। আফগানিস্তানের কুনার এবং নুরিস্তান প্রদেশে আমেরিকা ও পাকিস্তানের যৌথভাবে পরিচালিত এই ধারাবাহিক ড্রোন হামলার নাম দেওয়া হয় — ‘অপারেশন লায়ন হার্ট’ (Operation Lion Heart)। আর পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা বাজাউর ও মোহমান্দে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী পরিচালিত ড্রোন হামলার নামকরণ করা হয়— ‘অপারেশন শেরদিল’ (অপারেশন লায়ন হার্ট-এর উর্দু অনুবাদ)। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের এই চারটি টার্গেটেড অঞ্চলই হলো হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

‘অপারেশন শেরদিল’ ডুরান্ড লাইনের পাকিস্তান পার্শ্বে ৩ লক্ষ অধিবাসীকে বাস্তুহারা করে দেয়। এই অভিযান ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। এরপর ন্যাটো ও পাক

86. David Ignatius, Washington Post, November 4, 2008

সেনাবাহিনী ঘোষণা দিয়ে দেয় যে, 'তালেবান আর আল-কায়েদাকে এই এলাকা থেকে নির্মূল করা হয়েছে।' কিন্তু যখন বসন্তের আগমনী বার্তা নিয়ে পাহাড়ের বরফ গলা শুরু হলো, তখন এই জঙ্গিগোষ্ঠীকে আগের চেয়ে ভয়ানক চেহারায় পুনরুত্থিত হতে দেখা গেল। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানে তাদের আক্রমণগুলো ন্যাটোর ভিতকে কাঁপিয়ে দিল। এমনকি ২০০৯-এর ৪ই অক্টোবরে কামদেইশ ও নুরিস্তানের আমেরিকান ঘাঁটির হামলায় আট আমেরিকান সৈন্য ও আফগান প্রশাসনের বহু সৈন্য নিহত হয়। এছাড়াও কমপক্ষে ৩০ জন আফগান সৈন্য বন্দী হয়। সেসময় আমেরিকা নুরিস্তানের চারটি ঘাঁটির তিনটিই খালি করে দিতে বাধ্য হয়। ২০০৯-এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এসে আফগান তালেবান নুরিস্তানে তাদের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃশ্য পুরো বিশ্বকে দেখাতে আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে আমন্ত্রণও জানায়।

২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের 'অপারেশন শেরদিল' শেষ হওয়ার পর ন্যাটোকে সাহায্য করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাজাউর ও মোহমান্দের গোত্রীয় এলাকায় ন্যাটোর স্থলবাহিনীতে যুক্ত হলো। কিন্তু এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থার এতটা অবনতি ঘটলো যে, আমেরিকা তখন আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের কোরাঙ্গাল উপত্যকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়ে দেয়।

এই ঘটনায় যোদ্ধাদের ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোরাঙ্গাল উপত্যকা থেকে পিছু হটার স্মৃতি মনে পড়ে যায়, যে ঘটনাকে আফগানে সোভিয়েত পতনের ভূমিকা হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। রুশ বাহিনীর কোরাঙ্গাল থেকে পিছু হটার পর মুজাহিদ বাহিনী কুনার থেকে শুরু করে কাবুলের তাগাব উপত্যকা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কঠিন আক্রমণ করতে থাকেন। মুজাহিদদের বক্তব্য অনুযায়ী, কাবুল পর্যন্ত তারা এত অধিক পরিমাণে হামলা পরিচালনা করেছিলেন যে — পরবর্তী তিন বছরের মধ্যেই সোভিয়েতরা গোপনে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

২০০৮ সালের আগস্ট মাস থেকে গোত্রীয় অঞ্চলে আমেরিকা ড্রোন দিয়ে বোমা হামলা করতে থাকে এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মিলে স্থলেও সামরিক কার্যক্রম চালাতে থাকে। এর ফলে ঐ এলাকায় মানবিক দুর্দশা শুরু হয়। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, বাজাউর, মোহমান্দ, খাইবার এজেন্সি এবং ওরাকযাই এজেন্সি থেকে আনুমানিক দশ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এতকিছুর পরও বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী এই দুর্বল তালেবান আর আল-কায়েদাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। আসলে এই

হামলাগুলোর ফলে হিন্দুকুশ আর তার আশেপাশের অঞ্চলে আল-কায়েদার অবস্থান বরং আরও বেশি শক্তই হয়েছিল। এই হামলার প্রত্যুত্তর দ্বারা আল-কায়েদা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, পরাজয় ছাড়াই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার সক্ষমতা রাখে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিখ্যাত প্রাণশক্তি আল্লামা ইকবাল লিখেছিলেন যে, "ভৌগলিক জ্ঞান এবং ঈগল পাখির ন্যায় স্বাধীনচেতা মনস্তত্ত্ব - যদিও এগুলো কোনো আন্দোলনের মূল উৎস নয়, কিন্তু আন্দোলন সফল হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বটে।" তিনি তাঁর কবিতা 'শাহীন'-এ লিখেন —

"আমি তো সেই বিজন প্রান্তরের কিনারে,
যেথায় সামান্য দানা-পানি আর জীবিকার আহারে,
পুলকিত হই মরু-স্তব্ধতার সুরে।
এ বৈরাগ্য আমার যুগ যুগান্তর ধরে
শিকারীর ন্যায় এদিক সেদিক ঝাঁপিয়ে আজও ফেরে,
খুনে উষ্ণতা ছড়ায় সারাটা শরীর জুড়ে।"

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী এই পর্বতশ্রেণিকে আশ্রয়স্থল বানানো আল-কায়েদা যোদ্ধাদের জীবনগুলো যেন ছিল আল্লামা ইকবালের সেই চিন্তাধারার এক বাস্তব প্রতিফলন। তারা হিন্দুকুশ পর্বতের গুহায় ঈগলের ন্যায় বসে থেকে তাঁদের শিকার - ন্যাটো আর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় থাকতো। শিকার নাগালে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়তো।

৯/১১-এর পর আল-কায়েদা সদস্যরা মোটাদাগে দু ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগ ছিল বহির্বিশ্বে সামরিক কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আল-কায়েদার বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত। আর অপর ভাগে ছিল তারা, যারা আমেরিকা ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে এক দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছিল। খালিদ শাইখ মুহাম্মাদ, রামযি ইউসুফ, আবু উবাইদাহ প্রমুখ বহির্বিশ্বের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত ছিলেন। তাই শহরাঞ্চলে অবস্থান কইরা তাঁদের জন্য অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল। পরবর্তীতে এই সদস্যরা পরবর্তীতে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে গ্রেপ্তার হন। অপরদিকে আল-কায়েদার সামরিক শাখার কমান্ডার, যেমন — খালিদ হাবিব ও আবু লাইস আল-লিব্বি প্রমুখ যারা

আফগানিস্তানের দীর্ঘ যুদ্ধের কৌশলের সাথে যুক্ত ছিলেন, তারা গোত্রীয় এলাকায় থাকতেন এবং পরবর্তীতে পাহাড়েই শাহাদাত বরণ করেন।

পাকিস্তানের শহরে হোক কিংবা গোত্রীয় এলাকায় হোক, আত্মগোপন করে করে জীবন অতিবাহিত করা আদৌ আল-কায়েদার সদস্যদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং আমেরিকার স্বার্থের বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করে যাওয়াই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। আল-কায়েদার যেসব সদস্য শহর থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাদের গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ এটাই ছিল যে — তারা ময়দানে সক্রিয় হয়েছিলেন এবং গোয়েন্দা সংস্থার নজরে পড়ে গিয়েছিলেন। একইভাবে যারা গোত্রীয় পাহাড়গুলোতে শহীদ হন, তারাও সক্রিয়ভাবে ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় অবস্থান করা ছিল আল-কায়েদার সামরিক সিদ্ধান্ত। আর গেরিলা যুদ্ধের জন্য পুরো পৃথিবীতেও পাকিস্তান-আফগানিস্তানের এই এলাকাগুলোর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা নেই। এটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এমন এক ভূখন্ড, যেখান থেকে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক উভয় প্রকারের যুদ্ধই করা সম্ভব। এই অঞ্চলে এমন এমন গোপন পথও রয়েছে, যেখান থেকে শত্রুর ওপর আচমকা আক্রমণ করে একেবারে লুকিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। যখন আল-কায়েদা পশ্চিমা সৈন্যদেরকে নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে তুলছিল, সাথে সাথে এমনই উপযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন করাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এটি আরব্য রজনীর সেই জাদুর দূর্গের ন্যায় এতটাই দুর্ভেদ্য এবং গোলকধাঁধাঁময় যে, শত্রুর জন্য এখানে এসে সফল হয়ে ফেরা যেন অসম্ভবের চেয়েও কঠিনতর এক ব্যাপার।

ন্যাটো এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদার সফলভাবে লড়াইয়ের জন্য হিন্দুকুশ ও তার আশেপাশের পর্বতশ্রেণির মতো এমন সুবিধাবহুল এলাকা পৃথিবীতে নজিরবিহীন — হোক এর তুলনা ইয়েমেনের পাহাড়ি এলাকার সাথে, ইরাকের মরুভূমি, শহর কিংবা সোমালিয়ার গহীন জঙ্গলের সাথে। এই সুবিশাল পাহাড়ি অঞ্চল পাকিস্তানের পশ্চিমের বেলুচিস্তান প্রদেশের দিকে দক্ষিণে হেলানো, আর পশ্চিমে আরব সাগরের দিকে ইরান সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে স্রেফ প্রাকৃতিক কারণেই পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্রে সাজানো প্রশিক্ষিত সৈন্যবহর নিয়ে অথবা সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স অভিযান করে সফল হওয়া যেন দুঃসাধ্য। এই এলাকায় শুধু পাহাড়ি ঈগলের ন্যায় স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ছোট ছোট গেরিলা গোষ্ঠীই লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

তালেবানের রণকৌশল

হিন্দুকুশ পাহাড়, কুনার, বাজাউর ও মোহমান্দে একটি দীর্ঘ সফর করলেই বোঝা যায়, এই পর্বতশ্রেণিতে যুদ্ধ করার অর্থ আসলে কী! একদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী, বৃহৎ ও সর্বাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনী আর অপরদিকে পৃথিবীর দরিদ্রতম জঙ্গিগোষ্ঠী।

আমি কুনার উপত্যকায় আমার সাংবাদিকতার কাজের প্রায় শেষদিকে পৌঁছে গিয়েছিলাম, এমন সময় আমার মেজবান (আমন্ত্রণকর্তা) যুবাইর আমাকে সেই গ্রামে (সারকানো জেলায়) সম্ভাব্য হামলার ব্যাপারে জানালেন। যুবাইর, আমি আর অন্য দুজন তালেবান সদস্য মাগরিবের নামাজ আদায় করে বেরিয়ে পড়লাম। দিনটি ছিল ২০০৮-এর ১৫ই মে। আমরা মোহমান্দ পৌঁছাতে গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ি পথ ধরে এগোতে লাগলাম।

আমি শহুরে হওয়ায় পাহাড়ি পথে চলার ব্যাপারে ধারণা ছিল কম। আমার জন্য তালেবান সদস্যরাও আস্তে হাঁটছিল। আমরা যখন সফর শুরু করি, তখন সবুজ উপত্যকায় সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ করে বোমা হামলা ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা গাছের নিচে লুকিয়ে পড়লাম। আমাদের মাথার ওপর আকাশে গানশিপ হেলিকপ্টার উড়ছিল, তাই আমরা সামনে এগোতে পারছিলাম না। আমরা মোটামোটি নিশ্চিত ছিলাম যে, নিকটস্থ কোনো গ্রামে তালেবানের কোনো একটি দল ন্যাটোর অবস্থানে হামলা চালিয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন গ্রামে হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের জানা ছিলনা। এগিয়ে যাওয়ার আগে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে, লড়াইটা ঠিক কোথায় হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্রোন বিমানের আওয়াজ হেলিকপ্টারের আওয়াজের সাথে মিশে গেল। তাই আমরা দ্রুত চলা শুরু করলাম। তালেবানের হামলার পর ন্যাটো বাহিনী সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার করার জন্য আক্রান্ত এলাকায় ছড়িয়ে যায়। আমরা এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাচ্ছিলাম না। তাই সহজে পাকিস্তানে প্রবেশ করার লক্ষ্যে নতুন একটি গন্তব্যের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আমার পথপ্রদর্শক তালেবান সদস্যরা আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টায় থাকলেন যে, আমরা অতিদ্রুত একটি নিরাপদ বাড়িতে পৌঁছে যাব। কিন্তু এই গভীর অন্ধকারে আমি জীবনের ব্যাপারে কোনো ভাল আশা করতে পারছিলাম না। ছোটখাটো উপত্যকা, পাহাড়ি নদী

আর পাথুরে এলাকা পেরিয়ে শেষোমেশ আমরা গাছগাছালিতে ঘেরা একটি এলাকায় পৌঁছলাম। কাছে গিয়ে একটি মাটির কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। সেটিই নাকি ছিল তালেবান সদস্যদের নিরাপদ বাড়ি!

আমার তালেবান পথপ্রদর্শক যুবাইর ওয়ারল্যাসে সংক্ষিপ্ত কথা শেষে আমাকে জানালেন যে, *“কোরাঙ্গাল উপত্যকায় বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকটি স্থানে ন্যাটোর ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোহমান্দ বর্ডারের কাছাকাছি নাওয়াপাসও রয়েছে। এখান দিয়ে আমরা পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে আসা-যাওয়া করতাম।”*

যুবাইর আরও বললেন, “নতুন অবস্থা তৈরি হওয়ায় আমরা বাজাউরের দিকে দীর্ঘ পথ অবলম্বন করে পাকিস্তানে প্রবেশ করবো। আমরা পূর্ব দিকের বদলে পশ্চিম দিক অবলম্বন করলাম। তালেবান বিপদের সময়ে ঠিক এভাবেই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে। তাদের যদি পাকিস্তানের মোহমান্দের দিকে লড়তে হয়, তাহলে তারা বাজাউরের দিক দিয়ে আসা-যাওয়া করে। সামান্য পথ চলার পরেই আমার কিছুটা বুঝে আসলো যে, কেন আধুনিক প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী এই বিস্তীর্ণ এলাকায় সফল হতে পারছে না। তালেবান পুরো পথই নিজেদের অধীনে আগলে রেখেছে, যেখান থেকে তারা বিদেশি সেনাবাহিনীর ওপর নজর রেখে অনেক কম ক্ষতির বিনিময়ে সফল আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। এরপরও যদি কোনো আক্রমণকারী বিদেশি বাহিনী এই সংকীর্ণ গিরিপথ, স্রোতস্বিনী নদী আর ঘন জঙ্গলে এই পায়ে হাঁটা যোদ্ধাদের অনুসরণ করতে বের হয়, তাহলে এই ধাঁধাঁময় পথই তাদের জন্য ‘মৃত্যুর ফাঁদ’ হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

যুবাইর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি গিরিপথ নির্বাচিত করলেন। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল বাজাউর। এই পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আমার মনে হলো, এই রাস্তা নিজেই এর সত্ত্বাগতভাবে নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা ঘন গাছগাছালির মধ্য দিয়ে রাস্তা বানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই সফরটি ছিল বেশ কঠিন। কাঁটাযুক্ত গাছের কাঁটা আমাদের জামা ভেদ করে চামড়ায় খামচির মতো উল্কি এঁকে দিচ্ছিল। যুবাইর জানালেন, আমেরিকা বিমান দিয়ে ওপর থেকে হামলা করলে লুকানোর জন্য এখানে অজস্র গুহা প্রস্তুত আছে, যেখানে কেউই কখনোই খুঁজে পাবেনা।

সকালে আমরা বিভিন্ন শাকসবজি কিনতে বাজাউরগামী গ্রাম্য লোকদের সাথে পাকিস্তানে প্রবেশ করলাম। তালেবানের সাথে একটি পাহাড়ের চূড়ায় ফজরের নামাজ আদায় করলাম। তখন সেখান থেকে পুরো এলাকা — কুনার, মোহমান্দ, নুরিস্তান ও

বাজাউর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তালেবানের এই এলাকা নির্বাচন বিরাট গুরুত্ব রাখে। এখানে এমন এলাকাও রয়েছে, যেখান দিয়ে মাসেও একজন মানুষ অতিক্রম করেনা। অথচ এই এলাকায় জীবনধারণের জন্য প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন অনেক উপাদান রয়েছে — ঝর্ণার পানি, ফলের গাছ, শাকসবজি এবং আরও অনেক কিছু....।

এই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা লোক সংগ্রহ করে তাদের সুসংগঠিত করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত জায়গা। আল-কায়েদার গুরুত্বপূর্ণ নেতা উসামা বিন লাদেন এবং ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি এই এলাকায় দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। ডা. জাওয়াহিরি এই এলাকায় অবস্থানকালে দুইবার চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং CIA তাঁকে লক্ষ্য করে ব্যর্থ ড্রোন হামলাও চালিয়েছিল। আজ-জাওয়াহিরি বাজাউরে কোনো এক জনবহুল এলাকায় যোদ্ধাদের রাতের খাওয়ার আয়োজনে শরিক হয়েছিলন বলেই তাঁকে চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়েছিল।

আসলে যদিও এই অঞ্চলে আল-কায়েদার নেতৃবৃন্দের অবস্থান সম্পর্কে আমেরিকা জানতেও পারতো, কিন্তু তবুও তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কোনো সামরিক কার্যক্রম চালাতে সক্ষম ছিলনা। আমেরিকা হিন্দুকুশ পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকবার বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত পাকড়াও করার জন্য অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই তাদের বাহিনী তালেবানের গেরিলা বাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়ে পরাজিত হয়েছে।

হিন্দুকুশের 'গেরিলা' জগত

হিন্দুকুশের কয়েকটি ছোট পর্বতশ্রেণি (ইসপিনগড়, তোরা-বোরা পাহাড়, সুলেমান পর্বতশ্রেণি এবং টোবা কাকড়) মিলে একটি রাস্তা সৃষ্টি করে, যেটি পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা এবং আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশ হয়ে বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী এলাকায় গিয়ে বের হয়। এটি পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরানের সীমান্তে আরব সাগর ও ভারত সাগর পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। এটি এমন বিস্ময়কর জায়গা যেখানে পুরো পৃথিবীই লুকোতে সক্ষম। এই এলাকা দিয়ে যে কেউই অনায়াসে নিরাপত্তাবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানে আসা-যাওয়া করতে পারবে। এই এলাকায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে মুজাহিদরা সফলতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। এরপর এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল আফগানিস্তানের তালেবান শাসনামলে তালেবান সরকারের অধীনস্থ ছিল। আর এখন এটি তালেবান আর আল-কায়েদার একটি নিরাপদ স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাকিস্তানের সাতটি গোত্রীয় এলাকা ব্রিটিশ আমলে আফগান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (buffer state) হিসেবে ছিল। কাগজ কলমে তাদের শাসন করতো একজন 'পলিটিকাল এজেন্ট', যিনি ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়া) গভর্নরের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ভারত বিভাগের পরও সামান্য কম-বেশি সীমানা নিয়ে এই এলাকাগুলো নিরপেক্ষই থেকে যায়। নির্ধারিত 'পলিটিকাল এজেন্ট' তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্থলে খাইবার পাখতুনখোয়া গভর্নরের প্রতিনিধিত্ব করা শুরু করে। কিন্তু আগের মতোই গোত্রীয় এলাকায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আইনই প্রয়োগ হতে থাকে। এখানে শাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল গোত্রের সর্দাররাই।

২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানের পিছু হটার পর আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সফলতার সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে আল-কায়েদা তার সামরিক, আদর্শিক ও অর্থনৈতিক সকল শক্তি এই অঞ্চলে প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছিল। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ আত্নবিশ্বাসী ছিল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী আর উন্নত অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীও এই দুর্গম এলাকাতে তাদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না। ৯/১১-এর আগে পাকিস্তান কখনও পশ্চিম সীমান্তের এই গোত্রীয় এলাকায়

সেনাবাহিনী নামানোর প্রয়োজনও মনে করেনি। কিন্তু ৯/১১-এর পর আমেরিকা চাপ সৃষ্টি করে এখানে ৮০,০০০ সেনা পাঠাতে বাধ্য করেছিল। আর সময়ের সাথেসাথে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিল, ৯/১১-এর পর এখানকার অবস্থা বদলে যাবে এবং পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। এজন্য ২০০১-এর পরবর্তী সময়ে আল-কায়েদা এই অঞ্চলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। ২০০২ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এজন্যই তাদেরকে আফগানিস্তানের যুদ্ধের ময়দানে তেমন দেখা যায়নি।

আল-কায়েদা এই এলাকায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরেই আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মনযোগ দেয়। আল-কায়েদা আফগানিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য পুরো দুই বছর ব্যয় করে। একই সময় তারা লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ নিজেদের সুবিধাজনক ভূমি তৈরি করে নেয়; যাতে প্রয়োজনে আমেরিকা এবং পাকিস্তান উভয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই লড়াই করতে পারে।

প্রথমদিকে আল-কায়েদার প্রভাব-প্রতিপত্তি কেবল উত্তর-দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান আর বাজাউরের সামান্য অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আল-কায়েদা অত্যন্ত সতর্কতা ও কৌশলের সাথে এমন অবস্থা তৈরি করে যে, রাষ্ট্রের নির্ধারিত পুরোনো রাজনৈতিক এজেন্টদের বদলে স্থানীয় যোদ্ধাদেরকে দেখা গেল। এরপর আল-কায়েদা একই কৌশল পাকিস্তানের অন্যান্য গোত্রীয় এলাকায় প্রয়োগ করলো। ২০০৮-এর মধ্যে পাকিস্তানের সাতটি গোত্রীয় এলাকাই আল-কায়েদা সমর্থিত যোদ্ধাদের অধীনে চলে গেল।

২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আল-কায়েদা তার প্রচেষ্টা জারি রাখলো। এই সময়টায় পাকিস্তান নিজ গোত্রীয় এলাকায় আল-কায়েদার অবস্থান শক্ত করা থেকে সময়ে সময়ে বাঁধা দিতো; তাছাড়াও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একটি সংগঠনের কার্যক্রমের চেয়ে সবসময় উন্নতই হতো। কিন্তু আল-কায়েদার মতো আদর্শভিত্তিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক কার্যক্রম ছাড়া কেবল সামরিক আক্রমণ চালিয়ে পরাজিত করা যে সম্ভব না— এই বাস্তবতা পাকিস্তান সরকার বুঝতে পারেনি। ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান বেশ কয়েকবার সামরিক অভিযানও চালিয়েছে। কিন্তু সেইসব সামরিক কার্যক্রমে দূরদর্শী চিন্তাধারা ও সঠিক কৌশলের অভাব ছিল। একদিকে মোশাররফ সরকার কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম ও জাতীয় সাহায্য-সহানুভূতি ছাড়াই এই জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ করে চলছিল, অপরদিকে আল-কায়েদা

ইসলামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে সেটাকেই নিজেদের মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছিল। এই কারণেই তারা প্রাথমিক পরাজয় ও পিছু হটার পরও দ্বিতীয়বার উত্থান ঘটাতে সক্ষম হয় এবং বাজাউর, ওরাকযাই, কুররাম, মোহমান্দ ও খাইবার এজেন্সিতে সফলভাবে সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, জঙ্গিগোষ্ঠী দূরদর্শী কৌশল ও চিন্তাধারা মাথায় রেখে কাজ করেছে। অপরদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সীমাবদ্ধ চিন্তা ও কর্মকৌশল নিয়ে অভিযান চালিয়েছে। এর সাথে আরেকটা বিষয় ছিল, যা শেষপর্যন্ত আল-কায়েদার জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে।

৯/১১-এর পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্ণধারেরা ভেবেছিল যে, আমেরিকা হয়তো পাঁচ বছরের মধ্যেই পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে। এইরকম চিন্তা মাথায় রেখে মোশাররফ সরকার জিহাদি এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ চালু রেখেছিল। তাঁদের মধ্যে মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা সামিউল হক হাক্কানি, হাফিয সাঈদ, কাযী হুসাইন আহমাদ এবং মাওলানা ফজলুর রহমান খলিলের মতো বড় বড় উলামায়ে কেরামগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মোশাররফ এই আলেমগণকে পাঁচ বছর নীরব থাকার অনুরোধ করে বললো যে, পাঁচ বছরের মধ্যে অবস্থা বদলে যাবে। মোশাররফ ভেবেছিল, আমেরিকা সুবিধা করতে না পেরে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। তখন পাকিস্তান আবার আফগানিস্তানে ইসলামপন্থীদেরকে সাহায্য করার পুরোনো পলিসি গ্রহণ করবে আর তখন সেটি কাশ্মীরে পাকিস্তানের ভারতবিরোধী আন্দোলনকে এক অনন্য শক্তিশালী করে তুলবে। এই ধরনের সৈনিকসুলভ চিন্তাধারার কারণে পাকিস্তান গোত্রীয় এলাকায় জিহদি গোষ্টীগুলোর বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তি দিয়ে লড়াই করা থেকে বিরত থেকেছিল। আর পাকিস্তান সেনাবাহিনীও জিহাদি গোষ্ঠীর সাথে মারাত্মক ধরনের শত্রুতা করার প্রয়াস চালায়নি। তারা এই চিন্তায় বিভোর ছিল যে, আমেরিকা চলে গেলেই গোত্রীয় এলাকায় আরেকবার সম্পর্ক স্থাপন করবে।

কিন্তু এমন চিন্তাধারা আদৌ উত্তপ্ত হতে থাকা পরিস্থিতির সঠিক ব্যাখ্যা ছিল না। আমেরিকা কোনোভাবেই পাঁচ বছরের মধ্যে আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার পাত্র ছিলনা। আর বাস্তবেও পাঁচ বছর পর যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে; আর আমেরিকার জন্য নিকট ভবিষ্যতে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার চিন্তা করাটাও মুশকিল হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সকল আধুনিক রাজনীতিপন্থীরা ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে যায়। বিশেষত পাকিস্তান সরকার এই পরিস্থিতিতে এসে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, লড়াই করা ব্যতীত কোনো পথই খোলা থাকে না। কিন্তু

ততদিনে জল অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। সময় এবং সুযোগ উভয়টিই হাতছাড়া হয়ে গেছে। যোদ্ধারা প্রতিরক্ষা শক্তিতে এমন উন্নতি করেছিল যে, তারা নিজস্ব কৌশলে লড়াই করতে এবং শত্রুকে ইচ্ছেমতো ময়দানে নামিয়ে আনতে সক্ষম ছিল। প্রথমদিকে তারা তাদের কার্যক্রম খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান প্রদেশের কিছু শহর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছিল। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক কার্যক্রম বিস্তৃত করলো, তখন আল-কায়েদাও তাদের কার্যক্রম শহরে বিস্তার ঘটালো। জিহাদি নেটওয়ার্কের এই সামরিক কৌশল পাক সেনাবাহিনীর নেতৃবন্দকে চিন্তায় ফেলে দিল। আল-কায়েদার যোদ্ধারা প্রাদেশিক জেলার বড় বড় শহরগুলোতে হামলা চালিয়ে সেখানে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে শুরু করলো। এমনকি ২০০৮-০৯-এর দিকে তো লোকেরা বলাবলিও করতে লাগলো যে, পেশোয়ারেও তালেবানের শাসন এসে যাবে।

এর আগে ২০০৭ সালের জুলাইতে আল-কায়েদা ইসলামাবাদের লাল মসজিদে নতুন রণাঙ্গনের অবস্থা সৃষ্টি করে পাক সরকারের পায়ের নিচের মাটিতে কম্পন সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এরপর আল-কায়েদা তার সামরিক কার্যক্রম পুরো পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিল এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধের দরজা খুলে দিল। আল-কায়েদা ২০০৯-এর জানুয়ারির মধ্যে সোয়াতের পর্যটন এলাকা থেকে শুরু করে বুনের জেলা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। বুনের থেকে ইসলামাবাদ মাত্র ৬৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই সকল হামলা ও পরিকল্পনা পাক-আফগান সীমান্তে পশ্চিমা সেনাবাহিনীর ঘাঁটি উচ্ছেদ এবং আল-কায়েদার শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ছিল।

পেরেশানিতে থাকা পাকিস্তান সেনাবাহিনী আল-কায়েদার কৌশল বুঝতে ভুল করলো। তারা আল-কায়েদার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের পরাজয় সহজ করে ফেললো। এমনই সময়ে পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধারা আফগানিস্তানে আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তির ওপর মরণঘাতী সব হামলা করলো। তখন ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত প্রদানকারীদের বুঝে আসলো যে, যোদ্ধাদের প্রকৃত শক্তি কতোটা বেশি! ওয়াশিংটন থেকে তাৎক্ষণিক নতুন পলিসি অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো।

২০০৭-এর শেষে প্রণীত এই পলিসিতে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে গেরিলা-বিরোধী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানের ভেতর জিহাদি নেটওয়ার্কগুলো নিশ্চিহ্ন করতে এবং গ্রেপ্তার করতে সেনাবাহিনীর যোগ্যতা বৃদ্ধি করা এই পলিসির মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। এই পলিসির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আমেরিকা

শত শত প্রতিরক্ষা বিষয়ক অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক পাকিস্তানে প্রেরণ করলো। এই প্রশিক্ষকেরা পাকিস্তানে জায়গা কিনে সশস্ত্র বাহিনীকে গেরিলা-বিরোধী কৌশল প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলো। একইসাথে তারা জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর প্রশিক্ষণ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও গোয়েন্দা নিযুক্ত করলো। উভয় দেশের গোয়েন্দা সংস্থা নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পরস্পরকে শেখানোর ফলে উভয় দেশই উন্নত কৌশল অবলম্বনে অভিজ্ঞ হয়ে গেল। ২০০৮-এর আগস্টের মধ্যেই যুদ্ধের জন্য অভিজ্ঞ ও সুসংগঠিত একটি যৌথবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। এই যৌথবাহিনীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা পুরোনো তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে CIA-এর ড্রোনগুলো দিয়ে হামলা চালাতে শুরু করলো।

আমেরিকা ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ডুরান্ড লাইনের উভয় পার্শ্বে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সেনা অভিযান পরিচালনা করতে লাগলো। কিন্তু লাভের অঙ্কের চেয়ে রসদ ও শক্তির ক্ষয়ক্ষতিই বেশি হচ্ছিল। ২০০৮ সাল পর্যন্ত আল-কায়েদার আদর্শের দাওয়াত গোত্রীয় এলাকার যুবকদের মনের গভীর পর্যন্ত গেঁথে গিয়েছিল। গোত্রীয় এলাকার পর্বতশ্রেণি, গিরিপথ আর গুহায় তাদের কৌশলের প্রশিক্ষণ এতটাই ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, যোদ্ধারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতেও ভ্রুক্ষেপ করলো না। তাদের মধ্যে আল-কায়েদা পাহাড়ের এক চূড়া থেকে অপর চূড়ায় স্বাধীনভাবে উড়তে থাকা ঈগলের মতো মনোবল সৃষ্টি করে দিয়েছিল। সাথেসাথে ঘন জঙ্গল আর আকাশছোঁয়া পর্বত এর যোদ্ধাদেরকে বিশ্রাম এবং পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে পরদিন আবার যুদ্ধ করার জন্য সাহায্য করছিল। ২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ন্যাটো ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী যৌথভাবে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তিনটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হামলা চালায়। প্রত্যেকবার পাকিস্তান সেনাবাহিনী সফল হওয়ার দাবি করলেও বাস্তবতা সামনে আসার পর আল-কায়েদাকেই যুদ্ধ-কৌশল ও অভিজ্ঞতায় বিজয়ী বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

গোত্রীয় বিদ্রোহ: মূল যুদ্ধের আগের যুদ্ধ

আমেরিকার সিদ্ধান্ত প্রদানকারীরা ২০০৮-০৯-এ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে চলমান যুদ্ধকে একই যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করে। তারা পরিস্থিতির বাস্তবতা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছিল। ২০০৭ পর্যন্ত আফগানিস্তানের যুদ্ধ আল-কায়েদাকে নিজ শক্তি ও অবস্থান জোরদার করতে পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিল। যতদিনে আমেরিকা পরিস্থিতির বাস্তবতা বুঝতে পারলো, ততদিনে তাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। আল-কায়েদা ৯/১১-এর আক্রমণের পরপরই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে একই রণক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে যুদ্ধ শুরু করেছে।

আল-কায়েদার বক্তব্য অনুযায়ী, উভয় দেশে একই সময় যুদ্ধ না করার অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধের আগেই পরাজয় মেনে নেওয়া। আল-কায়েদা যদি পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় হিজরত না করতো এবং ন্যাটো ও পাক সেনাবাহিনীকে একই শত্রু জ্ঞান না করতো; তাহলে ২০০২ সালের মধ্যেই আফগানিস্তানে তাদের গেরিলা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতো এবং তালেবানের পিছু হটা যোদ্ধারা ২০০৩-এর আগেই সম্পূর্ণভাবে গ্রেপ্তার হয়ে যেত। কিন্তু আল-কায়েদা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে একটি রণক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিনা করেছিল এবং এটিই ছিল তাদের যুদ্ধের কৌশলের মূলভিত্তি। প্রথমদিকে গোত্রীয় এলাকায় নিজ অবস্থান ও আশ্রয় মজবুত করার দিকেই আল-কায়েদার মনযোগ নিবদ্ধ ছিল। যাতে প্রয়োজন হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও লড়াই করা যায়। কিন্তু সবসময়ই আল-কায়েদার মূল উদ্দেশ্য ছিল - আফগানিস্তানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ জানতেন যে, হিন্দুকুশের পর্বতশ্রেণিতে শক্ত অবস্থান ছাড়া এই যুদ্ধে সফল হওয়া সম্ভব নয়। ডুরান্ড লাইন (Durand Line) সম্পর্কে ভৌগলিক অধ্যয়ন এই ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী মিলনস্থলে আফগানিস্তানের প্রদেশ নানগারহর প্রদেশ পাকিস্তানের ওরাকযাই, খাইবার ও কুররাম এজেন্সির সাথে মিলিত হয় (কয়েকটি পাশ দিয়ে উভয়ের সীমানা মিলেছে)। আফগানিস্তানের প্রদেশ কুনার ও নুরিস্তান পাকিস্তানের মোহমান্দ, বাজাউর এজেন্সি ও চিত্রাল এলাকার সাথে এবং আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশ ও পাকতিকা সীমান্ত পাকিস্তানের উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সাথে মিলেছে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান

থেকে একটি রাস্তা অনাদিবাসী (সাধারণ) এলাকা হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বেলুচিস্তানে বের হয়, যেখানে কান্দাহার এবং হেলমান্দ প্রদেশের সীমান্ত।

আফগানিস্তানের প্রদেশসমূহের লোকদের সাথে তালেবানের রয়েছে এক অনন্য আত্মিক সম্পর্ক। একইভাবে উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা এবং দক্ষিণ-পূর্বের অনাদিবাসী এলাকা তালেবানের সাহায্যকারীদের মূল অঞ্চল।

আমেরিকা আর তার মিত্রশক্তির আফগানিস্তানে যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল, তালেবানের অধীনে থাকা আফগান প্রদেশগুলো দখল করা। এজন্য ন্যাটোর সেনাবাহিনী এবং তাদের কার্যক্রম আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই স্থির ছিল। আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপযুক্ত জায়গা থাকলে ২০০১ সালে তালেবান পিছু হটতো না। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের কুনার ও নুরিস্তান ব্যতীত বাকি সমস্ত এলাকাই উন্মুক্ত অঞ্চল, যেন ধু ধু করা মাঠ। আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বের কোনো প্রদেশই ধারাবাহিক গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয়।

অপরপক্ষে হিন্দুকুশ ও তার আশেপাশের পর্বতশ্রেণির অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রাকৃতিকভাবেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। এমন নিরাপদ গিরিপথ রয়েছে, যেখান দিয়ে তালেবান যোদ্ধারা হামলা করে ফিরে এসে শ্রান্ত হয়ে আবার আফগানিস্তানে ফিরে লড়াই করতে পারে।

হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণিতে বসবাসরত গোত্রগুলোতে সামাজিকভাবে যুগযুগ ধরে ইসলামি চিন্তাচেতনা বিদ্যমান ছিল। ইসলামের প্রতি এই আবেগ তালেবান ও আল-কায়েদার পিছু হটার সময় সাহায্য পাবার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। এর সাথে এলাকার ছত্রে ছত্রে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলো আল-কায়েদা ও তালেবানের যোদ্ধা তৈরির কেন্দ্র রূপে আবির্ভূত হলো।

কিন্তু ইসলামি জিহাদি নেটওয়ার্কগুলোর জন্য এখানকার প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাপনা ইতিবাচক হলেও একটি মৌলিক সমস্যা ছিল যে, এই সাতটি এজেন্সিতেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত গোত্রীয় সমিতি (জিরগা) নীতিমালা বিদ্যমান ছিল। আর আল-কায়েদার ভাল করেই জানা ছিল যে, আমেরিকার চাপে পাকিস্তান সরকার এখানে হস্তক্ষেপ করলে ভৌগলিক, আদর্শিক এবং অর্থনৈতিক সব প্রকারের ভিত্তিই ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য এই এলাকাগুলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণও বটে।

এই এলাকায় আনুমানিক ৩৩ লক্ষ লোক বসবাস করে, যারা জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩% হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের উৎপাদিত মোট রপ্তানিযোগ্য সম্পদে তাদের অংশ ১.৫%। এখানকার সাক্ষরতার হার খুব কম, ১৭.৪২% এরও কম; যা পুরো দেশের সাক্ষরতার হার ৪৩.৯২% থেকে অনেক কম।

গোত্রীয় এলাকা পাকিস্তানের অংশ হয়েছে একটি বিশেষ পলিসির ভিত্তিতে। এখানে পাকিস্তানের কোনো আইন প্রয়োগ করা হয়না। পাকিস্তান সরকার এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরোনো ঔপনিবেশবাদী আইন-কানুন জারি রেখেছিল। কিন্তু একইসাথে পাকিস্তান এই অঞ্চল এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল, যেভাবে কোনো সাম্রাজ্য একটি দুর্বল দেশ দখল করে ঔপনিবেশবাদী আগ্রাসন চালায়। ব্রিটিশ আমলের পুরোনো নিয়ম অনুসারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক এজেন্টের শাসন 'সংরক্ষিত এলাকা'-তে দেখাশোনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল — রাস্তা আর সরকারি দালানকোঠা এই পর্যন্তই, এর বাইরে আর কিছু না।

গোত্রীয় এলাকা নিজ নিজ রীতি অনুসারেই চলছিল। নির্ধারিত রাজনৈতিক এজেন্টরা যখন এই এলাকায় কাজ করতো, তখন তাকেও এই রীতিনীতি অনুসারেই থাকতে হতো। এজন্যই তাদেরকে 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' না বলে 'রাজনৈতিক এজেন্ট' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এজেন্ট এসব গোত্রের সাথে রাজনৈতিকভাবে মেলামেশা করতো। এমনকি আজ পর্যন্ত সেখানে কোনো থানা, কোর্ট-কাচারী বা পুলিশ ফোর্স নেই। গোত্রীয় রীতি অনুসারেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হতো। আর গোত্রীয় রীতিনীতির তত্ত্বাবধান জিরগা (গোত্রীয় সমিতি)-এর মাধ্যমে হতো।

কর প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো। কিন্তু সেসব সেবা-সুবিধা এমনিতেই দেওয়া হতো না। এর জন্য তাদেরকে একটি সামগ্রিক দায়িত্ব প্রদান করতে হতো। প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণকারী। এটাকে 'নিজ ভূমি রক্ষার দায়িত্ব' বলা যেতে পারে। যার মানে হলো, এসব অঞ্চলের সড়কগুলো নির্বিঘ্নে প্রাশাসনিক ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে এবং প্রচলিত আইন বাস্তবায়কারী এজেন্সিসমূহ ভিতরের কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য পূর্ণ স্বাধীন। যেমন 'ফ্রন্টিয়ার কর্পস' (Frontier Corps) একটি আঞ্চলিক মিলিটারি ফোর্স, যাদের অবস্থান কেবল পশতুনেই; আর তারা ভাড়াটে সিকিউরিটি ফোর্স।

গোত্রীয় জিরগার সাথে প্রশাসনের চুক্তিটা এমন ছিল যে, প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে সকল গোত্রের ঐক্যবদ্ধ দায়িত্ব হলো - নিজ এলাকাকে অপরাধী এবং দেশবিরোধী লোকদের আশ্রয়স্থল হতে দিবে না। এই চুক্তি কেউ ভঙ্গ করলে তার ওপর এফসিআর আইন (FCR Policy) প্রয়োগ করা হবে। কোনো গোত্র বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে গোত্রীয় নীতিমালার বিরোধী কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রথমে জিরগাকে সমাধানের জন্য ডাকা হতো। জিরগা তখন অভিযোগ আসা গোত্রের সর্দারকে সমাধানের জন্য উপযুক্ত সময় দিতো। সময়ের মধ্যে সমাধান না করতে পারলে অপরাধী গোত্রের সবাইকে শাস্তি দেওয়া হতো এবং তাদের থেকে সব ধরনের সেবা-সুযোগ ফিরিয়ে নেওয়া হতো। যদি তাতেও কাজ না হতো, তাহলে অপরাধীর নিকটাত্মীয়দেরকে শাস্তি দেওয়া হতো। তাদেরকে এফসিআর আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করা হতো। আর তাতেও কাজ না হলে প্রশাসন তাদেরকে নজরবন্দী করতো এবং তাদের দোকানপাট বাজেয়াপ্ত করে দিতো। তাতেও কাজ না হলে সামরিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হতো।

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ গোত্রীয় এলাকাকে নিজেদের দিকে মনযোগী করতে গোত্রীয় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করলো। তারা গোত্রের মধ্যে এই মনোভাব ছড়িয়ে দিল যে, তারা ভিনদেশীদের মতো পরাধীনতার মধ্যে বসবাস করছে। তাদেরকে দেশের নাগরিক হিসেবে যথাযথ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। তাদের আসলে উচিত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। আল-কায়েদার আলেমগণ পাকিস্তান সরকারকে 'মুরতাদ' ফাতওয়া দিল। কেননা পাকিস্তান সরকার আফগানিস্তানে ন্যাটো ও মিত্রশক্তির অংশ ছিল। এরপর আল-কায়েদা পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে সাতটি এজেন্সিতেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোত্রগুলোর ওপর চাপ দিল। বলা হলো, গোত্রপতি নয় — বরং প্রতিটি এলাকায় সেখান থেকেই উপযুক্ত একজন আমির এবং পুরো গোত্রীয় অঞ্চল মিলে একজন প্রধান আমির নির্বাচিত করা হবে।

২০০৭-এর শেষদিকে এই ইসলামি শাসন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়। শুরুর দিকে মাত্র কয়েক হাজার যুবক তালেবান আর আল-কায়েদার সাথে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু ২০০৯-১০ সালের দিকে এসেই গোত্রীয় সশস্ত্র যোদ্ধাদের সংখ্যা প্রায় এক লাখের কাছাকাছি চলে যায়। স্থানীয় গোত্রগুলোর জন্য এই নতুন শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ছিল ঔপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যের সমাপ্তি এবং স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। আর এজন্য তারা আল-কায়েদার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ে বিপ্লব

২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত গোত্রীয় এলাকাগুলোর ভিতরের দুনিয়া আগাগোড়াই বদলে গিয়েছিল। উত্তর ওয়াজিরিস্তান, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এবং বাজাউরের শত শত গোত্রের সর্দার এবং গ্রাম্য মৌলভীদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা আমেরিকার গোয়েন্দা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এসব গোত্রের সর্দার বা মৌলভীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনের গোত্রীয় রীতিনীতির ব্যাপারে একেবারে অন্ধভক্ত ছিল। সর্দারদের পতনের সাথে সাথে গোত্রীয় ব্যবস্থাপনা 'জিরগা'-এরও পতন ঘটলো। আল-কায়েদা এই শূন্যস্থান পূরণ করলো। প্রত্যেক গোত্র থেকে ইসলামি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ইয়পযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব হলো, যারা আবার সরাসরি আল-কায়েদার সাথে সংযুক্ত ছিল না।

কোথাও কোথাও পুরো এলাকা সরাসরি আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণে চলে এল। এমন ঘটনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২০০৫-এর ডিসেম্বরের একটি ঘটনা। তালেবান যোদ্ধাদের একটি দল অপারেশন পরিচালনা করতে আফগানিস্তানের খোস্ত অভিমুখে যাচ্ছিল। পথে এক স্থানীয় ডাকাত দল তাদেরকে থামিয়ে নিরাপদে যাওয়ার বিনিময়ে টাকা দাবি করলো। তালেবান অস্বীকার করলে তারা কিছু না বলে যেতে দিল। কিন্তু কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে যাওয়ার পর তারা এই তালেবান যোদ্ধাদের ওপর রকেট হামলা করে গাড়ী ধ্বংস করে দিল। ওয়াজির গোত্রের চারজন তালেবান শহীদ হলেন।

এই ঘটনায় তালেবান সমর্থকরা রাগান্বিত হয়ে মিরানশাহ নামক স্থানে একত্রিত হলেন এবং ঘোষণা করলেন, এই ডাকাতদের আস্তানার আশেপাশে কেউ বসবাস করে থাকলে সে যেন নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। এরপর ডাকাতদের আস্তানায় হামলা পরিচালনা করা হলো। পনের মিনিটের ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে অনেক ডাকাত মারা গেল, কিছু গ্রেপ্তার হলো আর বাকিরা পালিয়ে গেল।

এশিয়া টাইমসের একটি ভিডিওচিত্র অনুসারে, এই ঘটনার পরবর্তী তিন দিন পুরো উত্তর ওয়াজিরিস্তান জুড়ে এমন ডাকাতদের বেশ কয়েকটি আস্তানা ধ্বংস করা হয়েছিল। অনেক অপরাধীকে মিরানশাহ বাজারে জনসম্মুখে হত্যা করা হয়েছিল। [87]

---

87. The Taliban's bloody foothold in Pakistan', Asia Times Online. February 8, 2006.

তালেবানের এই শক্তি প্রদর্শনের পর আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ তালেবানকে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহিআনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা)-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরামর্শ দিল। এরপর স্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী নিজস্ব চেকপোস্ট বসানো শুরু করলো। আর ২০০৬-এর জানুয়ারি থেকে পাকিস্তান সিকিউরিটি ফোর্সের চৌকিও উচ্ছেদ করতে শুরু করলো। স্থানীয় জিরগার বিচারালয়ের স্থানে ইসলামি আদালত প্রতিষ্ঠা করলো। ২০০৬ সালের মধ্যেই উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পূর্ণভাবে ইসলামি শাসনকার্য শুরু হয়ে গেল। সাথে সাথে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানেও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলো। আর ২০০৭ সালের শেষ দিকে এসে বাজাউর, মোহমান্দ, ওরাকযাই এজেন্সিতেও এই শাসন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। আল-কায়েদা এই পুরো আন্দোলন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের অধীনে একত্রিত করে দেয়। প্রত্যেক গোত্রের একজন কমান্ডার ছিল আর সমস্ত কমান্ডার একজন আমিরের অধীনে ছিল। এই রাজনৈতিক বিপ্লব পাকিস্তানের পুরোনো গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে দেয়।

গোত্রীয় অঞ্চল আগের থেকেই আল-কায়েদার বৈশ্বিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। আর এই নতুন ব্যবস্থাপনার ফলে আল-কায়েদা পুরো গোত্রীয় এলাকাতেই শক্ত অবস্থান তৈরি করে ফেলেছিল। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের প্রসিদ্ধ নগরী মীর আলি আল-কায়েদার বিশেষ ঘাঁটি এবং আশেপাশের বিশাল অঞ্চল আল-কায়েদা কলোনী হিসেবে পরিচিত হয়ে গেল। স্থানীয় গোত্রের অধিবাসীরাও নিজেদের গৃহে আল-কায়েদার যোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে লাগলো। ধারাবাহিকভাবে এই শাসন ব্যবস্থা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, খাইবার এজেন্সি, ওরাকযাই এজেন্সি, মোহমান্দ ও বাজাউর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বাজাউর, উত্তর ওয়াজিরিস্তান ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আল-কায়েদার মিডিয়া শাখা 'আস-সাহাব' এবং 'উম্মাত'-এর স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হলো।[৪৪] পরবর্তীতে এই স্টুডিও থেকে জিহাদি ভিডিও তৈরি করে করে পাকিস্তান, ইরাক এবং আফগানিস্তানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

২০০৫ সালের শেষ নাগাদ তালেবান আর আল-কায়েদা, যাদেরকে আফগানিস্তান থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছে ধারণা করা হতো; তারা শুধু সফলভাবে প্রত্যাবর্তনই করেনি। বরং গোত্রীয় এলাকায় শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক

৪৪. 'আস-সাহাব' আল-কায়েদার মূল মিডিয়া শাখা আর 'উম্মাত' হরকতে ইসলামি উজবেকিস্তান এবং তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের যৌথ মিডিয়া শাখা।

দুর্গও বানিয়ে নিয়েছিল। পৃথিবীর কোনো ক্ষমতাই তাদের রসদ সরবরাহে বাধা প্রদান করতে সক্ষম ছিলনা। তারা তাদের শত্রু পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও ন্যাটোর ওপর একের পর এক আক্রমণ চালাতে লাগলো। তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের গোত্রীয় বিপ্লবের আগেই ২০০৬ সালে তালেবানের সাহসী উত্থান পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমাদের মতে, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে কেবল ২৫০০ তালেবান সদস্য ছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকা থেকে তালেবানের যেন এক শেষ না হওয়া দল বের হলো এবং ন্যাটোর ওপর প্রলয়ঙ্কারী আক্রমণ শুরু করলো। যদিও তালেবানেরও অনেক ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু তারা সফলতার সাথে আফগানিস্তানে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিল।

সেসময় ভীত আমেরিকা পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকার নিকটবর্তী আফগান সীমান্তে সেনাবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন শুরু করলো। কিন্তু সেই ঘাঁটিগুলো তালেবানের সামনে নস্যি ছিল। তালেবান যোদ্ধারা সেই ঘাঁটিগুলোতে এত বেশি পরিমাণে আক্রমণ করলো যে, ২০০৯-এর মধ্যেই ন্যাটো পাক-আফগান সীমান্তের ঘাঁটি প্রত্যাহারের ঘোষণা করে দিল। নতুন পরিস্থিতি অতীতের সকল কৌশল এবং শক্তি প্রয়োগ ব্যর্থ প্রমাণিত করলো। ওয়াশিংটন এই সিদ্ধান্তে আসলো যে, পুরো এলাকাকে একই রণক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা ছাড়া আফগানিস্তানে যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। এভাবে আফ-পাক স্ট্র্যাটেজির উদ্ভাবন হয়। এরপর আমেরিকা ১৮ মাসে পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে ৮৬টি ড্রোন হামলা করে, কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে।

কিন্তু ভৌগলিক অবস্থান ও গোত্রীয় পরিস্থিতিসহ সবকিছুই আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধাদের জন্য পথ সহজ করে দিতে থাকে। এমনকি যখন পাকিস্তানের দিক থেকে পাক সেনাবাহিনী বিমান দিয়ে বোমা হামলা করছিল আর আফগানিস্তানের দিক থেকে ন্যাটো ড্রোন ও মিসাইল হামলা করছিল, তখনও হিন্দুকুশ ও তার আশেপাশের পর্বতশ্রেণি যোদ্ধাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিল।

এই হামলায় যোদ্ধারাও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খালিদ হাবিব, বাইতুল্লাহ মেহসুদ, তাহের ইয়ালদোভিচ সহ ১৮ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ড্রোন হামলায় শহীদ হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোত্রীয় এলাকাকে প্রাকৃতিক দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করতে আল-কায়েদার দীর্ঘ পাঁচ বছরের পরিকল্পনা এতটা সফল হয় যে, ন্যাটো ও পাকিস্তান বাহিনী অসংখ্য সামরিক অভিযান ও ড্রোন হামলার পরও আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন

করার কথা আদৌ ভাবেনি। তখন গোত্রীয় এলাকায় ড্রোন হামলার সাথে পশ্চিমা জোট এবং পাকিস্তান সরকার যোদ্ধাদেরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে যৌথভাবে কাজ করতে শুরু করলো।

অপরদিকে আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি তথা ANP তখন সেক্যুলার দলের সাহায্যে গোত্রীয় অঞ্চলে অবস্থান সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল এবং কিছু বিশেষ গোত্রকে তালেবান ও আল-কায়েদার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতেও সমর্থ হলো। কিন্তু আল-কায়েদা পরবর্তী কয়েক বছর এই গোত্রীয় এলাকায় টিকে থাকার যাবতীয় রসদের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল।

একই সাথে আল-কায়েদা আরেকটি বিষয়ে কাজ করছিল। আর তা হলো - আরব বিশ্ব, তুরকিস্তান এবং মধ্যএশিয়ায় ভৌগলিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টা, যাতে নতুন রণক্ষেত্রের জন্য নতুন দুর্গ স্থাপন করা সম্ভব হয়। আর এই সকল দেশে স্থলপথে পৌঁছানোর প্রথম দেশ হলো ইরান।

ইরানের সাথে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক তৈরি

২০০9 সালে আল-কায়েদা আবদুল মালেক রিজির নেতৃত্বে পরিচালিত ইরানের জুনদুল্লাহর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলে। চুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আবদুল মালেক তুর্কিস্তান, মধ্যএশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এবং ইরাক দিয়ে যাওয়া পথে আল-কায়েদার সদয়দের আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাপনাকে নিশ্চিত করবে। বিনিময়ে ইরানে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য আল-কায়েদা আবদুল মালেক রিজিকে অর্থ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। আল-কায়েদা জানতো যে, জুনদুল্লাহর মজুদ স্বল্প হয়ে গেছে। কিন্তু কায়েদার এই বিশ্বাসও ছিল যে, আগামী বছরের মধ্যএশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং তুর্কি ও পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জনবল এবং সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাদের পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘমেয়াদী। কিন্তু একজন দূতের সম্পৃক্ততার কারণে এই প্ল্যান অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

হাকিমুল্লাহ মেহসুদের তেহরিকে তালেবানের হাতে ইরানের রাষ্ট্রদূত অপহরণ: ২০০৮-এর ১৩ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে সাতটায় ইরানের রাষ্ট্রদূত হাশমতুল্লাহ আতরজাদে পেশোয়ারে অবস্থিত ইরানের কন্সুলেটে যাওয়ার হায়াতাবাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে প্রায় তিন বছর যাবত কর্মরত ছিলেন। পেশোয়ার প্রদেশ খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রাশাসনিক কেন্দ্র ছিল, যেখানে পশতুনরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। দুটি গাড়ি আতরজাদের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বন্দুকের মুখে তাকে থামতে বাধ্য করে। দুই অস্ত্রধারী আতরজাদেকে ধরে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের দিকে রওনা হয়ে যায়। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ছিল তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্র। আতরযাদার বডিগার্ড হিসেবে থাকা পাকিস্তানি পুলিশ বন্দুকযুদ্ধে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো কভারেজ করে। আর ইরানের মন্ত্রণালয় সেটাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করে। আতরজাদেকে অপহরণের একদিন আগে পেশোয়ারে ইরানি কন্সুলেটের সামনে আমেরিকান এক সেবাসংস্থার কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সাধরণত এই ধরনের অপহরণের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ মুক্তিপণ দাবি করা হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ছিল একদম নীরব। এরপর ইরান সরকার এবং আল-কায়েদার মাঝে আলোচনা শুরু হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যেই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

ইরান এবং কায়েদার মধ্যকার সম্পর্ক তালেবান সরকারের আমলের এমন দুয়েকটি ঘটনার জের ধরে খারাপ হয়ে যায়। প্রথম ঘটনা ছিল আট ইরানি রাষ্ট্রদূতের হত্যা। কে, কারা, কোথায় এই ঘটনা ঘটিয়েছে এই বিষয়ে তথ্য জানা যায়নি।

যেহেতু আল-কায়েদা আর তালেবান সর্বদাই পরস্পরের মিত্র ছিল, তাই ইরান কিছুটা বিগড়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে আল-কায়েদার জর্ডানি মিত্রসেনা আবু মুসআব আয-যারকাভি ইরাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়েছিলেন। সেই অপারেশনগুলোতে যারকাভি ইরানের কিছু শিয়া মাজার ধ্বংস করেছিলেন। ফলে আল-কায়েদা আর ইরানের মধ্যে ফাটল ও দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে আল-কায়েদা এবং ইরান পুনরায় পরস্পর সম্পর্কে আসা আবশ্যক ছিল। আর ইরানি রাষ্ট্রদূতের মুক্তির ব্যাপারে সংলাপের মাধ্যমেই আল-কায়েদা এবং ইরানের মাঝে বোঝাপড়া আবার পোক্ত হয়।

এই বোঝাপড়ার ফলে ইরান তখন উসামা বিন লাদেনের কন্যা আইমান বিন লাদেন এবং আল-কায়েদার আরও কিছু সদস্যকে মুক্তি দিয়ে দেয়, যারা ৯/১১-এর পর ইরান হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করার সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল। বিনিময়ে ২০০৮ সালে আল-কায়েদা ইরানি রাষ্ট্রদূতকে মুক্তি দেয়।

যদিও ইরান এবং আল-কায়েদার মাঝে সৃষ্ট সম্পর্ক কায়েদার কার্যক্রমের জন্য অনেকটা সহায়ক হতে পারতো, কিন্তু ইরানি জুনদুল্লাহর সাথেও কায়েদার গভীর সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ যদি ইরানের সাথে পুনরায় সম্পর্ক নষ্টও হয়ে যেত, তাহলেও জুনদুল্লাহর সাথে থাকা সম্পর্ক আল-কায়েদার হাতে রাখা ছিল।

২০১০ সালের মধ্যেই মধ্যএশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে জিহাদের নতুন ময়দান তৈরির জন্য আল-কায়েদার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রকৃত ময়দান দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলই ছিল। এখানে পশ্চিমা জোট আর পাকিস্তানের সম্মিলিত শক্তির অসংখ্য ড্রোন হামলা আর মিসাইল বর্ষণ, অসংখ্য সেনা অপারেশন এবং আরও অনেক কিছুই হয়েছিল। কিন্তু গোত্রীয় অঞ্চলের ঘাঁটিতে সেইসব তুমুল বর্ষণের সময়ও আল-কায়েদা ছিল অবিচল। এটা তো এমনই এক ফাঁদ ছিল, যা দুনিয়ার দক্ষ সেনাদের ফাঁসানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

বিস্ময়কর গোলকধাঁধা

হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং ডুরান্ড লাইন ধরে অন্যান্য পর্বতমালা ছিল আল-কায়েদার প্রাকৃতিক দুর্গ। একই সাথে তা ছিল এমন একটি কৌশলগত করিডোর, যা তাদের যুদ্ধকে পূর্ব আফগানিস্তান থেকে পশ্চিম আফগানিস্তানে এবং দক্ষিণ আফগানিস্তান থেকে উত্তর আফগানিস্তানে নিয়ে যায়। এটিই সেই যাদুময় ভূমি, যা দক্ষিণ আফগানিস্তানের এবড়ো-থেবড়ো অমসৃণ প্রস্তরময় পাহাড় পেরিয়ে ইরান এবং সেখান থেকে ভারত মহাসাগরে, চীন ও মধ্যএশিয়া পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। এই জটিল ও গোলক ভূমিটি পামির পর্বতমালার সাথে সংযুক্ত, সাধারণভাবে যাকে 'বাম-এ-দুনিয়া তথা 'বিশ্বের ছাদ' নামে অভিহিত করা হয়।

এটিই সেই অঞ্চল যেখানকার পুরো রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন-পরিবর্ধন আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর তালেবানও এখান থেকেই যুদ্ধকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় পশতুন এলাকা থেকে উত্তর আফগানিস্তানের দারিভাষী তালেবান বিরোধী অঞ্চল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। এটি আল-কায়েদার সীসাঢালা প্রাচীর, যা ন্যাটো এবং পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করে এবং তালেবান ও আল-কায়েদাকে কাবুলের দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে।

হিন্দুকুশ পর্বতমালায় পাকিস্তানি মোহমান্দ, বাজাউর এবং চিত্রাল ছাড়াও কমপক্ষে তিনটি এমন নিরাপদ যাতায়াত পয়েন্ট রয়েছে, যেখান থেকে আল-কায়েদা ও তালেবান যোদ্ধারা আফগানিস্তানের কুনার ও নুরিস্তান প্রদেশের মধ্য দিয়ে কাপিসা প্রদেশের উত্তর-পূর্ব তাগাব উপত্যকায় পৌঁছার সহজ প্রবেশপথ পেয়ে যায়। আর সেগুলো তাদেরকে কাবুল উপকণ্ঠে আক্রমণ পরিচালনার পথও সহজ করে তোলে। কাপিসা মূলত তাজিক প্রদেশ, তবে তাগাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো পশতুনরা।

এই নিরাপদ করিডোরের মাধ্যমে প্রতিবছর কমপক্ষে দুই থেকে পাঁচ হাজার যোদ্ধা আফগানিস্তানে প্রবেশ শুরু করে। এই যোদ্ধারা হিন্দুকুশে অবস্থান করে সংগঠিত হয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। এই জঙ্গিরা নুরিস্তান এবং কুনার প্রদেশ থেকে বিরত থেকে এই করিডোরের মাধ্যমেই তাগাব উপত্যকার ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এবং সেখান থেকে তারা কাবুলকে বারবার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায়।

ন্যাটো বাহিনীও বড়সড় বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, যার মধ্যে কুনার ও নুরিস্তান প্রদেশে পরিচালিত 'অপারেশন লায়ন হার্ট' অন্যতম। এছাড়া পাকিস্তানি মিলিটারি পাকিস্তানের মোহমান্দ ও বাজাউরে একই অপারেশনেরই বোন 'অপারেশন শেরদিল' পরিচালনা করে। সেই অপারেশনগুলো ২০০৮-এর শেষদিকে শুরু হয়ে ২০০৯-এর জানুয়ারির শুরুতে গিয়ে শেষ হয়েছিল, তবে রন্ধ্রবহুল সীমান্ত যোদ্ধাদের নির্মূল করতে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুনরায় দলবদ্ধ হয়ে যেত। ২০০৯ ও ২০১০ সালের পরেও ন্যাটো আর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল, তবে যোদ্ধারা এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতেই থাকে। এই একই অভয়ারণ্য থেকে আল-কায়েদার যোদ্ধারা উঠে এসে ইসলামাবাদ ও পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে হামলা চালিয়েছিল।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে অনুপ্রবেশের পয়েন্টগুলো ঘন ঘন পরীক্ষা করলে জিহাদি নেটওয়ার্কের সাফল্যের এই গল্প আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রুট পাসগুলোর নাম তো রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে এগুলো আদতে কোনো একটি নির্দিষ্ট রুটের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা কেবল এটা বোঝায় যে, যেকোনো অঞ্চলেই এমন দশ-বিশটি পাস হতে পারে, যার মধ্য দিয়ে উভয় দেশের লোকেরা আনাগোনা করতে পারবে। চাই সে ব্যবসায়ী, পাচারকারী বা যোদ্ধা হোক। এই অঞ্চলটি ঘুরে দেখার জন্য যদি কাউকে একটি ভাল মানচিত্র এবং একটি শক্তিশালী ফোর হুইল ড্রাইভের বাহন দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই তাকে আল-কায়েদার এই বিশেষ দক্ষতা অবাক করে দিবে। আরও অবাক করে দেয় যে, আল-কায়েদা তার যুদ্ধ শুরু করার আগে যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করতে কতটা বুদ্ধিমত্তার সাথে সময় ব্যয় করেছিল। একইসাথে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর শিশুসুলভ আচরণ ও নির্বুদ্ধিতা দেখে আশ্চর্য ও হতবাক হতে হয় যে, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও সম্পদশালী এবং কূটনৈতিক দক্ষতা সম্পন্ন রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তারা আল-কায়েদার আফগান জালে জড়িয়ে পড়ে এবং বাস্তব যুদ্ধের কৌশল বুঝতে না পেরে পামির অঞ্চলের মানচিত্রে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ন্যাটো জোট নুরিস্তান ও কুনারে তার সংস্থান জোগাড় করে এবং বাজাউর ও মোহমান্দে যোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে পাকিস্তান সরকারকে সেনা পাঠানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে। তাদের সম্মিলিত বিমানবাহিনী যোদ্ধাদের ওপর মারাত্মকভাবে বোমা বর্ষণ করতে থাকে এবং পদাতিক বাহিনী এত পরিমাণ গুলি চালায়, যেন আক্রমণ করার জন্য তারা পাহাড় থেকে নেমে আসছে।

ন্যাটো আর পাকি - উভয় বাহিনী স্পষ্টতই ভুলে বসেছিল যে, সংঘর্ষের সূত্রপাতের পরে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে যোদ্ধারা অত্যান্ত কৌশলী এক রুটিন গ্রহণ করেছে। আর তা হলো - ন্যাটো কতৃক গ্রেপ্তার ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তারা কুনার কিংবা নুরিস্তানে না যায় না; আর পাকিস্তান কর্তৃক নিহত বা গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তারা মোহমান্দ কিংবা বাজাউরেও কোনো ধরনের অভিযান চালাচ্ছে না। এর পরিবর্তে তারা গেরিলা হামলা করে বিভিন্ন বন-জঙ্গলের দিকে ছুটে যায় এবং পর্বত পেরিয়ে পাকিস্তানি অঞ্চল চিত্রাল ও দীরে গিয়ে পৌঁছায়। আর সেনাবাহিনী হাঁসফাঁস হওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে তাদের তাড়া করে না।

যোদ্ধাদের সেই যাতায়াত পথগুলোকে অবরুদ্ধ করার জন্য ওয়াশিংটনের জোর চাপাচাপির ফলস্বরূপ ২০১০-১১ দুই বছরে পাকিস্তান তার সেনাবাহিনীর এক উল্লেখযোগ্য অংশকে পশ্চিম সীমান্তে স্থানান্তরিত করেছে এবং গোত্রীয় অঞ্চলে কয়েকটি মোর্চাও খুলেছিল। আর যদিও এগুলো যোদ্ধাদের আন্দোলনের গতিকে কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেসব তাদেরকে নির্মূল বা গ্রেপ্তারের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

অঞ্চলটিতে ভ্রমণের জন্য অধিক ব্যবহৃত রুট সমূহের বিবরণ -

- আরান্দু চিত্রাল (পাকিস্তান) থেকে নুরিস্তান (আফগানিস্তান)
- দীর (পাকিস্তান) থেকে কুনার (আফগানিস্তান)
- বাজাউর (পাকিস্তান) থেকে কুনার (আফগানিস্তান) (দুটি রুট)
- মোহমান্দ (পাকিস্তান) থেকে কুনার (আফগানিস্তান)।
- খাইবার (পাকিস্তান) থেকে নাঙ্গারহার (আফগানিস্তান)। দুটি রুট : একটি তোড়খাম সীমান্ত পারাপারের মাধ্যমে আইনি পথ এবং অন্যটি তেরাহ উপত্যকা (পাকিস্তান) হয়ে তোরা-বোরা পর্বত (আফগানিস্তান) এবং কুররাম (পাকিস্তান) হয়ে অবৈধ পথ।
- তেরী মেনগাল (পাকিস্তান) থেকে নাঙ্গারহার (আফগানিস্তান), চারটি রুট।
- কুররাম এজেন্সি (পাকিস্তান) থেকে পাকতিয়া (আফগানিস্তান), দুটি রুট।
- কুররাম (পাকিস্তান) থেকে খোস্ত (আফগানিস্তান)।

- উত্তর ওয়াজিরিস্তান (পাকিস্তান) থেকে ঘন ঘন ব্যবহৃত চারটি রুট রয়েছে, যেগুলো লোয়ারা মান্ডি (পাকিস্তান) থেকে খোস্ত এবং পাকতিকা (আফগানিস্তান) পর্যন্ত। উত্তর ওয়াজিরিস্তান (পাকিস্তান) থেকে পাকতিকা (আফগানিস্তান) পর্যন্ত তিনটি রুট এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান (পাকিস্তান) থেকে আঙ্গোরাড্ডা (পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্মিলিত) পর্যন্ত দুটি রুটই সর্বাধিক ব্যবহৃত।

- খাইবার পাখতুনখোয়া এবং ফাটায় মোট ১৬ টি নিয়মিত রুট রয়েছে।

- বেলুচিস্তান হয়ে একটি আইনি পথ রয়েছে, যা চমন হয়ে কান্দাহার পর্যন্ত। এছাড়া ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য রুটগুলো অবৈধ। চাগি (পাকিস্তান) এর নৌশকি থেকে কান্দাহার (আফগানিস্তান) এর গজনালি এবং দালবাদিন (পাকিস্তান) থেকে বরাহবেচা (আফগানিস্তান) এর সকল পথ অবৈধ।

মুজাহিদরা এই বর্ডার পাসগুলোকে অতিক্রম করে কখনো আফগানিস্তানে আবার কখনো পাকিস্তানে প্রবেশ করতো। উদাহরণস্বরূপ, ন্যাটো যখন কোনো অপারেশন পরিচালনা করে তখন যোদ্ধারা নুরিস্তান (আফগানিস্তান) থেকে আরান্দু, চিত্রাল হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। চিত্রাল পাকিস্তান সীমান্তের একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পাহাড়ি এলাকা, যেখানে যোদ্ধারা বিশ্রাম নিতো এবং এরপর পাকিস্তানের দীর এলাকায় চলে যেত। সেখান থেকে তারা পুনরায় কুনার অঞ্চলে প্রবেশ করতো। এই ঘূর্ণায়মান যাতায়াত তাদের মাঝে চলতেই থাকে। আর দুই দেশের মধ্যকার এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সীমান্তের বিশাল প্রান্তটিকে রক্ষা করাও ছিল অসম্ভব।

পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চল থেকে স্বশস্ত্র যোদ্ধাদের খতম করার পরিকল্পনা মোতাবেক স্থানীয় জনগণকে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বলা হলো। জাতিসংঘের মানবিক বিষয় সম্পর্কিত সমন্বয়ের অফিসের তথ্যানুযায়ী, প্রায় ৪,৫০,০০০ (সাড়ে চার লাখ) মানুষ দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ১,০০,০০০ (এক লাখ) মানুষ গোত্রীয় অঞ্চল মোহমান্দ ও বাজাউর থেকে উদ্বাস্তু হয়েছিল। এছাড়াও কয়েক হাজার মানুষ খাইবার ও ওরাকযাই এজেন্সি থেকে ঘরছাড়া হয়েছিল।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং আমেরিকান সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্যমত্য ছিল যে, একবার বেসামরিক লোকেরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলে জঙ্গিদের অভয়ারণ্যগুলোতে

সহজেই বোমা ফেলা যাবে। আর জঙ্গিরা যদি আফগানিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে ওপাশ থেকে আমেরিকান সেনারা তাদের টার্গেট করে নির্মূল করে দিবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন গোত্রীয় নেতাদের পুরানো গোত্রীয় ব্যবস্থার অধীনে আনার চেষ্টা করবে, এবং আমেরিকান অর্থায়নে পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলগুলোকে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হবে। তখন পাকিস্তানের পুলিশ প্রশাসন এবং আদালত ব্যবস্থা এখানকার সকল মামলা-মোকাদ্দামার পূর্ণ তদারকি করবে।

কিন্তু তাদের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এক দুঃস্বপ্নই রয়ে গেছে। আল-কায়েদার যোদ্ধারা হিন্দুকুশের বেশ কিছু গিরিপথ দিয়ে আন্তর্জাতিক বাহিনী এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে ‘লুকোচুরি’ খেলে গিয়েছে।

আমেরিকান বাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের বাজাউর ও মোহমান্দে এবং আফগানিস্তানের কুনার ও নুরিস্তানে সামরিক অভিযান চলাকালে যোদ্ধারা নিরলস হামলা চালায়। এবিসি নিউজের তথ্যানুসারে, (পাকিস্তানি) তালেবান নুরিস্তানের কামদেইশে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে আট আমেরিকান সেনা ও আফগান সেনাবাহিনীর আট সদস্যকে হত্যা করে। তালেবান দাবি করেছিল যে, আফগান ন্যাশনাল সেনাবাহিনী থেকে ৩০ জন বন্দী নেওয়ার পাশাপাশি ৯ জন আমেরিকান সেনা এবং একশত আফগান ন্যাশনাল সেনাবাহিনীর সেনা নিহত হয়েছে। এটি ছিল তীব্র এক আক্রমণ। এর ফলেই আমেরিকান জেনারেল স্ট্যানলি ম্যাক ক্রিস্টাল আমেরিকান সেনাদের সকল সীমান্ত চৌকি ত্যাগ করতে আদেশ করেছিল। ফলস্বরূপ, আফগানিস্তানের নুরিস্তান প্রদেশের একটি বড় অংশ আল-কায়েদার নেতৃত্বাধীন যোদ্ধাদের হাতে চলে আসে। এর পরেই যোদ্ধারা ২০০৯ সালের নভেম্বরে আমেরিকার পরিত্যক্ত সমস্ত আমেরিকান ঘাঁটিগুলো তাদের দখলে দেখানোর জন্য আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

জোট বাহিনী বিভিন্ন গোত্রীয় অঞ্চলে ২০০২-০৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১০ সাল পর্যন্ত একাধিক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, তবে এসব অভিযান যোদ্ধাদের প্রভাব কমিয়ে আনতে পারেনি। প্রতিটি অপারেশনের পর যোদ্ধারা কেবল তাদের গঠন ও রূপ পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯-১০ সময়কালে যোদ্ধাদের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন সময় হওয়ার কথা ছিল। কারণ পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, ওরাকযাই, খাইবার এজেন্সি, মোহমান্দ এবং বাজাউরে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করেছিল। একই সময়ে CIA প্রতিদিন নিয়মিত ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল।

জবাবে যোদ্ধারা কেবল বিভক্ত হয়ে একটি স্ট্যান্ডার্ড গেরিলা কৌশল নিয়ে আসে। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে তারা উত্তর ওয়াজিরিস্তানের কিছু অংশে চলে যায় এবং সেনাদেরকে এই অঞ্চলটি দখল করার সুযোগ করে দেয়। সেনাবাহিনীর স্থল স্থাপনার কাজ শেষ হওয়ার পরে শাওয়াল মাসে যোদ্ধারা আবারও এবড়োথেবড়ো প্রস্তরময় পর্বতমালা ব্যবহার শুরু করে এবং দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে আক্রমণ করতে ও সামরিক ঘাঁটিগুলো দখল করতে ফিরে আসে।

মোহমান্দ ও বাজাউরেও অভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। যে সামরিক বাহিনীকেই মাটিতে নিযুক্ত করা হতো, আল-কায়েদার যোদ্ধারা নুরিস্তান (আফগানিস্তান) এবং চিত্রাল (পাকিস্তান) পর্বতমালার মধ্য দিয়ে গিয়ে সাথে সাথে তাদের ঘাঁটি আর অবস্থান মাটির সাথে মিশিয়ে দিতো। পরবর্তী মাসগুলোতে এই কৌশলটি এখানে তো পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কিন্তু এই কৌশলটিই দক্ষিণ এশীয় থেকে মধ্যএশীয় অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত খোরাসানের ইসলামি ইমারাহের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। এই যাদুভূমিটি পুনরায় আল-কায়েদার কৌশল নির্ধারণ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

এই অঞ্চলটি ইতোমধ্যে তালেবান-নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহকে দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তান থেকে উত্তর আফগানিস্তানের বাগলান ও কুন্দুজ এলাকাতে এবং পরে মধ্যএশিয়ায় নিয়ে গিয়েছে, যেখানে তা উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজস্তান, চেচনিয়া এবং চীনের উইঘুর প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। আর পামির পর্বতমালার মাধ্যমে ইসলামি ইমারাহ খোরাসানকে উত্থিত ও পুনরুদ্ধার করার জন্য ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এই বিদ্রোহ তাজিকিস্তানের গর্নো-বাদাখশান প্রদেশ থেকে আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আর দুনো বাদাখশান উত্তরে কিরগিজস্তানের আলাই উপত্যকার পাশে তিয়ান শান পর্বতের সাথে সংযুক্ত। দক্ষিণে তা আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের ওয়াখন করিডোর বরাবর হিন্দুকুশ পর্বতমালার সাথে মিলিত। আর পূর্ব দিকে এই অঞ্চলটি চীনা সীমান্তে শেষ হয় বা কুনলুন পর্বতমালার কংগুর তাগ অন্তর্ভুক্ত সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

এগুলো ছিল এমন কিছু প্রাকৃতিক রাস্তা, যা আল-কায়েদার আরব্য রজনীর দক্ষিণ এশীয় থিয়েটারকে (রণাঙ্গনকে) এর মধ্যএশিয়ার ভবিষ্যত যুদ্ধের থিয়েটারের সাথে অবিশ্বাস্যভাবে সংযুক্ত করে দিয়েছিল।

হিন্দুকুশ ও পামির অঞ্চলের এই পর্বতমালা হাজার বছরের পুরোনো। তবে এখানে আল-কায়েদার আরব্য রজনীর কাহিনী শুরু হয়েছিল ৯/১১ থেকে। আল-কায়েদা এই অঞ্চলের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে রক্তে রঞ্জিত কয়েক বছরের দুর্দান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। শিলাময় পর্বতগুলো অতীতে গোত্রীয় বিদ্রোহীদের জন্য কিছুটা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, তবে আল-কায়েদার অনুপ্রেরণার বিপ্লবটি প্রতিটি শিলা ও পাথরকেই যেন এক অদৃশ্য দুর্গে পরিণত করেছিল।

অষ্টম অধ্যায়

যুদ্ধের ময়দান

উলামায়ে কেরামের মতানুসারে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষার বিষয়টি ইসলামি আকিদাহে প্রথম পর্যায়ের ফারজিয়্যাত হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু এই ব্যাপারটি ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর যেভাবে জিহাদের জন্য মুসলিমদেরকে সত্যিকার অর্থে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা বিগত কমপক্ষে ৫০০ বছরেও দেখা যায়নি। সেসময় বিশ্বজুড়ে মুসলিম উলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও ফারজিয়্যাতকে সাব্যস্ত করেছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদকে প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব ও অর্পিত দায়িত্ব ঘোষণা করেন। [৪৭]

এর ফলস্বরূপ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তরুণ যুবক তাদের আফগান ভাইদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল। আফগানিস্তানের জিহাদে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের মতো আগে থেকে চলে আসা আন্দোলনগুলোর চেয়েও যেন বেশি ছিল; যদিও আফগানিস্তান মুসলিমদের জন্য পবিত্র স্থানও না, ইসলামের কেন্দ্রভূমিও না এবং কোনোভাবেই সমৃদ্ধ দেশও ছিল না। আসলে আফগানিস্তান হলো বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র মুসলিম দেশ। আন্তর্জাতিক বা মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে-অর্থনীতিতে এই দেশটির উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকাও নেই।

২০০১ সালে আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা চালানোর ঘোষণা দেয়, তখন মুসলিম যুবকদের মধ্যে এই মুসলিম ভূখণ্ডের দখল প্রতিরোধ করার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে। প্রতিটি ঘর থেকেই তখন জিহাদের আওয়াজ বুলন্দ হতে থাকে। যে মুসলিম যুবকরা সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, তাদের আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আলাদা কোনো ফাতওয়া কিংবা আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন হয়নি। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ইরাকের মরুভূমি কিংবা শহরগুলো নয়, ইয়েমেনের পর্বতমালা কিংবা বিশৃঙ্খল সোমালিয়া নয়, বরং আফগানিস্তানই ভবিষ্যতের ইসলামি এবং জিহাদি কার্যক্রমের মারকায (সহজ বাংলায় কর্মস্থল) হবে।

---

৪৭. সেসময় ইসলামের পূর্ববর্তী ইমামগণের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে এই মাজলুম ফারজিয়্যাতকে প্রাণবন্ত করেছিলেন ড. আবদুল্লাহ আযযাম। তিনি একাই আরবসহ পুরো বিশ্বের উলামা এবং যুবকদের দৃষ্টি আফগানের জিহাদের দিকে মনোযোগী করার জন্য যা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল।

১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানদের প্রতিরোধের পক্ষে আমেরিকার সমর্থন ভিয়েতনামে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধস্বরূপ ছিল। কিন্তু এজন্য আন্তর্জাতিক ইসলামি আন্দোলনসহ সম্ভাব্য সকল সোভিয়েত শত্রুদেরকে আফগান জিহাদকে সমর্থন করানোর প্রয়োজন ছিল। আমেরিকার ভাবনায় ছিল, তারা যদি শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পদ নষ্ট করতে জিহাদি সদর দফতরের ভিত্তি স্থাপন করতে সফল হয়, তাহলে তা মধ্যএশীয় অঞ্চলে প্রবেশ করানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। তখন তারা এই অঞ্চলটিকে ফ্ল্যাশপয়েন্টে পরিণত করতে পারবে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ব্লক এবং এর আদর্শকে বার্লিন প্রাচীর পর্যন্ত পুরোপুরি বিভক্ত করতে পারবে। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমেরিকা আফগানিস্তানে জিহাদি কার্যক্রমের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিল, যা সোভিয়েতদের রক্ত শুকানোর অবস্থা সৃষ্টি করে এবং অন্তত এই অঞ্চল থেকে তাদের পশ্চাদপসরণকে বাধ্য করে। তবে এই কৌশলটি সম্পন্ন করার জন্য আমেরিকার যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য ছিল না।

মূলত যে বিষয়টি বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মুসলিমকে স্বশস্ত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হলো আখিরাতের প্রতিশ্রুত প্রতিদানসমূহ। এই আকাঙ্ক্ষাই তাদেরকে সক্ষম করেছিল সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

এছাড়াও তাদেরকে উদ্দীপ্ত করেছে চৌদ্দশত বছর পূর্বে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর করা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে তাদের প্রত্যাশা, যা আজোবধি সংরক্ষিত রয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যেক জ্ঞানী মুসলিমের নিকটই প্রসিদ্ধ,

إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاَءً وَتَشْرِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلاَ يُعْطَوْنَهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلاَ يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلَؤُوهَا جَوْرًا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ

আমরা (আহলে বাইত) এমন একটি পরিবারের সদস্য যা আল্লাহ পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের জীবনের জন্য বেছে নিয়েছেন; এবং আমার পরিবারের সদস্যরা (আহলুল বাইত) একটি বিরাট সমস্যায় পড়বে এবং আমার মৃত্যুর পরে তাদের জোর করে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হবে। (এই অবস্থা থাকবে) যতক্ষণ না পূর্বদিক থেকে

একদল লোকেরা কালো পতাকা [90] *নিয়ে আসবে। তারা কিছু একটা দাবি করবে। কিন্তু তাদেরকে তা দেওয়া হবে না। ফলস্বরূপ তারা যুদ্ধ করে বিজয়ী হবে এবং তারা প্রথমে যা দাবি করেছিল, এবার তা দেওয়া হবে।*

কিন্তু এবার তারা তা নিতে অস্বীকার করবে, যতক্ষণ না আমার পরিবার (আহলে বাইত) থেকে এমন একজন বের হবেন, যিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করে দিবেন, যেমনিভাবে তা ইতোপূর্বে দুর্নীতির দ্বারা তা ভরে গিয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে-ই সে সময় পেয়ে যাও, সে যেন তাদের পক্ষে চলে যায়, এমনকি এজন্য তাকে বরফের উপরে হামাগুড়ি দিতে হলেও।" [91]

অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

"অতএব যদি তাদেরকে পেয়ে যাও, তাহলে বাইয়াত দিবে, যদিও তাদের কাছে বরফের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও পৌঁছাতে হয়। কেননা সেখানেই থাকবেন আল্লাহর মনোনিত মাহদি।" [92]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিসগুলো প্রাচীন খোরাসান অঞ্চল থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী আসার ইঙ্গিত দেয়, মধ্যপ্রাচ্যে যে অঞ্চলকে 'মাশরিক' তথা 'পূর্বদিক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর আধুনিক আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান এবং মধ্যএশিয়ার কিছু অংশ প্রাচীন খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত।

---

90. কালো পতাকা সাধারণত মুসলিম সেনাবাহিনীর পতাকা, আর সাদা পতাকা ইসলামি ইমারাহ বা রাষ্ট্রের পতাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কালো পতাকা যুদ্ধের আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হয়। হাদিসে এসেছে,

أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাইয়াহ (বড় পতাকা) ছিল কালো এবং লিওয়া (ছোট পতাকা) ছিল সাদা। [জামি আত-তিরমিযি, ১৬৮১ (হাদিসটি হাসান); অনুরূপ হাদিস - সুনান ইবনু মাজাহ ২৮১৮]

91. সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৪০৮২ এবং হাদিস নং ৪০৮৪ (হাদিসটি যয়িফ);
ইবনু হাজার রচিত তারিখে তাবারি আস-সাওয়াইকিল মুহাররিকাহ, খন্ড ১, পরিচ্ছেদ ১১

92. সুনানে ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ৪০৮৪ (হাদিসটি যয়িফ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিসকে যদি নিম্নোক্ত হাদিসটির সাথে মিলিয়ে পড়া হয়, তবে শেষ জামানার যুদ্ধভূমির প্রকৃত সীমা স্পষ্ট হয়।

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, *"তোমাদের একদল হিন্দ জয় করবে, আল্লাহ তাদের জন্য হিন্দের দরজাকে উন্মুক্ত করে দিবেন, যতক্ষণ না তারা এখানকার রাজাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়ে আসে। আল্লাহ তাঁদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (হিন্দ থেকে) ফিরে তারা শামে (সিরিয়া ও এর আশপাশের অঞ্চল) এসে ইবনু মারিয়াম (ঈসা عليه السلام)-কে পাবে।"* [93]

দখলকৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিগুলোর প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন সময়ে বহুবার ফাতওয়া জারি করেছেন। সেইসব ফাতওয়ার মধ্যে রয়েছে ভারত দখলকৃত কাশ্মীর, মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশ, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডের মুসলিম অঞ্চল এবং সমগ্র ফিলিস্তিন - যা মুসলিমদের জন্য তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। কিন্তু সেই ফাতওয়া যখন আফগানিস্তানকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিল, তখন বিশাল সংখ্যক মুসলিম যুবকদের মাঝে যেন এক ঝলকানি সৃষ্টি হলো এবং তারা সকলেই আফগান অভিমুখী হতে লাগলো। পাকিস্তান তখন হাজার হাজার যুবকের জন্য ট্রানজিট পয়েন্টে পরিণত হয়েছিল। সেই নওজোয়ানদের অনেকে পাকিস্তানি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আট মাস পড়াশোনায় ব্যয় করতো, আর বাকি চার মাস আফগানিস্তানে গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো।

কাশ্মীর ও ফিলিস্তিনের ন্যায় সারা বিশ্বের সকল মুসলিম মুক্তি আন্দোলনসমূহ, ইতোপূর্বে যাদের কাছে আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো, আফগান জিহাদ তাদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করলো। এসব আন্দোলনের সদস্য এবং সমর্থকরা তাদের আঞ্চলিক অবস্থান ছেড়ে আফগানিস্তানকে নিজেদের লক্ষ্যের মারকায করে তুললো। আফগানিস্তানে তারা বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ শিবিরগুলোতে প্রশিক্ষণে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। এরপর তারা যখন নিজেদের এলাকাতে ফিরে যায়, তখন তারা নতুন উৎসাহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শিক স্পিন (কৌশলগত পদক্ষেপ) দিয়ে পুনরায় আন্দোলনে শুরু করলো। এর সেরা দুটি উদাহরণ হলো যথাক্রমে আশির দশকের মাঝামাঝিতে ফিলিস্তিনি হামাস এবং একই দশকের শেষে কাশ্মীরি হিজবুল মুজাহিদিন।

93. নুআইম ইবনু হাম্মাদ রচিত 'আল-ফিতান'

আফগানিস্তানের দিকে এই আন্দোলন ও হিজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণীকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল, যেখানে শেষ জামানার যুদ্ধের মূল থিয়েটার (রণাঙ্গন) হিসেবে খোরাসানকে অভিহিত করা হয়েছে। আর সেখান থেকে তা পার্শ্ববর্তী ভারতের অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে। এরপর সেখান থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং 'খিলাফাহ আলা মিনহাজুন-নাবুওয়্যাহ' তথা নবুওয়্যাতের আদলে খিলাফাতকে ফিরিয়ে আনতে চূড়ান্ত লড়াইয়ের লক্ষ্যে সমস্ত মুসলিম বাহিনী বিলাদুশ শাম (সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন) অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করবে।[94]

94. এখানে উল্লেখিত হাদিস এবং তা থেকে লেখকের উল্লেখিত ব্যাপারটি মূলত বৈশ্বিক জিহাদের প্রেক্ষাপটে মুজাহিদদের প্রত্যাশা। আর তা কেবলই কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি; কোনো শারঈ দলিল নয়। তাদের জিহাদের শারঈ দলিল হলো, পুরো বিশ্বের ভূমিগুলোতে মুসলিমদের ওপর চলমান অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাওয়ার দলিলাদি, যা তারা তাদের লিখা-বক্তব্য ইত্যাদিতে অহরহ বলে থাকে।

ভিনদেশি যোদ্ধাদের ইতিবৃত্ত

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে যখন 'আন্তর্জাতিক জিহাদি ব্রিগেড' পুনরায় সংগঠিত হচ্ছিল, তখন পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা ISI-এর কর্মীরা আফগান জিহাদের পক্ষপাতী ছিল। তারা আমেরিকার মতোই আফগান জিহাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক ছিল।

'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি' নামে পরিচিত সশস্ত্র সংগঠনটি পাকিস্তানি সেনাদের সহায়তার ফলেই অস্তিত্ব লাভ করেছিল। হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি প্রথম পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠন এবং এটি ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়েছিল। এটি দেওবন্দি চিন্তাধারা লালন করতো। এই সংগঠনে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য যুবকদের নিয়োগ করা হতো। দেশের প্রধান ইসলামি দল, জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তানি স্বেচ্ছা যোদ্ধা নিয়োগ দান ও জিহাদে প্রেরণে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সোভিয়েত বিরোধী জিহাদে লোকদের জাগিয়ে তোলা আহামরি কোনো বিষয় ছিল না। কারণ ইতোমধ্যেই সেখানে স্থানীয় আফগানদের এমন একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যেখানে কোনো বিদেশি যোদ্ধার সহায়তার প্রয়োজন ছিল না।

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি গঠন করার পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল - যুদ্ধ ময়দানের সীমানাকে আফগানিস্তানের বাইরে মধ্যএশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভারতকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু আফগানিস্তানে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলগত গভীরতার প্যাটার্ন এবং পরবর্তীতে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামির মাধ্যমে ISI যেসমস্ত জিহাদি নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছিল, সেটিকে ৯/১১-এর পরে আল-কায়েদা সুযোগ বুঝে নিজেদের আদর্শে উজ্জীবিত করে নেয় এবং এরপর থেকে আল-কায়েদা সেই যোদ্ধাদেরকে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশলগত দিক অনুযায়ী রণাঙ্গনগুলোর সীমানা নির্ধারণ করতে ব্যবহার শুরু করে।

হরকতুল জিহাদ আল-ইসলামির নেটওয়ার্কের উত্থান ঘটেছিল দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে। এর কমান্ডারগণ বিভিন্ন দেওবন্দি মাদ্রাসা শিক্ষিত ছিলেন, যা তাদের প্রধান (চীফ) নির্বাচনের মৌলিক দিক ছিল। দেওবন্দি চিন্তাধারা বরাবরই দক্ষিণ ও মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। যদিও দারুল উলূম দেওবন্দ ১৮৭৯ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলায় মাওলানা কাসিম নানুতুভি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বস্তুত এটি ছিল আগাগোড়া ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম সংস্কারপন্থী দ্বারা তা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুজাদ্দিদে আলফে সানি (১৫৬৪-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ), শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ), এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহর নাতি শাহ ইসমাইল (১৭৭৯-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ)। শাইখ আহমাদ সেরহিন্দি 'মুজাদ্দিদে আলফে সানি' নামে অধিক পরিচিত, যার অর্থ 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক'। তিনি মোঘল সম্রাট আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামক সেক্যুলার আদেশের বিরুদ্ধে কঠিনভাবে বিশুদ্ধ তাওহিদবাদী ইসলামি মূল্যবোধের সংস্কারপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে মোঘল বংশ ইসলামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ধর্মপ্রাণ মোঘল শাসক আওরঙ্গজেব আলমগীরকে শাইখ সেরহিন্দির শিক্ষার উর্বর ফসল বলা হয়।

একইভাবে, হিন্দু মারাঠাদের উত্থান ও মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিগন্তের সূর্যের ন্যায় হাজির হন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ শাইখ সেরহিন্দের উত্তরাধিকার অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাঁর লিখনীর মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার সেইসব ভুলত্রুটি চিহ্নিত করেছিলেন, যেগুলো হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসনের অধঃপতনের কারণ ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহর প্রভাব মধ্যএশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত পুরো অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তা এই কারণে যে - তিনি আহমাদ শাহ আবদালিকে (কান্দাহারের এক যোদ্ধা) তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনকে বিলিয়ে দিতে এবং মারাঠা রাজবংশের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশসূচক খুব বিস্তারিত একটি চিঠি লিখেছিলেন। এর ফলে আহমাদ শাহ আবদালি ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং মারাঠা রাজবংশকে উৎখাত করেছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর দীক্ষা ও মিশনকে তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজিজ এবং নাতি শাহ ইসমাইল এগিয়ে নিয়েছিলেন। শাহ ইসমাইল উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দক্ষিণ এশিয়ার অগ্রণী জিহাদি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শাহ ওয়াল উল্লাহি পরিবারের এই প্রভাব ও চিন্তাধারাই দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।

দারুল উলূম দেওবন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যের বিশ্বস্ত উত্তরাধিকার ছিল এবং দেওবন্দের কারণেই সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে অসংখ্য মাদ্রাসা জালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কখনও এটি কাদরিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ারদিয়া ও নকশবন্দিয়া সহ বিভিন্ন সূফী আদর্শকেও প্রচার করেছিল। বর্ধিত দক্ষিণ ও মধ্যএশীয় অঞ্চলের সুফি খানকাসমূহের সিংহভাগই দেওবন্দ ঘরানার সাথে সম্পৃক্ত।

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সৈয়দ আহমেদ বেরলভী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন এবং রেশমি রুমাল আন্দোলনের মতো সমস্ত জিহাদি আন্দোলন, এমনকি একবিংশ শতাব্দীর তালেবান আন্দোলনেরও পতাকা বহনকারী ও নেতৃত্বদানকারী ছিল দেওবন্দি চিন্তাধারার মাদ্রাসা।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রথমে প্রশিক্ষিত অনুষদের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেছিল, এবং উত্তর ককেশাস ও মধ্যএশিয়া থেকে বাংলা ও মিয়ানমারে ইসলামি মাদ্রাসার নেটওয়ার্ককে উৎসারিত করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে গোটা অঞ্চলটির রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হওয়ায় ককেশাস এবং মধ্যএশীয় অঞ্চলগুলো পূর্ববর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে ছিল, এবং কিছু অঞ্চল কমিউনিস্ট চীন দখল করেছিল। আর এরা উভয়ই ধর্মীয় শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করেছিল। তবে বাদাখশাহ, বালখ, মাজার শরীফ এবং তখর সহ উত্তর আফগানিস্তানের মধ্যএশীয় মুসলিমরা তাদের পুরানো ধর্মীয় সম্পর্ক ও শিক্ষাকে বজায় রেখেছিল।

দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তা-চেতনাই ছিল প্রধান একাডেমিক প্রভাব, যার অধীনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মধ্যএশিয়ার ধর্মীয় ও সূফীবাদ একত্রিত হয়েছিল। এটি ভারতে মুসলিম শিক্ষাবিদদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং মুসলিম বিদ্বানদেরকে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছিল, যেখানে তারা পুরোনো ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রাজনীতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য অনেকগুলো ছোট-বড় মাদ্রাসা তৈরি করেছিল।

ব্রিটিশ-ভারত বিভাগের পরে দারুল উলূম দেওবন্দের বেশ কয়েকজন উলামার পাকিস্তানে এসে সেখানে ‘জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরি টাউন’, ‘দারুল উলূম করাচি’ এবং ‘জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর’ ইত্যাদির মতো ইসলামি মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামাবাদে ১৯৭০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ও দেওবন্দি বিদ্যালয়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুরো অঞ্চলের শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার কারণে উজবেক, তাজিক ও তুর্কমান বংশোদ্ভূত মুসলিমগণ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পালিয়ে পাকিস্তান চলে এসেছিল। পাশাপাশি চীনা প্রদেশ জিনজিয়াং এবং মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মুসলিমগণও পাকিস্তানি ইসলামি প্রজাতন্ত্রের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এদের মধ্যেই কয়েকজন তাদের বাচ্চাদের দেওবন্দি চিন্তাধারার ইসলামি মাদ্রাসাগুলোতে পাঠিয়েছিলেন যেখানে তাদের খরচাহীন বোর্ডিং এবং থাকার ব্যবস্থা, খাবার, পোশাক ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানের 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একে মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশে পৌঁছানোর জন্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ এই নেটওয়ার্কটিকে সজ্জিত করেছিল। এরপরে তারা এই মাদ্রাসাগুলোকে মধ্যএশীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং ককেশাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রক্সি-যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে মধ্যএশীয়দের নিয়োগের প্রধান মারকায হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি একই সাথে পাকিস্তানি, কাশ্মীরি এবং বাংলাদেশিদের নিয়োগপূর্বক আফগানিস্তানে 'Bleed India' (রক্তাক্ত ভারত) নামক অপারেশনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

কিন্তু শীঘ্রই এই নেটওয়ার্ক এতটাই বিস্তার লাভ করলো যে, তা পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে গেল। এদিকে মধ্যএশিয়া থেকে আসা তালেবুল ইলমদের একটি নেটওয়ার্ক পুরো বিশ্বজুড়ে 'গেরিলা অপারেশন' পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এই শিক্ষার্থীদের যাদের তাজিক ও উজবেক শিকড় ছিল, তাদেরকে প্রথমে সংগঠনগুলোর প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আফগানিস্তানে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বে 'হিযবে ইসলামি' আফগানিস্তানের শিবিরগুলোতে এবং আফগানিস্তানের অধ্যাপক বুরহানউদ্দিন রব্বানি ও আহমাদ শাহ মাসউদের নেতৃত্বে 'জামায়াতে ইসলামি'-এর শিবিরগুলোতে স্থানান্তরিত হতো। এই দুটি প্রধান সংগঠনের নিকট উত্তর আফগানিস্তানে প্রচুর সংখ্যক কমান্ডার ছিল, যাদের নিকট মধ্যএশিয়ায় সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য পাকিস্তানি মাদ্রাসার বেশ কয়েকটি শিক্ষার্থী গ্রুপ হয়েছিল।

হিযব এবং জামায়াত উভয়ই আদর্শিকভাবে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নিকটবর্তী ছিল। তারা কেবল সাইয়্যেদ কুতুব এবং হাসান আল বান্নার বিপ্লবী শিক্ষাই পড়েনি। বরং প্রখর জযবার আরব যোদ্ধাদের প্রভাবেও ছিল, কারণ বেশিরভাগ আরব যোদ্ধারাই আফগানে সোভিয়েত বিরোধী লড়াইয়ে এই দুটি সংস্থার ব্যানারে অংশগ্রহণ করেছিল।

মধ্যএশীয় মুসলিম যোদ্ধারা ইতোপূর্বে দেওবন্দি ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামি এবং হিযবে ইসলামির প্রশিক্ষণ শিবিরে তাদের উপস্থিতি এবং আরব যোদ্ধা শিবিরের সাথে তাদের মেলামেশা তাদেরকে ইখওয়ানুল

মুসলিমিনের সাহিত্যের সাথে পরিচিত করে দিয়েছিল। আফগান জিহাদের শিবিরে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা যোদ্ধাদের এই সংযোগই মূলত আল-কায়েদার ভিত স্থাপন করেছিল।

পাকিস্তানের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তৎকালীন সোভিয়েত মুসলিম অঞ্চলগুলোতে নকশবন্দী সূফী আন্দোলনসমূহকে নিয়ন্ত্রণে আনা। এবং এই ছাত্ররা (তালেবুল ইলমরা) হিযবে ইসলামি আফগানিস্তান, জামায়াতে ইসলামি আফগানিস্তান ও হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামির মাধ্যমে মধ্যএশিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল। তাদের গুরুদায়িত্ব ছিল সূফীবাদের পাশাপাশি সেইসমস্ত সাধারণ মুসলিমকে তরবিয়াত দেওয়া, যারা সোভিয়েতের রাজনৈতিক দমন-নিপীড়ন থাকা সত্ত্বেও ইসলামি আমল করতো।

আফগান মুজাহিদ শিবিরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মধ্যএশীয় যুবকরা গোপনে কাজ করা সুফিদের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল এবং তাদেরকে মুসলিম মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের জন্য সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচিত করেছিল। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাহিত্যের সাথে সাথে কয়েক হাজার পবিত্র কুরআনের কপি মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোতে পাচার করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে তাজিকিস্তানে এবং পরে উজবেকিস্তান ও মধ্যএশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে যখন 'ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, তখন এই প্রচেষ্টা মধ্যএশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ কার্যকরী সাব্যস্ত হয়।

ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটি প্রক্সি অপারেশন হিসেবে, যা CIA সমর্থিত ছিল। একইসাথে সেখানে আফগান মুজাহিদিন ও পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠনগুলোর সহায়তায় সৌদি ও পাকস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো স্থায়ীভাবে স্থির হয়েছিল। কিন্তু চরমপন্থী ইসলামের বীজ বপনের সাথে সাথে অবস্থা বিগড়াতে লাগলো এবং বিষয়গুলো এই এজেন্সিগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করলো।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে এবং তা মধ্যএশিয়ার ইসলামি জিহাদি আন্দোলনকে আরও গতিময় করে তোলে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে আফগান জিহাদে অংশ নেওয়া উজবেক, তাজিক, তুর্কি এবং চেচেনরা আফগানে নিজেদের অঞ্চলগুলো স্বাধীন করার পরে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর দেশে ফিরে যায়। তখন মধ্যএশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকান প্রচার চালানো হয়েছিল, কিন্তু মুজাহিদরা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান করে সমগ্র মধ্যএশিয়া জুড়ে ইসলামি বিপ্লব প্রচারের লক্ষ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড ইসলামি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এই ইসলামি সংঠনগুলো আদর্শিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত ছিল। একইসাথে প্রাথমিকভাবে হিজবুত তাহরিরের সমর্থক ছিল। হিজবুত তাহরির একটি নিরস্ত্র ইসলামি বিপ্লবী সংগঠন, যা জিহাদি কর্মপদ্ধতির পরিবর্তে বিশাল সংখ্যক সেনা সমাগমের (Street Power) মাধ্যমে ইসলামি খিলাফাত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো। পরবর্তীতে সেই সংগঠনগুলো হিযবুত তাহরির বাদ দিয়ে সেটিরই এক বিচ্ছিন্ন দল - আকরামিয়ার সাথে জোট করে, যারা স্বশস্ত্র জিহাদে বিশ্বাসী ছিল। ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টির এক বিশাল সংখ্যক সদস্যও এরকম আন্ডারগ্রাউন্ড জিহাদি সংঠনগুলোতে যোগ দিয়েছিলেন।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে তাজিকিস্তানে গৃহযুদ্ধের সময় আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৯২ সালে আক্রমণ অতিশয় বৃদ্ধি পেলে ইসলামিক রেনেসাঁ পার্টি ও অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড ইসলামিক সেলগুলোর অনুগত বেশিরভাগ লোক আফগানিস্তানে চলে যায়। জামায়াতে ইসলামি আফগানিস্তানের কমান্ডার আহমাদ শাহ মাসউদ এই ইসলামি দলগুলোকে তার দলে নিয়ে এসেছিল এবং তাদেরকে উত্তর আফগানিস্তানে পুনরায় দলবদ্ধ করে সংযুক্ত তাজিক বিরোধী দলের (UKO - United Tajek Opposition) পতাকা তলে সংগঠিত করেছিল। হিযবে ইসলামি আফগানিস্তানের প্রধান গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ারের ভাগ্নি জামাই হুমায়ুন জারির এই স্বেচ্ছাসেবীদেরকে উত্তর আফগানিস্তান থেকে মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোতে বাহিনী করে পাঠাতে থাকে, যারা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এদিকে মধ্যএশীয় ইসলামি যোদ্ধাদের একপর্যায়ে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন দেখা দিল, যা আফগানিস্তানের আরব শিবির ব্যতীত কেউই দিতে প্রস্তুত ছিল না। উসামা বিন লাদেন আদর্শিক সম্পর্কের সঠিক ব্যবহার করলেন এবং তিনি উজবেক, চেচেন, চীনা (পূর্ব তুর্কিস্তানি) এবং তাজিকিস্তানি যোদ্ধাদের যে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন, তা দ্বারা এই আদর্শিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। ফলস্বরূপ, এসব দল অচিরেই আফগানিস্তানের পশতুন অধ্যুষিত তালেবান সরকারের অধীনে উত্তর আফগানিস্তান থেকে কাবুল এবং কান্দাহারে চলে এল।

আফগানিস্তানে আমেরিকার আক্রমণের পরে মধ্যএশীয় ভিনদেশীরা পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে চলে যায়। মজার বিষয় হচ্ছে, আফগানিস্তানে আমেরিকান আগ্রাসনের পর প্রাথমিক লড়াই ব্যতীত চেচেন,

উজবেক ও চীনা (পূর্ব তুর্কিস্তানি) বেশিরভাগ যোদ্ধাদেরকেই আফগান যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়নি। আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ প্ল্যানমাফিক তাদেরকে রিজার্ভ করে রেখে দেয়। এই যোদ্ধাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল - পরবর্তীতে তাদের ফারগানা উপত্যকায় [95] প্রেরণ করা এবং সেখান থেকে যুদ্ধকে পুরো অঞ্চলব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া।

95. ফারগানা উপত্যকার সীমানা মধ্যএশিয়ার প্রায় সমস্ত মুসলিম প্রজাতন্ত্র, পাশাপাশি চেচনিয়া এবং চীনা জিংজিয়ান প্রদেশ পর্যন্ত গিয়ে মিলে।

পাকিস্তানের গাযওয়ায়ে হিন্দের স্বপ্ন !

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে জামায়াতে ইসলামির 'আল-বদর' ক্যাম্পটি বখত জামিন খানের নেতৃত্বে আসে। তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কয়েক হাজার পাকিস্তানি স্বেচ্ছাসেবীর একটি নেটওয়ার্ক সংগঠিত করেছিলেন। তাদের প্রধান প্রধান ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো পাকিস্তানের 'পারাচিনার' শহরের নিকটবর্তী আফগান প্রদেশ পাকতিয়ায় সহ খোস্ত এবং নানগারহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমদিকে ISI কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশিক্ষণের জন্য 'আল-বদর' শিবির ব্যবহার করেছিল। সেটি তখন বৃহত্তম স্থানীয় কাশ্মীরি সংগঠন 'হিজবুল মুজাহিদিন আল-বদর' -এর আফগানিস্তান শিবির থেকেই উত্থিত হয়েছিল।

পাকিস্তান নিজে কোনো ইসলামি শাসন দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্র ছিল না ঠিকই। কিন্তু তারা ভারতের সাথে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের জের থেকে পুরো ভারতকেই দখল করার স্বপ্ন দেখতো। তারা মন করতো যে, এই স্বপ্নের সূচনা হবে কাশ্মীর দিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিন্দের যুদ্ধ (গাযওয়ায়ে হিন্দ) সংক্রান্ত হাদিস তাদের স্বপ্নে রঙ চড়িয়ে দিয়েছিল।

ISI-এর কৌশলবিদরা মনে করতো যে, গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য একটি মজবুত কাঠামোর দরকার, যা আরও শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আল-বদর শিবিরগুলো জামায়াতে ইসলামি কর্তৃক পরিচালিত ছিল, যার পুরুষ সদস্যরা মধ্যবিত্ত শহুরে পরিবেশ থেকে এসেছিল। তারা পড়াশোনা করেছিল সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা জিহাদের জযবা তো লালন করতো, কিন্তু তাদের সেই জযবা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। (সর্বোপরি পাঁচ বছরের বেশি নয়) আর তা তাদের পারিপার্শ্বিক শহুরে পরিবেশের প্রভাবের কারণেই, যা তাদের সত্তার অংশ ছিল।

ISI-এর গাযওয়ায়ে হিন্দ প্রকল্পের জন্য কেবল কাশ্মীরেই নয়, বরং গোটা ভারত এবং ভারতের প্রতিবেশি দেশগুলোতেও, যেমন নেপাল ও বাংলাদেশ, নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন ছিল। মধ্যবিত্ত উন্নয়নশীল কাঠামোর দিকে ঝোঁক রাখা লোকদের পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল সরল গ্রামীণ পরিবেশ থেকে আসা লোকদের। যেহেতু 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি' নেটওয়ার্কটি মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা দেওবন্দি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক পরিচালিত ছিল, তাই পাকিস্তানের ভার্সনের গাযওয়ায়ে হিন্দের অভিযানের জন্য সেটাকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করা হতো।

১৯৮০-এর দশকে মধ্যএশীয় অঞ্চলে এবং ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে পাকিস্তানের ISI প্রায় ঠিক এমন সময়ে যুদ্ধের প্রেক্ষাগৃহ খুলেছিল, যখন হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি এবং হিযবুল মুজাহিদিন সহ বিভিন্ন সদ্য সংগঠিত কাশ্মীরি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর সাথে লড়াই করেছিল।

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি আগে মধ্যএশিয়ায় প্রয়োগ করা সেই একই কৌশল ভারতেও প্রয়োগ করেছিল। বরং নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ভারত ছিল আরও সহজ জায়গা। প্রাথমিকভাবে কাদরিয়া সুফিবাদ ISI-এর কার্যক্রমের জন্য একটি কভার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সুফি আলেমদের একজন মোবারক আলি শাহ গিলানি সেই মোর্চায় ISI-কে সহযোগিতা করেছিলেন। সুফিদের সহায়তায় স্বল্পসময়ের মধ্যে ভারতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছিল, বিশেষত হায়দ্রাবাদে।

কাশ্মীরি যোদ্ধাদের যুদ্ধ লড়াই বৃদ্ধির সময়কালে ভারতীয় আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ককে খুব 'লো-প্রোফাইল' (গোপনীয়তা) রক্ষা করে চলতে বলা হয়েছিল। তাই ভারতে নেটওয়ার্কটি কেবল রিক্যুয়ারমেন্ট ফ্রন্টেই তার ক্রিয়াকলাপ জারি রেখেছিল। খুব অল্প সময়েই পাকিস্তানের 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' প্রজেক্টটি উত্তর প্রদেশেও পৌঁছে গেল, যেখানকার সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকরা এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৯৯০-এর দশকের শেষদিকে আলিগড় ইউনিভার্সিটি আন্ডারগ্রাউন্ড ইসলামি সংগঠনগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তবে ভারতে প্রকৃত জিহাদি তৎপরতা চালুর কোনো পরিকল্পনা তখনই নেওয়া হয়নি।

ইতোমধ্যে 'হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি' দেওবন্দি মাদ্রাসাগুলোর স্বতন্ত্র নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসেছিল। তবে সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কোনো পরিকল্পনা ও কার্যক্রম আপাতত ছিল না। বরং উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতের গাযওয়ায়ে হিন্দ প্রকল্পের বাস্তবায়নে ভারতে জিহাদি তৎপরতা শুরু হওয়ার পরে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম যোদ্ধাদের অবিচ্ছিন্ন সরবরাহের সুযোগ ও সুবিধা তৈরি করা। অবশ্য তাদের উপযুক্ত সময়ের সময়সীমাটি কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উত্থানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

জেনারেল জিয়াউল হকের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি তথা PPP-এর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার গঠনের পরে পাকিস্তানি সামরিক সদর দফতরে জেনারেল হামিদ গুলের মতো ইসলামপন্থী জেনারেলদের যুগের অবসান ঘটে।

ফলশ্রুতিতে 'গাযওয়ায়ে হিন্দ'-এর মতো দীর্ঘমেয়াদি এক জিহাদি সমরকৌশল তখন 'ভারত রক্তপাত' (Bleed India) প্রকল্পের ন্যায় খাঁটি প্রক্সি অপারেশনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি তখনও পাকিস্তানের অনুকূল নেটওয়ার্ক ছিল, তবে ১৯৯০-এর শেষদিকে পাকিস্তানি সংস্থাটি হঠাৎ করেই 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' প্রজেক্টটি বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তে তারা আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক 'বৃহত্তর পাকিস্তান' গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। এভাবেই সামরিক বিভাগের মধ্যএশীয় এই মডিউলটি ১৯৯০-এর দশকে বিলুপ্ত হয়েছিল।

এই সময়টি ছিল যখন জিহাদি সংগঠনগুলো ভিন্ন দিকে তাকাতে শুরু করেছিল, যদিও তা তখনও পাকিস্তানি সামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতা নিয়ে চলছিল। সেই সময়ের পাকিস্তানি সামরিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা লালিত যোদ্ধাদের জন্য আফগানিস্তানের জিহাদি দেওবন্দি তালেবানের শাসন ছিল মনোবল বৃদ্ধিকারী এক বিরাট বিষয়। তবে আল-কায়েদার মুজাহিদরাও পাকিস্তানের নব উত্থিত সমীকরণগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলছিল।

এরপর ৯/১১ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলি বিশ্বের ইতিহাস বদলে দিল। সেই সাথে বদলে দিল গোটা বিশ্বের জিহাদি মানসিকতাও। [96]

96. সেই ইতিহাসের কিয়দাংশই এই বই জুড়ে আলোচিত হয়েছে।

ফসল প্রস্তুত; কিন্তু...

১৯৯০-এর দশকে পাকিস্তানের ISI-এর সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী (এবং ভারত বিরোধী) কৌশল ২০০১ সালে যখন ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হয়েছিল, তখনও আঞ্চলিক কৌশলগত ফ্রন্টে কাঙ্ক্ষিত জাতীয় লক্ষ্য সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ততক্ষণে এত এত ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে, আল-কায়েদা সেই ফসল থেকে উপকৃত হয়ে চলছিল।

ইতোপূর্বে ফারগানা উপত্যকার হাজার হাজার উজবেক, তাজিক এবং তুর্কি বংশোদ্ভূত যোদ্ধা এবং চীনা প্রদেশ জিনজিয়াং ও চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের যোদ্ধারা তালেবান শাসনের অধীনে আফগানিস্তানে মিলিত হয়েছিল। মধ্যএশিয়া ও উত্তর ককেশাসের অধিবাসীদের তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে বিদ্রোহকে আরও বাড়ানোর জন্য সম্পদ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের খুব বেশিই প্রয়োজন ছিল। তালেবান তাদেরকে অভয়ারণ্য অঞ্চল দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাদের নিজস্ব বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সম্পদই ছিল না; অন্য অঞ্চলের বিদ্রোহীদের তহবিল করা তাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই ছিল।

ফলস্বরূপ, বেশ কিছু চেচেন, উজবেক এবং চীনা যোদ্ধা আফগানিস্তান ছেড়ে তুরস্কে বসতি স্থাপন করে। তুরস্কও তাদের আবাসন ও অর্থ সরবরাহ করে এবং তাদের সংগ্রামকে উৎসাহ দেয়, যদিও রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে কঠোর নজরদারিতেও রাখে। এই অবস্থাটি উজবেকিস্তানের ইসলামি আন্দোলনের জুমা নামানগানি ও তাহের ইয়ালদোচিভ এবং পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির (চীন) হাসান মাসুমের মতো কমান্ডারদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল, যারা তুরস্কে বসবাসরত তাদের কর্মীদের ওপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। তবে তাদের কাছে অর্থের বিকল্প অন্য কোনো উৎস ছিল না।

আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ এর সুযোগ নিলো এবং এই গ্রুপগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি করলো। তাঁরা তাদের অর্থ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিল। যদিও আল-কায়েদার সাথে এই গ্রুপগুলোর সাংগঠনিক সংযুক্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে এই গ্রুপগুলোর ওপর আল-কায়েদার আদর্শিক ও আর্থিক প্রভাবকে অস্বীকার করার মতো কোনো কারণও নেই।

এটি সেই সময়, যখন ISI কর্তৃক লালিত পাকিস্তানি জিহাদি সংগঠনগুলো ভারতের জন্য মারাত্মক হুমকিতে পরিণত হয়েছিল। একটি অনুমান অনুসারে, ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে আফগানের বিভিন্ন শিবিরে প্রায় ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) পাকিস্তানি ও কাশ্মীরি যোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং ৯/১১-এর সময় কমপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মুজাহিদ ভারতীয় কাশ্মীরে সক্রিয় ছিল। তাদেরকে পাকিস্তান থেকে চক্রাকারে পরিচালনা ও প্রেরণ করা হতো।

এই যোদ্ধারা প্রায় ৮,০০,০০০ (আট লাখ) ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে (ভারতীয় সেনা, পুলিশ, এবং প্যারা-মিলিটারি বাহিনী ইত্যাদি) কেবল ঝামেলাতে ফেলে দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি। বরং ১৯৯৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কারগিল অপারেশনের মতো সামরিক অভিযানের পক্ষে উৎসাহিত করে। যোদ্ধারা একটি ভারতীয় বিমান হাইজ্যাক করার সাহসও করে, যেটাকে তারা কান্দাহারে নিয়ে যায়। অতঃপর এর যাত্রীদের বিনিময়ে ভারতীয় কারাগারে বন্দী যোদ্ধাদের মুক্তও করে।

এই যোদ্ধারা ২০০২ সালের ডিসেম্বরে দিল্লির লাল দুর্গেও আক্রমণ করেছিল এবং ২০০১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সংসদে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনাও করেছিল। একই সাথে বাংলাদেশের ভারতপন্থী সংস্থাগুলোকে নিঃশেষ করতে ‘হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি’ সেখানে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে সেখানে ISI-এর জন্য পথ প্রশস্ত ও সাফ করা যায়। হরকাতুল জিহাদ ২০০০ সালে শেখ হাসিনা ও তার সমর্থকদেরকে হত্যার চেষ্টাও চালায়। এটি ভারতকে এতই চাপে ফেলে দেয় যে, ২০০১ সালে পাকিস্তানকে সমর্থনকারী জাতীয়তাবাদী জোট (BNP) বাংলাদেশি নির্বাচনে জয়লাভ করে।

২০০১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান কৌশলগতভাবে মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশে পরিণত হয়েছিল। তখন পাকিস্তান - ভারত ও ইরানের সাথে আমেরিকার চেয়েও ভাল দর কষাকষির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

কিন্তু ইতোমধ্যে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ এসে যায়। পুরো বিশ্ব বদলে যায়। বৈশ্বিক আবহাওয়া থমকে যায়। পাকিস্তানের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলোও নিঃশেষ হয়ে যায়।

আল-কায়েদা যুদ্ধ ছড়ায়?

৯/১১-এর পরে পাকিস্তানের আফগান পলিসিতে বিপরীত স্রোত তৈরি হয় এবং ২০০১ সালের শেষ নাগাদ দেশটি আমেরিকার বিমান ও স্থল হামলার সুবিধার্থে লজিস্টিক সহায়তা এবং বিমানবন্দর সরবরাহ শুরু করে। আফগানিস্তানে তালেবানেরকে বিতাড়িত করা হয় এবং আমেরিকার প্রবল চাপের মুখে পড়ে পাকিস্তান-ভিত্তিক সেই জিহাদি দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, যারা আফগান শিবিরগুলোতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল এবং রুশ বিরোধী জিহাদে অংশ নিয়েছিল। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সিনিয়র জিহাদি নেতাদের সাথে বৈঠক করেন এবং তাদের আশ্বাস দেন যে, আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে চলবে না। তাই তাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং পাকিস্তানের জিহাদবিরোধী কর্মকাণ্ডকে আপাতত সহ্য করে যেতে হবে।

এটা সবেমাত্র গোপন চুক্তি ছিল যে, আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সরে আসার সাথে সাথেই পাকিস্তান আবারও তার জিহাদি নীতিতে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু ৯/১১ ঘটানো আল-কায়েদা আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে এহেন বিধ্বংসী হামলার ব্যাপারে তীব্র সচেতন ছিলেন। তারা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও জিহাদি বিস্তারের মধ্যকার দূরত্বটি তখন আরও বিস্তৃত হবে, যখন আমেরিকার যুদ্ধকে সমর্থন করা ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনোই বিকল্প থাকবেনা।

আফগানিস্তানে জড়ো হওয়া হাজারো মুজাহিদ সম্যক অবগত ছিলেন যে, তখন (৯/১১-এর পর) তারা হত্যা, কারাগার কিংবা অত্যন্ত নিপীড়নের মুখোমুখি হতে পারেন। তাই তারা আল-কায়েদার সাথে যোগ দিতে পাকিস্তানি গোত্রীয় অঞ্চলে পাড়ি জমান। এর সাথে সাথেই যোদ্ধাদের পেছনে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ISI-এর পূর্ণ মেহনত (যা তারা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে যা প্রস্তুত করেছিল) আল-কায়েদার হাতে এসে গেল। এবং এর সাহায্যে আল-কায়েদা মধ্যএশিয়া থেকে আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানের সীমানা প্রসারিত করতে সক্ষম হয়।

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি

২০০৫ সালে, হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামির শক্তিশালী অপারেশনাল কমান্ডার মুহাম্মাদ ইলিয়াস কাশ্মীরি ISI-এর আটক থেকে তাঁর দ্বিতীয় মুক্তি পাওয়ার পরে নিশ্চিত হয়ে যান যে, আমেরিকান চাপ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে এই অঞ্চলে ৯/১১-এর পূর্বের ভূমিকায় ফিরে যাওয়ার ক্ষমতাকে অসম্ভব করে দিয়েছে। তাই তিনি কাশ্মীরে তাঁর সংগ্রাম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং আফগানিস্তানে লড়াইয়ে নেমে যান।

কাশ্মীরি ইতোপূর্বে ১৯৮০-এর দশকে সেখানে প্রথমবার প্রশিক্ষণ ও লড়াই করেছিলেন বলে আফগানিস্তানের সাথে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি এবার তাঁর পরিবারকে সাথে নিয়ে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাড়ি জমান। তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান তালেবানের পাশাপাশি লড়াই করা। কিন্তু তিনি আল-কায়েদার মতো আন্তর্জাতিক জিহাদি নেটওয়ার্কের সাথে ক্রমবর্ধমান সময় ব্যয় করার সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। তিনি কেবলই কাশ্মীর মুক্তির সংকীর্ণ প্রিজমের মধ্যে সাফল্যের কিছুই দেখতে পেলেন না। কাশ্মীর স্বাধীনতার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম একটি চালিকা শক্তি হিসেবে রয়ে গিয়েছিল বটে, তবে এটি বিশ্বব্যাপী ইসলামি যুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রশস্ত করতে সক্ষম হয়।

উত্তর ওয়াজিরিস্তানের একটি ছোট্ট শহর রাজমাক ইলিয়াস কাশ্মীরির নতুন আবাসস্থলে পরিণত হয় এবং সেখানেই তিনি তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কাশ্মীরি ছিলেন একজন ক্যারিশম্যাটিক কমান্ডার, যিনি পুরো ভারত জুড়ে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্ময়কর সব কর্মকান্ড করেছিলেন। জিহাদি সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর ছিল দুর্দান্ত সম্পর্ক।

ফলস্বরূপ, উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তাঁর উপস্থিতি কাশ্মীরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কয়েকশ যোদ্ধাকে আফগানিস্তানে নিয়ে আসে। এই যোদ্ধারা কাশ্মীরে তাদের সংগ্রাম ত্যাগ করে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে যায়।

২০০৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ইলিয়াস কাশ্মীরির প্রশিক্ষণ শিবিরটি সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়। এতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারগণ, লস্করে তইয়্যেবার মতো অভিজাত জিহাদি সংগঠনের প্রাক্তন কমান্ডারগণ ও রক্তাক্ত যোদ্ধা

নিয়ে গঠিত তাঁর নিজস্ব '৩১৩ ব্রিগেড' ও ছিল, যারা একটা সময়ে পাকিস্তানের ISI-এর দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন।

আল-কায়েদার নেতা মুস্তফা আবুল ইয়াজিদ, আবু ওয়ালিদ আনসারি এবং শাইখ ঈসার মতো প্রভাবশালী মতাদর্শীরা কাশ্মীরির নিকটবর্তী হন এবং তাঁর চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও কৌশলকে প্রভাবিত করেন। আল-কায়েদার এই নেতারা এর আগে ফজলুর রহমান খলিল (হরকাতুল মুজাহিদিন), মাসউদ আজহার (জইশে মুহাম্মাদ) এবং আবদুল্লাহ শাহ মাজহার সহ অনেক মুজাহিদ নেতাদের সাথে আলাপচারিতা করেছিলেন এবং আশঙ্কা করেছিলেন যে, এই পাকিস্তানি মুজাহিদ কমান্ডাররা ISI এর ইস্পাত ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। তাঁদের মূল্যায়ন ছিল - পাকিস্তানি মুজাহিদ কমান্ডাররা ISI কর্তৃক তাদের মনে আঁকা কৌশলগত বেড়ি ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার কথা কখনও ভাবতেও পারে না। তাঁরা আরও বুঝতে পারেন, স্থানীয় গোত্রীয় কমান্ডাররা গোত্রীয় ও পশতুন ঐতিহ্য দ্বারা আবদ্ধ একটি চিন্তাধারার শিকার। তারা আফগান বা পশতুন সীমানা ছাড়িয়ে চিন্তা করতে অক্ষম।

কিন্তু কাশ্মীরি আলাদা ছিলেন। তিনি এমন মেধার অধিকারী ছিলেন, যা স্বয়ংক্রিয় উদ্ভাবক ছিল। তিনি কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গে পাকিস্তানি কৌশলগুলোকে কঠোরভাবে মেনে চলেছিলেন। এতদসত্ত্বেও, তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কৌশলগত রূপ দেওয়ার জন্য মূল্যবান সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে তাঁর নিজস্ব অপারেশনাল পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। ভবিষ্যতের কৌশলগত বিকল্প হিসেবে। কাশ্মীরি মূলত একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি হাঁটু ঝাঁকুনির প্রতিক্রিয়া (অল্পতেই ভেঙ্গে পড়া) দেখাতেন না। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে থাকতো সুগভীর চিন্তা। আল-কায়েদার সাথে আলাপচারিতা তাঁর সুচিন্তিত প্ল্যানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আল-কায়েদাও বুঝতে পারে, কাশ্মীরি এবং তাঁরা আসলে একই লক্ষ্যে একই মেরুতেই চলছেন।

ইতোপূর্বে কোনো অনারব আল-কায়েদার এতটা নিকটবর্তী হওয়ার নজির পাওয়া যায়না, যতটা কাছে ঘেঁষেছিলেন কাশ্মীরি। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর ফিকিরগুলো আল-কায়েদাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, তাঁকে কোনো ধরনের দ্বিধা সংশয় ছাড়াই আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দের ভিতরের বৈঠকে নিয়ে নেওয়া হয়। ২০০৭-এর মধ্যে তিনি আল-কায়েদার মজলিশে শুরার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে যান।

২০০৭ সালের শেষদিকে কাশ্মীরি একটি বিস্তৃত যুদ্ধের পরিকল্পনা পেশ করেন, যা এমনকি আল-কায়েদাকেও অবাক করে দিয়েছিল। এতে যেন পূর্বের প্রতিশ্রুত 'শেষ জামানার' যুদ্ধ ময়দানের ল্যান্ডস্কেপ দেখানো হয়, যা আল-কায়েদার সেরা সামরিক মস্তিষ্ক কল্পনা তো করেছিল, কিন্তু বাস্তবায়নের কোনো উপায় তখনও দেখেনি। এই বিষয়ে কাশ্মীরি তাঁর নিজস্ব থিসিস উপস্থাপন করেন। দক্ষিণ এশিয়ায় আল-কায়েদা ও তালেবানের পরাজয়ের জন্য ন্যাটো, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে একটি কৌশলগত জোট হওয়া নিশ্চিত ছিল। ইলিয়াস কাশ্মীরি সেই যৌথ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

এই পরিকল্পনার মধ্যে ভারত ছিল প্রধান অংশ। এদিকে কাশ্মীরি ভারতে জিহাদি নেটওয়ার্ককে নতুন করে চাঙ্গা করা এবং আল-কায়েদার কৌশল ও আদর্শের সাথে মিলেমিশে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছিলেন। ISI কর্তৃক নির্মিত নেটওয়ার্কটি তখনও ভারতে মজুদ ছিল। তবে আফগানিস্তানে আমেরিকান আগ্রাসনের প্রতি পাকিস্তানের ওপর একাধিক চাপের ফলে এই নেটওয়ার্কটি অনেকটা একঘরে হয়ে পড়েছিল। কাশ্মীরি এই জিহাদি নেটওয়ার্ককে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রাগার ধ্বংসের মতো বিষয়গুলোতে পরিচালিত করার দিকে মনোযোগী ছিলেন। তিনি হিসেব করেছিলেন যে, এটি দুই দেশের মধ্যে এতটাই বিভেদ সৃষ্টি করবে যে, ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে উঠে পড়ে লেগে যাবে। এই কৌশলটি থেকে কাশ্মীরি তিনটি ফলাফল অর্জনের টার্গেট করেছিলেন -

১. মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ভারত, ন্যাটো এবং পাকিস্তানের মধ্যে কৌশলগত জোট ভেঙ্গে দেওয়া।

২. পাকিস্তান ও ভারতকে একটি সংঘর্ষে আটকে দেওয়া, যা পাকিস্তানকে অবিলম্বে পশ্চিম সীমান্ত (গোত্রীয় অঞ্চলগুলো) থেকে পূর্ব সীমান্তে (ভারতের কাছাকাছি) সেনাবাহিনী স্থানান্তর করতে বাধ্য করবে। তখন ন্যাটো সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে মুজাহিদরা মুক্ত ময়দান পাবে।

৩. যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের ওপর একটি অবরোধ আরোপ করবে, যা আরব সাগর থেকে স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানে আবদ্ধ ন্যাটোর সাপ্লাই লাইনের জন্য দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করবে।

ইলিয়াস কাশ্মীরি ভারতে স্থায়ী যুদ্ধের থিয়েটার তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যেমনটি ১৯৯০-এর দশকে পাকিস্তান কাশ্মীরে করেছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সন্ত্রাসী চক্রান্তের পরিকল্পিত প্যাটার্ন দিয়ে ভারতকে অস্থিতিশীল করা। তারপরে তিনি ভারতে পুরানো ISI নেটওয়ার্কগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে কয়েক মাস অতিবাহিত করেন এবং এই মিশনটি সম্পাদনের জন্য দ্বিগুণ শ্রম দেন।

ভারত ও বাংলাদেশে পুরোনো হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি নেতৃবৃন্দের সাথে কাশ্মীরির যোগাযোগ লিঙ্ক ছিল। তবে তা শুধু যোগাযোগের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদিকে তাদের শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ করতে আল-কায়েদার সহায়তার প্রয়োজন ছিল। এর আগে হরকাতুল জিহাদের নেটওয়ার্ক বেশিরভাগ দক্ষিণ ভারতে পরিচালিত ছিল। ইলিয়াস কাশ্মীরি পাকিস্তানি জিহাদি নেটওয়ার্কগুলোতে তাঁর লিঙ্কগুলো ব্যবহার করলেন এবং এদের গোপন সেলগুলোর সাথে যোগাযোগ করলেন।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ছিল SIMI-এর (The Students Islamic Movement of India) সাথে যোগাযোগ স্থাপন। এর আগে SIMI জামায়াতে ইসলামি ভারতের ছাত্র সংগঠন ছিল। পরবর্তীতে তারা মূল সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর SIMI উসামা বিন লাদেনকে একজন সত্য মুজাহিদ হিসেবে বিশ্বাস করতো। কাশ্মীরি ঘটনাগুলোর এই পালা-বদল সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই তিনি উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতে তাঁর প্রচার সম্প্রসারিত করার জন্য দ্রুত তাঁর লিঙ্কগুলোতে ট্যাপ করেন।

২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর মুম্বাই হামলা একটি সাবধানী কাশ্মীরি পরিকল্পনা ছিল, যা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। তারা খুব কৌশলে ISI-এর একটি ফরওয়ার্ড বিভাগ ছিল। তারা লস্করে তইয়্যেবাকে ব্যবহার করতো। ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের জন্য পরিকল্পনাটি নিখুঁত ছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন এই বিষয়ে বেশ সজাগ ছিল। এবং আমেরিকার সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে প্রকাশ্য শত্রুতা রোধ করে দিয়েছিল।

মুম্বাই ড্যামেজ যুদ্ধ শুরু করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে কাশ্মীরি একই সাথে দিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে এবং ভারতীয় পারমাণবিক স্থাপনাতে আক্রমণ করার প্রায় এক অভিন্ন কিন্তু অনেক বড় চক্রান্ত করেন। তবে শিকাগোতে লস্করে তইয়্যেবার ডেভিড হেডলি এবং কাশ্মীরের ভারতীয় সেলগুলোকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে আবারও যুদ্ধ রোধ করা হয়।

যে গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য ইলিয়াস কাশ্মীরি পুরো ভারতকে ময়দান বানিয়ে নিয়েছিলেন, তা তখনো তোলা ছিল। যেহেতু যুদ্ধের আগে সাধারণত যুদ্ধ ঢঙ্কা বাজানো হয়, সে হিসেবে প্রথমবারের মতো ইলিয়াস কাশ্মীরি আমাকে একটি চিঠি ই-মেইল করেন, যা যুদ্ধের ঘোষণার সমান ছিল। ই-মেইলটি ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-মন্ত্রীদের মধ্যে ডসিয়ার আকারে আলোচনার নথিভুক্ত করে।

কাশ্মীরি লিখেন,

“আমরা কাশ্মীরি মানুষদের তাদের স্ব-সিদ্ধান্তের অধিকার পেতে এবং ভারতকে কাশ্মীর, বিশেষত বন্ডিপুরে বর্বরতা করা, নারীদের ধর্ষণ করা, ও মুসলিম বন্দীদের সাথে অমানবিক আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলাম।

আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তাদের লোকদেরকে ২০১০ হকি বিশ্বকাপ, আইপিএল-IPL (ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগ) এবং কমনওয়েলথ গেমসে (সেই বছরের শেষের দিকে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত) না পাঠাতে। আর তাদের লোকেরা যেন ভারত ভ্রমণও না করে, নইলে তারা নিজ পরিণতির জন্য দায়ী থাকবে।

আমরা — ৩১৩ ব্রিগেডের মুজাহিদরা যতক্ষণ না ভারতীয় সেনা কাশ্মীর ছেড়ে কাশ্মীরিদের তাদের স্ব-সিদ্ধান্তের অধিকার না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো ভারত জুড়ে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছি।

আমরা উপমহাদেশের মুসলিমদের আশ্বাস দিয়েছি যে, গুজরাটে মুসলিমদের গণহত্যা এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে (১৯৯২ সালে হিন্দু জঙ্গিদের দ্বারা ধ্বংস হওয়া একটি মসজিদ) আমরা কখনোই ভুলবো না। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের ন্যায়। এবং আমরা সমস্ত অবিচার এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ নিবোই নিবো।

আমরা আবারও ভারত সরকারকে তার সমস্ত অবিচার ও জুলুমের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি। অন্যথায় তারা আমাদের পরবর্তী অভিযানটি দেখতে পাবে। ৩১৩-ব্রিগেড থেকে।” [97]

---

97. এশিয়া টাইমস অনলাইন, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১০ (ইংরেজি)

গণমাধ্যমের সাথে আলাপচারিতার কোনো ইতিহাস কাশ্মীরির ছিল না। তিনি ২০০৯ সালের ৯ই অক্টোবর, প্রথম আমাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। আর তা দিয়েছিলেন এই ঘোষণা করার জন্য যে, তখনও তিনি বেঁচে আছেন এবং CIA-এর প্রিডেটর ড্রোন হামলায় নিহত হননি। তাঁর মৃত্যু নিয়ে প্রচারিত সব রিপোর্ট সম্পূর্ণ ভুয়া।

২০১৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি যে ই-মেইলটি আমাকে প্রেরণ করেছিলেন, তা খুব সম্ভবত মিডিয়ায় তাঁর প্রথম বক্তব্য ছিল। এই ই-মেইলটি তখন প্রেরণ করা হয়, যখন কাশ্মীরি তাঁর 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' প্রকল্পটি চূড়ান্ত করেছিলেন।

কাশ্মীরির যুদ্ধ পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি ছিল মধ্যএশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোতে বিদ্রোহকে জাগিয়ে তোলা। এই রাষ্ট্রগুলো ছিল আফগানিস্তানে ন্যাটোর রসদ সরবরাহের বিকল্প রুট, যার মধ্য দিয়ে ন্যাটোর ১৫ শতাংশ রসদ উত্তর আফগানিস্তানে পৌঁছাতো। এটি তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ ছিল। কারণ সকল মধ্যএশিয়ানরাই ছিল জন্মগত যোদ্ধা, আফগান ও পাকিস্তানি গোত্রীয়দের চেয়েও অনেক বেশি যোদ্ধাবাজ। তবে তাদের কাছে আধুনিক যুদ্ধ কৌশল ও গেরিলা আক্রমণের সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল।

কাশ্মীরির অন্যতম বুনিয়াদি বিষয় ছিল - শত্রুর মন পড়ার ক্ষমতা। কাশ্মীরি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি মধ্যএশীয় ও চেচেনদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন (এর আগে তিনি আফগান গেরিলাদেরও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন) যে, কীভাবে সিকিউরিটি ইউনিফর্ম ও অন্যান্য বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ব্যবহার করে শত্রুদের লাইনে প্রবেশ করতে পারা যায়। এছাড়াও, ২০১০ সালের মার্চ মাসে চেচেন গেরিলাদের দ্বারা মস্কো ও দাগেস্তানে অত্যাধুনিক আক্রমণ ছিল কাশ্মীরির প্রশিক্ষণেরই ফলাফল।

কাশ্মীরি চেচেন, উজবেক, উইঘুর, তাজিক এবং তুর্কি যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। প্রথমে তাদের একত্রিতকরণের ধরন, প্রতিক্রিয়া, এবং আধুনিক সেনাবাহিনীর কৌশলগত তত্ত্বগুলোর সাথে পরিচিত করেন। ট্রেনিং প্রোগ্রামের দ্বিতীয় অংশটি ছিল আধুনিক গেরিলা যুদ্ধকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ। কৌশল সেগুলোই ছিল, যা তিনি প্রথমে কাশ্মীরে, আর এরপর আফগানিস্তানে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইলিয়াস কাশ্মীরি শত্রুর অন্তর পড়ার ও শত্রুদের দুর্বল পয়েন্ট থেকে গেরিলাদের গাইড করা বিদ্যায় একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এতদাসত্ত্বেও তিনি সর্বদা ট্রায়াল সন্ত্রাসী কৌশল (যেমন - সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ) ব্যবহার করতেন, যাতে সিকিউরিটি

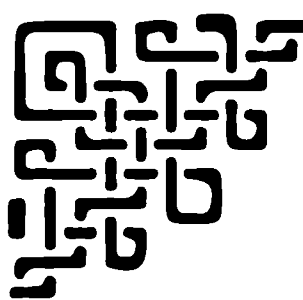
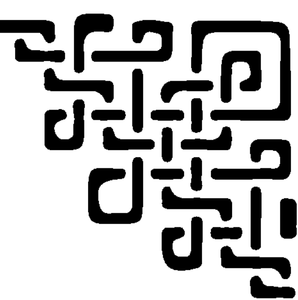
ফোর্সের পাল্টা আক্রমণের সময় ও সৈন্য সমাবেশ প্যাটার্নের পরিমাপ জানা যায়। তারপরে তিনি সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী মোকাবেলা করার পরিকল্পনা করতেন। পুরোপুরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে কাশ্মীরি মধ্যএশীয় ও চেচেন যোদ্ধাদের তুরস্কের মধ্য দিয়ে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার দিকনির্দেশনা দিতেন।

কাশ্মীরির যুদ্ধ পরিকল্পনায়ও যুদ্ধ মারকাযের ভূমি ছিল আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানি গোত্রীয় অঞ্চল, যতক্ষণ না ভারতীয় ও মধ্যএশীয় বিদ্রোহীরা তাদের নিজ অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহের আগুন ধরিয়ে দেয়। কাশ্মীরি বিশ্বাস করতেন যে, একবার এই অঞ্চলগুলোয় বিদ্রোহীরা গতি বাড়াতে পারলে, তা যুদ্ধকে হিন্দুকুশ পেরিয়ে মধ্যএশিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত করার সুযোগ দিবে। আরব সাগরের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে পদক্ষেপগুলো ময়দানকে ভারতে প্রসারিত করতে সহযোগিতা করবে।

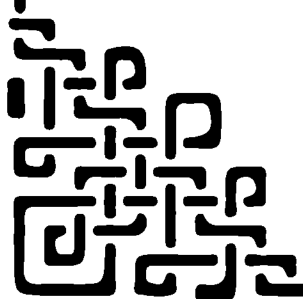
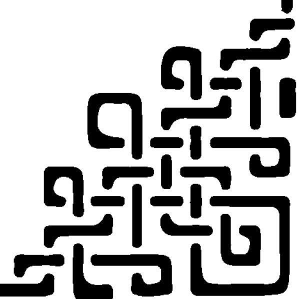
কাশ্মীরির পরিকল্পনা ও এর বিস্তারিত বিবরণ শুনে আইমান আজ-জাওয়াহিরি শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। আল-কায়েদা 'শেষ জামানার' যুদ্ধের জন্য যুদ্ধের ক্ষেত্রগুলো কার্যকর করার চেষ্টা তো করেছিল ঠিকই, কিন্তু ছবির শেষ আঁচরটুকু যেন বাকিই রয়ে গিয়েছিল। বৈশ্বিক আদর্শিক কর্মপদ্ধতির কৌশল অনুযায়ী পরিকল্পনা নির্ণয় কাশ্মীরির নিকট অর্পণ করা হয়। এবং কাজটি আরও সহজে আঞ্জাম দিতে কাশ্মীরির ভারতে সাহায্যকারী যোগাড় করা ছিল। তাই আল-কায়েদা কাশ্মীরিকে প্রথমে 'গাযওয়ায়ে হিন্দ' প্রকল্পটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে এবং তারপরে মধ্যএশীয় বিদ্রোহীদের সমন্বয় সাধন করার জন্য তাঁকে সামরিক কমিটির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়।

২০১০ সালে ভারতের পুনে শহরের বোমা বিস্ফোরণটি কাশ্মীরির নেতৃত্বে আল-কায়েদার ৩১৩-ব্রিগেড করেছিল। একটি ভিডিও বার্তায় ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি এই হামলার দায় ঘোষণা করার কথা ছিল, কিন্তু এগারো ঘন্টা পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, পুনে আক্রমণ যেহেতু ভারতীয় যুদ্ধ ময়দানে প্রবেশ করতে আল-কায়েদার অভিষেক হিসেবে পেশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না, তাই আল-কায়েদার চুপ থাকা উচিত। তারা অজানা একটি সংস্থা লস্করে তইয়্যেবা আল-আলামিকে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে এই হামলার দায় স্বীকার করার অনুমতি দেয়। এরপরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আল-কায়েদার পক্ষ থেকেই ভবিষ্যতের সমস্ত হামলার দায় স্বীকার করা হবে। যাতে ভারতীয় দখলকৃত কাশ্মীর, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে হামলার ধরন অনুসরণ করে ভারতের জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়করণ শুরু করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাভূত করা, মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশে যুদ্ধের একটি ময়দান নির্মাণ করতে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি, জামায়াতে ইসলামি, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সংযোগ স্থাপন করা, ইসলামি মাদ্রাসাগুলো এবং সুফি নেটওয়ার্কগুলোর লিঙ্ক ব্যবহার করা - সব মিলিয়ে ত্রিশ বছর আগে এমনই ছিল পাকিস্তনা গোয়েন্দা সংস্থা ISI-এর পরিকল্পনা। আফগানিস্তানে এবং একইসাথে ভারতে কাশ্মীরিদের স্ব-সংকল্পের অধিকার অর্জন করা ছিল উদ্দেশ্য। ত্রিশ বছর পরে আল-কায়েদা যেন সেই পরিকল্পনাটিকেই নিজ আদর্শিক রঙে রাঙ্গিয়ে নতুনভাবে সংশোধন করে নিয়েছিল, যাতে তাদের সেনাবাহিনী কালো পতাকা ধরে পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশের আগে বিজয়ের জন্য খোরাসান ও গাযওয়ায়ে হিন্দের বৃহত্তর যুদ্ধের প্রেক্ষাগৃহ (ময়দান) প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়।

উপসংহার

ডেভিড কোলম্যান হেডলি, যার প্রকৃত নাম দাউদ সাইয়্যেদ, তার এবং তাহাভুর হুসেইন রানার বিরুদ্ধে আমেরিকার ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ২রা অক্টোবর ২০০৯-এ কোপেনহেগেনের একটি পত্রিকার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে। হেডলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের হামলার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে Jyllands-Posten পত্রিকা অফিস এবং একটি নিকটস্থ সিনাগগ ঘুরে দেখার জন্য ডেনমার্ক ভ্রমণ করার অভিযোগ আনা হয়। ২০০৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর, FBI অতিরিক্তভাবে হেডলিকে মুম্বাই অ্যাট্যাকে বোমা হামলার ষড়যন্ত্র করা ও পাকিস্তানি ইসলামপন্থী জিহাদি দল লস্করে তইয়্যেবাকে মালামাল সহায়তা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করে। এছাড়া ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলায় আমেরিকান নাগরিকদের হত্যাকাণ্ডে সহায়তাও অভিযুক্ত করে।

হেডলি ২০১০ সালের ১৮ই মার্চ সকল অভিযোগের দায় স্বীকার করেন। ফলত তিনি কারাগারে যাবজ্জীবন দন্ডিত হওয়া অবস্থায় ৩ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার জরিমানারও মুখোমুখি হন।

হেডলি ও রানার গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার ঘটনায় আরও জটিলতার সৃষ্টি করে। আমেরিকান গোয়েন্দারা বিশ্বাস করতো যে, এই অ্যাটাকটি আল-কায়েদার সাথে সংযুক্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি প্রক্সি বাহিনী লস্করে তইয়্যেবা কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। আসলে, হেডলি ছিল লস্করে তইয়্যেবাতে আল-কায়েদার সিঁধেল চোর, যার মাধ্যমে আল-কায়েদা ISI-এর ব্লুপ্রিন্টগুলো হাইজ্যাক করেছিল এবং তাদের আঞ্চলিক কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে ব্যবহার করেছিল। তবে হেডলির বক্তব্য যত বেশি প্রকাশ হয়েছে পরিস্থিতি ততই জটিল হয়ে উঠেছে। হেডলি তার জিজ্ঞাসাবাদীদের বলেছিলেন যে, ISI তাকে আড়াই মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি দিয়েছে এবং মুম্বাই হামলা পরিচালনার জন্য সকল প্রকার লজিস্টিক সহায়তা দিয়েছে। ইতোমধ্যে মুম্বাই অ্যাট্যাকে একমাত্র বেঁচে যাওয়া হামলাকারী আজমল কাসাব ISI কর্তৃক প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন।

২০০৩ সালের ২রা ডিসেম্বর এশিয়া টাইমস অনলাইন-এ প্রকাশিত 'আল-কায়েদা কীভাবে কাশ্মীরি বিদ্রোহকে ইন্ধন দেওয়ার জন্য ISI ও লস্করে তইয়্যেবার পরিকল্পনাকে হাইজ্যাক করেছিল' শিরোনামের রিপোর্টে আমি এইসব ঘটনা নথিভুক্ত করেছিলাম। এও লিখেছিলাম যে, এই হামলার পেছনে ISI-এর ফরোয়ার্ড সেকশনের হাত ছিল। কিন্তু তারা তো একটি স্বাভাবিক প্রোফাইলের প্রক্সি অপারেশন করার পরিকল্পনা করেছিল, যা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই একে অপরের বিরুদ্ধে নিয়মিত করে থাকে। কিন্তু আল-কায়েদা নিজস্ব নেটওয়ার্কের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হামলায় রূপান্তরিত করে দেয়, যা পাকিস্তান ও ভারতকে একটি যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। এমন একটি যুদ্ধ, যা আমেরিকার সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে এড়ানো হয়েছিল।

এটি আল-কায়েদার অপারেশনের ধরনের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা গোটা বিশ্ব আফগানিস্তান, ইরাক এবং পাকিস্তানে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। তবে এর উদ্দেশ্য বেশিরভাগ লোকই বুঝতে পারতো না। হেডলি এবং রানা উভয়ই ইলিয়াস কাশ্মীরি, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হারুণ এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর আবদুল রহমানকে ভারত অভিযানের জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করার পরেও ভারতীয় সংস্থা ও আমেরিকান কাউন্টার টেরোরিজম বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও মুম্বাই হত্যাকাণ্ডের পেছনে লস্করে তইয়্যেবার জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ অব্যাহত রেখেছিল। এমনকি এক পর্যায়ে তারা এও ভেবেছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং আল-কায়েদা একসাথে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছে!

২০১০ সালে, যখন আমি পূর্বে সংঘটিত ঘটনাগুলোর দিকে নজর দিলাম, তখন আমি যেন নিশ্চিত হলাম যে, ৯/১১ ঘটনার জনকেরা নিশ্চয়ই আরব্য রজনীর গল্পের গভীর ও আগ্রহী পাঠক ছিলেন। তিনিও ৯/১১-এর পর একটি বিস্তৃত দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, আফগানিস্তানে এই এই আমেরিকান আগ্রাসন হবে, অতঃপর সেটিই হলো। আর তা আল-কায়েদার নেটওয়ার্ককে ধ্বংস দিল। ফলস্বরূপ, পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চল আল-কায়েদার সদস্যদের একটি গণ হিজরত ভূমি হলো। সেখান থেকে একটি নতুন সিরিজ ইভেন্ট চালু হলো, যেটি ৯/১১-থেকে শুরু হয়ে এবং নতুন পরিসরে এমনই অমর আরেক গল্পের জন্ম দিল, যা মধ্যএশিয়া থেকে ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র চলতে থাকলো; ঠিক যেন কেউ আরব্য রজনীর অবিশ্বাস্য গল্পগুলোর পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখছে!

আল-কায়েদার আরব্য রজনী হলো ঘটনাপ্রবাহের এমন একটি সংগ্রহ, যার প্রতিটি নতুন কাহিনী ৯/১১-এর পরে দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধ থিয়েটারে নতুন চরিত্রের সাথে পরিচিত করে তোলে। এটি এমন এক মুহুর্তে উপস্থাপিত হয়েছে, যখন আল-কায়েদার পশ্চিমবিরোধী যুদ্ধের নতুন পর্ব সবে শুরু হয়েছে। ২০০২ সালে যখন আমেরিকা আল-কায়েদার নিষ্ক্রিয়তার ও ধ্বংসের ব্যাপারে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিল, ঠিক তখনই তাদের নতুন প্রজন্মের চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে - যেমন ইলিয়াস কাশ্মীরির ৩১৩ ব্রিগেড - যারা আল-কায়েদার এজেন্ডায় বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর ছিল, যা উত্তর আফ্রিকা থেকে পুরোপুরি বিস্তৃত।

আল-কায়েদা ৯/১১ আক্রমণের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল। এটি পশ্চিম এবং পশ্চিমাপন্থী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের একটি জিহাদি সংগঠন তৈরি করতে সফল হয়েছিল। আমেরিকান আধিপত্যের আইকনগুলোতে আক্রমণ করে — নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনের পেন্টাগন — আল-কায়েদা আমেরিকার ‘কাউ বয়’ (নিয়ন্ত্রক) মানসিকতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় এবং ক্ষমতার অহংকারের বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষোভ জাগাতে সফল হয়, যা আমেরিকাকে আফগানিস্তানের জলাবদ্ধতায় আটকে দেয়। আমেরিকা আফগানিস্তানে একদম নিখরচায় প্রবেশ করে। তারা ভেবেছিল যে, ইতোমধ্যে তারা আল-কায়েদাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর তাদের সেই ঘোষণা দেওয়া ভুলও ছিল না। কেননা বেশ কয়েকজন শীর্ষ তালেবানি নেতা পাকিস্তানে লুকিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যম পর্যায়ের নেতৃবৃন্দেকে, হয় শহীদ করা হয়েছিল, নয়তো গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তালেবানের পদাতিক সৈন্যরা আফগান সমাজের গোত্রীয় তাঁত শিল্পে মিশে যায়। ২০০২-এর মধ্যেই পরিপূর্ণরূপে মুজাহিদদের প্রতিরোধ ক্ষমতার মৃত্যু ঘটেছিল। আমেরিকা আফগানিস্তানে তাদের বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে দেয় এবং গণতান্ত্রিক সিস্টেমের পুনরুদ্ধার পথ হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানে আমেরিকান ও ন্যাটো বাহিনীর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার জন্য ২০০১ সালে Bonn Agreement এর মাধ্যমে একটি রোডম্যাপও ঘোষণা করে দেয়।

আমেরিকার পক্ষে আফগানিস্তানে সেসব তো ছিল খেলার সমাপ্তি। কিন্তু আল-কায়েদার জন্য তা ছিল কেবল এক নতুন গল্পের সূচনা। আমেরিকা আর তার মিত্রদের দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকার অর্থ তারা আফগানিস্তানে আটকা পড়বে এবং আল-কায়েদা যে জাল ফেলেছিল, তাতে তাদের রক্তক্ষরণ করার জন্য একটি যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

আর ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরিই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পরবর্তী মারহালার সকল অপারেশনের কাঠামো তৈরি করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে আল-কায়েদার ক্যাডারদের পুনরুদ্ধার করা, নতুন কৌশল প্রণয়ন ও পাকিস্তানে নতুন ঘাঁটি তৈরি করা ইত্যাদি।

ডা. জাওয়াহিরি কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিশরীয় ইসলামি জিহাদের শেষ আমির। তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের শাসনের বিরুদ্ধে দেশে অভ্যুত্থান শুরু করার লক্ষ্যে মিশরের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে দীর্ঘ নিয়োগ প্রসেসের পরিকল্পনাকারী ছিলেন। মিশরী হুকুমত এই চক্রান্তের বিষয়ে টের পেয়ে যায় এবং একটি সফল পাল্টা অভ্যুত্থান চালায়, যেখানে বেশ কিছু লোককে ঘিরে ফেলা হয়। তবে আজ-জাওয়াহিরি এই সংগঠনটি বিভিন্ন সেলের মাধ্যমে পরিচালিত অবিরাম পরিকল্পনা নিয়ে সজ্জিত করেছিলেন, যাতে ইসলামি জিহাদ যেকোনো আঘাতের মোকাবেলা করতে পারে। এইভাবে মিশরীয় সরকার এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সেই অভ্যুত্থানকে সফলভাবে মোকাবেলা করেছিল, কিন্তু সে সময়েই 'মিশরীয় ইসলামি জিহাদ' আনোয়ার সাদাতকে মিশরীয় সেনা অফিসার খালিদ ইস্তাম্বুলির হাতে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিচক্ষণ ও কৌশলী আজ-জাওয়াহিরি আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ এবং আল-কায়েদার ওপর এর প্রভাবের একটি নিখুঁত চিত্র এঁকেছিলেন। ৯/১১-এর যুগে আমরা দেখতে পাই যে, আজ-জাওয়াহিরি আফগানিস্তানে একই কৌশল প্রয়োগ করেন, যা তিনি এর আগে মিশরে প্রয়োগ করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করা, এবং সমান্তরাল কমান্ড কাঠামোযুক্ত বিভিন্ন সেল তৈরি করা। যাতে সিকিউরিটি ফোর্স দ্বারা যদি একটি সেল আক্রান্ত হয়, তবে অন্য সেলটি তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হয়ে যেতে পারে। আল-কায়েদা আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে আসার পর এই সংগঠনে যোগদানকারী গোত্রীয় অধিবাসীদের ক্ষেত্রে 'পরিকল্পিত রিপ্লেসমেন্ট' নকশা অনুসরণ করেছিল। ডা. আজ-জাওয়াহিরি আল-কায়েদার কয়েক শতাধিক কর্মী, যারা আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে চলে এসেছিল, তাদের জন্য সরাসরি এছাড়া আর কোনো কাজ দেখেননি যে, তারা স্থানীয় যোদ্ধাদের থেকে আল-কায়েদার লক্ষ্য এবং আদর্শে উজ্জীবিত একদল নতুন জেনারেশনের যোদ্ধা তৈরি করবে। আর এটিই ছিল পুরো কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু, যার ভিত্তিতে অনিয়মিত প্রতিরোধ পশ্চিমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় প্রতিরোধে পরিণত হয়ে যায়। আর এটি হলো আল-কায়েদার যুদ্ধের মূল অস্ত্র।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আল-কায়েদা এই যুদ্ধের জন্য কীভাবে কাঠামোবদ্ধ হয়েছিল! তারা যদি কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কমান্ড সিস্টেমের কাঠামো তৈরি করতো এবং স্ট্যান্ডার্ড অস্ত্র ব্যবহার করতো, তাহলে তো তারা ২০০২ সালের মাঝামাঝি সময়েই যুদ্ধ হেরে যেত। আফগানিস্তানে আমেরিকান আগ্রাসনের পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এই বিষয়টিই প্রমাণিত করে; বিশেষত যখন আল-কায়েদা সবকিছু পরিত্যাগ করেছিল। সেই সময় তো আমেরিকা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা আল-কায়েদার পিঠ ভেঙে দিয়েছে। অথচ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অদম্য প্রতিশ্রুতি থেকে এক নতুন কৌশল গঠনের শক্তিশালী ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

আজ-জাওয়াহিরির মতো আল-কায়েদা নেতারা কয়েক বছর ধরে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে কাজ করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন। এই মানুষগুলো রাষ্ট্রের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সাথে আন্ডারগ্রাউন্ড সংস্থাগুলোর দ্বন্দ্ব ও এর পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি ভালোভাবেই জানতেন যে, এই ধরনের পরীক্ষামূলক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ নিতে হবে এবং কীভাবে নতুন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সংস্থান তৈরি করা যায়। আল-কায়েদা তাদের কৌশল এমনভাবে তৈরি করেছিল যে, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আমেরিকান আগ্রাসনের সময় তাদের দল, কর্মী এবং নেতৃত্ব পর্দার আড়ালে চলে যায়। এবং আল-কায়েদার মতাদর্শের সদস্য নতুন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তা ২০০৩ অবধি অব্যাহত ছিল। এছাড়াও নতুন কৌশলগত ছিল আরও বিভিন্ন দিক।

ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরির মতো অভিজ্ঞ অন্যান্য নেতারা তাদের শত্রুর চিন্তাভাবনার অভিমুখ অনুধাবন এবং বহু-স্তরযুক্ত পাল্টা পদক্ষেপ প্রস্তুত করতে সক্ষম ছিলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুনরায় কামব্যাক করতে আল-কায়েদা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল, তা হলো সাংগঠনিক লিডার ও অনুগামীদের স্তর নির্ণয় করে প্রথমে শত্রুদের মন বোঝার দিকে মনোনিবেশ করা; দ্বিতীয়ত শত্রুর আসবাব, অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নেওয়া; এবং তৃতীয়ত, শত্রুদের সম্পদ ও আসবাব নষ্ট করার জন্য যুদ্ধকে আরও প্রশস্ত করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে প্রসারিত করা।

এই সবকিছুরই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল, সহজলভ্য শত্রু হিসেবে আমেরিকার মর্যাদা হ্রাস ও তাকে সহজ শিকারে পরিণত করা।

এই অনুসারে আল-কায়েদার নেতৃত্ব তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয় —

• উসামা বিন লাদেনকে প্রতীকী ও ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যিনি সারা বিশ্বের মুজাহিদগণ থেকে আর্থিক অনুদানের কারণে সমর্থিত ছিলেন এবং তরুণ ইসলামপন্থীদের আমেরিকান বিরোধী যুদ্ধে যোগ দিতে আকৃষ্ট করেছিলেন।

• স্বপ্নদ্রষ্টা আজ-জাওয়াহিরি আল-কায়েদার মতাদর্শকে কেন্দ্র করে সকল মুজাহিদ গ্রুপগুলোকে একটি আদর্শিক পতাকাতলে একত্রিত করার পাশাপাশি যুদ্ধের বিভিন্ন পরামিতি স্থাপনের জন্য নিজেকে প্রধান কৌশলবিদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

• বেশ কয়েকজন (পরিবর্তনশীল) অপারেশনাল প্রধান ছিলেন, যারা মুসলিম ভূমিগুলোতে পাশ্চাত্যের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ডা. আজ-জাওয়াহিরির আদর্শিক যুদ্ধের প্রতি অনুগত হয়ে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে অপারেশনাল পদ্ধতি প্রণয়ন করেছিলেন।

জনসাধারণকে ব্যবহারের জন্য উসামা বিন লাদেন নেতা তো ছিলেন, কিন্তু পুরো খেলার মূল ডিরেকশন আসতো ডা. আজ-জাওয়াহিরির কাছ থেকেই, যিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাকে বিশুদ্ধ নিয়তের বাছাই করা কয়েকজন লোকের মধ্যে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারাই কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ এশীয় যুদ্ধ ময়দানে অবিচল যোদ্ধা তৈরি করেছিলেন।

এরপর তাদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। এই জাতীয় প্রতিটি দল থেকেই একজনকে অপারেশনাল ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করা হতো। এবং সে শহীদ হলে বা বন্দী হলে অটোমেটিক অন্য একজন তার পজিশনে নিযুক্ত হতো। ক্রমপরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আল-কায়েদার পর্যাপ্ত সময় বা স্থান থাকতো না যে, নতুন স্ট্র্যাটেজির জন্য তারা নিয়মিত বৈঠক করবেন এবং দৈনিক তাদের নির্দেশগুলো পৌঁছে দিবেন। প্রতিটি গ্রুপকেই নিজস্বভাবে ইভেন্টসমূহ গঠনের জন্য নিজেদের প্রতি আস্থা রাখতে হতো। এবং তা হতো বৈশ্বিক যুদ্ধে আল-কায়েদার বিস্তৃত কৌশলের আওতায় থেকে, এর বাহিরে না গিয়ে।

কাজের অভ্যাস দাঁড় করাতে গিয়ে আল-কায়েদা বহু স্তরযুক্ত পরিকল্পনায় আচ্ছাদিত ছিল। সেই পরিকল্পনাগুলো যেন বাস্তবে আরব্য রজনীর গল্পগুলোর মঞ্চ স্থাপন করেছিল, যার কাহিনীর চরিত্রগুলো একে একে সামনে আসে এবং প্রতিটি গল্প শেষ হওয়ার

সাথে সাথে এর চরিত্রগুলো পটভূমিতে ম্লান হয়ে যায়। তবে গল্পগুলো আপন গতিতে অসাধারণ চরিত্রগুলোর ভিন্ন আরেকটি কাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়।

ব্যর্থতার কিনারে কিনারে বহু স্তর এবং ভাঁজ থাকার কারণে শত্রুর প্রতিটি হামলার প্রভাবকে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এবং অভিনেতাদের অনবরত অভিনয় নতুন করে মঞ্চায়িত হয়েছে। হয়ে চলেছে।

অন্য কথায়, যেখানে একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হতো, সেখান থেকেই তাৎক্ষণিকভাবে নতুন আরেকটি দল অন্য পরিকল্পনা নিয়ে সেটিকে রিপ্লেস করতো। এই আরব্য রজনী আজও মূল স্ক্রিপ্ট অনুসারে চলছে, হোক তা শত্রুদের বিরুদ্ধে আল-কায়েদার অ্যাকশন গ্রহণ, শত্রুর রিঅ্যাকশন কিংবা হোক আল-কায়েদার বিরুদ্ধে শত্রুর অ্যাকশন গ্রহণ ও আল-কায়েদার রিঅ্যাকশন।

যে ব্যক্তি ৯/১১-এর হামলার জন্য উসামা বিন লাদেন এবং ডা. আজ-জাওয়াহিরির কল্পনাশক্তিকে পরিচালিত করেছিল, তিনি হলেন কুয়েতে বেড়ে ওঠা বালোচী (বালুচিস্তানের অধিবাসী) খালিদ শাইখ মুহাম্মাদ। ২০০৩ সালে তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনিই এমন পরিস্থিতি সামনে এনেছিলেন যে, আমেরিকা সম্পূর্ণ সহজ বিজয় অর্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস করে আফগানিস্তানে তার দীর্ঘমেয়াদী থাকার কৌশল বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছে।

খালিদ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ৯/১১-এর একটি ধাক্কাই আমেরিকাকে আফগান জালে টেনে আনবে, এবং সেখান থেকে আতিথেয়তাশূন্য আফগান অঞ্চল আস্তে আস্তে কিন্তু অবশ্যই আমেরিকান বস্তুগত সম্পদকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে ফেলবে, যেখান থেকে তারা কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। তার এই দৃঢ়বিশ্বাসও ছিল যে, কসাই আমেরিকা শুরুতে আল-কায়েদার মানবসম্পদকে নির্দয়ভাবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে। কিন্তু আল-কায়েদার আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শক্তি নতুনভাবে যুদ্ধের জন্য দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিমদের থেকে এক নতুন প্রজন্ম প্রস্তুত করতে সক্ষম হবে। সে কারণেই পাকিস্তানি ও আফগান দরিদ্র গোত্রীয় অঞ্চলগুলোকে আল-কায়েদা যুদ্ধের প্রাথমিক থিয়েটার হিসেবে বেছে নেয়। এছাড়াও, পাকিস্তান তখন ইসলামি সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হকের অধীনে অধ্যুষিত একটি দেশ ছিল, যিনি ইতোমধ্যে তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক অগ্রগতির সাধারণ প্যাটার্ন থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিলেন।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে পাকিস্তানের সামরিক বিভাগ ভারতীয় কাশ্মীরে বিদ্রোহ ঘটাতে পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে জিহাদি সংগঠন গঠনের জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। এই প্রভাব মধ্যএশিয়া থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যা যোদ্ধাদের আরও একটি প্রজন্মকে উত্থিত করে। আফগানিস্তানে তালেবান শাসন তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং পাকিস্তানের জিহাদি মাদ্রাসাগুলোর নেটওয়ার্ক অল্প কয়েক বছরে তাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। আল-কায়েদা আত্মপ্রত্যয়ী ছিল যে, তারা এই সম্পদগুলো সফলভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যবহার করবে এবং তারপরে মধ্যএশিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত যুদ্ধের প্রেক্ষাগৃহকে প্রসারিত করতে এই বৃহত্তর নেটওয়ার্ককে নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হবে।

এই বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, তাদের এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকা আল-কায়েদাকে বার বার পরাজিত করতে পারে এবং মুজাহিদদের এক প্রজন্মকে হত্যা করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুজাহিদদের অন্য এক প্রজন্মের উত্থান হয়ে যাবে। আর তা এভাবেই চালমান থাকবে, যতক্ষণ না আমেরিকান যুদ্ধযন্ত্র চূড়ান্তভাবে অচল হয়ে পড়বে। এদিকে আল-কায়েদা আফগানিস্তানে তাদের শক্তি অর্জন করতে থাকবে, এভাবেই হয়তো একপর্যায়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য প্রতিশ্রুত মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। (অথবা তার আগেই) মুসলিম মুজাহিদ দল দক্ষিণ এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যাত্রা শুরু করবে এবং ইসরায়েলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে গ্লোবাল খিলাফাতের সূচনা করবে। আল-কায়েদার এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটি এই অঞ্চলে ইতোপূর্বে অন্য কারও মধ্যে দেখা যায়নি, যা বিশেষ এক যুদ্ধের জন্য তাদের কার্যক্রম, অস্ত্র, লোকবল এবং আদর্শের সীমানা প্রসারিত করতে সহায়তা করেছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরে যোদ্ধাদের একটি নতুন শাখা তৈরি হয়েছিল। যদিও তা স্থানীয় এবং প্রথমত তালেবানের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আল-কায়েদার নেতৃত্বেই ছিল। তাদেরকে অনেকে 'স্থানীয় তালেবান' (তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান) বলে। তবে তারা আল-কায়েদার সাংগঠনিক কাঠামোর অংশ না হওয়ায় আমি বরং তাদেরকে 'নিউ-তালেবান' বা আল-কায়েদার 'আপন ভাই' বলবো। তারা প্রচলিত আফগান তালেবানের মতো নয়, যারা বেশিরভাগ দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানে থাকে এবং পশতুন ঐতিহ্য ধারণ করে। বরং এই নিউ-তালেবান ফেডারেল-শাসিত গোত্রীয় অঞ্চলে থাকে। এখন এই নিউ-তালেবানকে দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়।

এই তালেবান আফগান-পাকিস্তান সীমান্তের উভয় পাশেই বাস করে। তারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী এবং কঠোরভাবে বৈপ্লবিক ইসলামের ওপর আমল করে। প্রচলিত তালেবান এবং নিউ-তালেবান উভয়ই আফগানিস্তানে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। তবে প্রচলিত তালেবানের যুদ্ধ আফগানিস্তানে শুরু হয়ে সেখানে ইসলামি ইমারাহ গঠনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেলেও নিউ-তালেবানের যুদ্ধ মধ্য ও দক্ষিণ-এশিয়া থেকে শুরু হয়ে বৈশ্বিক খিলাফাতের উত্থানের আগ পর্যন্ত চলবে। এই নিউ-তালেবান, যারা আফগানিস্তানে আমেরিকান আক্রমণ, আমেরিকান বোমা হামলা এবং পাকিস্তানি সরকার দ্বারা জিহাদি সংগঠনগুলোর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তারা দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তান থেকে করাচি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরা তো ছিল তারা, যারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানি গোত্রীয় অঞ্চলে মোচা তৈরির জন্য আল-কায়েদাকে সাহায্য করেছিল, আফগান তালেবানের জন্য আফগানিস্তানের ৭৪ শতাংশ এলাকা দখল করার উপযোগী বানিয়েছিল। আর পাকিস্তান এবং ভারতে যুদ্ধ প্রসারিত করতে সহায়তা করেছিল। আল-কায়েদার জন্য ইয়েমেন ও সোমালিয়ায় নতুন সদর খোলার সুযোগ করে দিয়েছিল।

৯/১১-এর পরের খেলাটা পরিপূর্ণভাবে আল-কায়েদার পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিল। আফগানিস্তানে কাল্পনিক জয়ে আক্রান্ত আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাকের ওপর হামলা করলো। যাই হোক, ইরাকের ওপর আমেরিকার হামলা আল-কায়েদার জন্য একটি বোনাস পয়েন্ট ছিল। তারা তো আফগানিস্তানের জন্য এক ফাঁদের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আমেরিকা নিজে নিজেই দুটি ভিন্ন ফাঁদে ফেঁসে গিয়েছিল। শিয়াবিরোধী দলের প্রধান নেতা আবু মুসআব আয-যারকাভী আগের থেকেই ইরাকে ছিলেন। ডা. আজ-জাওয়াহিরি তাঁকে ইরাকের মধ্যে আল-কায়েদার একজন সদস্য বানালেন। এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে এই পর্যন্ত বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন যে, ইরাকের ময়দান আমেরিকার যুদ্ধের জন্য স্থায়ী হয়ে যায়। অতপর হিংস্রতার যে তরঙ্গ উঠলো, তাতে ইরাকে শাসন করা অসম্ভব হয়ে গেল।

যাই হোক, এটা তো কেবল দৃষ্টি ফেরানোর কৌশল ছিল মাত্র। মূল রণাঙ্গন তখনও আফগানিস্তানই ছিল, কেননা ইরাকের প্রতিরোধযুদ্ধে আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আল-কায়েদা প্রতিরোধযোদ্ধাদের ইরাকের ইমারাতে ইসলামিয়ার পতাকাতলে জমা করার প্রচেষ্টা করলো। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এই কারণে যে, ইরাকে দু ডজনেরও বেশি প্রতিবাদী গ্রুপ সক্রিয় ছিল। সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে সংযুক্ত ছিল। তারা মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি ব্রাদারহুড অব ইউরোপের দ্বারা পরিচালিত হতো। ইরাকে ইখওয়ানের শাখা 'হিজবুল ইসলামি আল ইরাকি' ইতোমধ্যে পার্লামেন্টে ছিল, ইরাকের স্বরাষ্ট্রপতি সহ বেশ কয়েকটি মূল পদে তারা ছিল। আমেরিকার সাথে এই গ্রুপের সুসম্পর্ক ছিল। আমেরিকা এ গ্রুপের সাথে উন্নয়নের ব্যাপারেও আলাপ-আলোচনা করতো। ঐ গ্রুপগুলোর সাথে আমেরিকার কাজ করা খুব বেশি কঠিন ছিল না। কিন্তু তারা আল-কায়েদার যোদ্ধাদের ইরাকে বরদাশত করতো না। এমনকি ইরাকের স্থানীয় প্রতিবাদী গ্রুপ আল-কায়েদার সাথে কঠিন বিরোধিতা করতো। এজন্য আল-কায়েদা আমেরিকাকে আফগান জলাশয়ে ফাঁসানোর জন্যই বেশি মনোযোগ জারি রেখেছিল।

ইরাক প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ছিল, ইরাকের অঞ্চলগুলো থেকে আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের মাধ্যমে মুক্ত করা। এই ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আল-কায়েদা ইরাকে একাই থেকে যায়, আর তাই ২০০৭-২০০৮ সালে আল-কায়েদার মনোযোগ আফগানিস্তানে ফিরে এল। এবং প্রতিরোধযুদ্ধকে স্থানীয় প্রতিবাদী যোদ্ধাদের জন্য ছেড়ে এল।

আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে আল-কায়েদা বিশেষ মাহারাত এবং যোগ্যতা লাভ করেছিল। ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত তাদের দৃষ্টি পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলগুলোর দিকে রেখে বিভিন্ন গ্রুপকে নিজেদের সাথে নিয়ে সংগঠন পুনর্গঠন কাজ শুরু করলো। ২০০৬ সালে তালেবানের কেন্দ্রস্থল দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্তানে আমেরিকান ও ন্যাটো সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের গেম-প্ল্যান ছিল। আমি ২০০৬ সালের নভেম্বরে হেলমান্দে গিয়ে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জেলা পরিদর্শন করেছি। সেখানে তালেবানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, আর ন্যাটো সেনাদের অস্তিত্ব ছিল ছিটেফোঁটা। রাজধানী লস্করগাহ এবং আরও কয়েকটি জায়গায় ন্যাটোর ব্রিটিশ সেনারা কেবল তাদের ঘাঁটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তালেবানের সফল প্রত্যাবর্তন আমেরিকাকে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। এরপর ওয়াশিংটন তালেবানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য এবং আল-কায়েদার কাঠামোকে নির্মূল করার জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করা শুরু করলো। ফলাফল এই হলো যে, ২০০৭ সালে আল-কায়েদা পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এবং খাইবার পাখতুনখোয়ার সোয়াত উপত্যকায় স্থানান্তরিত হলো। গোত্রীয় অঞ্চল থেকে শহুরে অঞ্চলে যুদ্ধকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের উদারপন্থী তালেবানের সাথে আপোষের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা। অবশ্য ইরাকে তারা এই

জাতীয় কৌশলের সুযোগ পায়নি। এই কারণে আল-কায়েদা ইরাকের আরব বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করাকেই পছন্দ করেছিল। তবে দক্ষিণ-এশিয়ায় রণাঙ্গন বানানোও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। পাশাপাশি আল-কায়েদার কয়েকশ আরব যারা আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং প্রথা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তারা নিজেদের বৈপ্লবিক চেতনাকে স্থানীয় গোত্রীয়দের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

যদিও মোস্তফা আবু ইয়াজিদ এবং আবু ওয়ালিদ আনসারীর মতো শীর্ষস্থানীয় আদর্শিক চিন্তাবিদ আমেরিকান ড্রোন হামলায় শহীদ হয়েছিলেন, কিন্তু ডা. আজ-জাওয়াহিরির মতো সুচিন্তক কিছু আরবও ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দীর্ঘকাল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, এবং কয়েক বছর আফগান জিহাদে কাটিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন, ঐ এলাকাগুলোতে কীভাবে নিজেদের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হয়। তাঁরা স্থানীয় কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেননি, তবে যারা আল-কায়েদা শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল তাদের এবং আফগান জিহাদে তাদের সহযোগী যুবকদের নিয়মিত এবং দৃঢ়ভাবে উদ্বুদ্ধ রাখতেন। সমস্যা ছিল এটা যে, পশ্চিমা বিশ্লেষকরা আল-কায়েদা এবং তাদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বোঝার কোনো চেষ্টাই করেনি। তারা বেশিরভাগ সময়ই আল-কায়েদা অনুপ্রাণিত ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে বা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন — যেমনটা ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার ঘটনার বেলায় হয়েছে।

ইরাক এবং আফগানিস্তানে চলমান আমেরিকার যুদ্ধ করদাতাদাদের কোটি কোটি ডলার নষ্ট করছিল। এবং সময়ে সময়ে অস্থির রূপ ধারণ করছিল। প্রতি বছর আমেরিকা ভাবে যে আল-কায়েদার নতুন কৌশল আবিষ্কার করছে। এই ভেবে আমেরিকাও পাল্টা কৌশল করে। তখন আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ পশ্চিমা জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদের পথ পাল্টে ফেলেন। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুরু করার আগেই আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা নিজেদের প্রস্তুতিপর্বের কাজ সেরে রেখেছিল। তারা কয়েক দশক ধরে ইসলামি প্রতিরোধ যুদ্ধের ওপর গবেষণা করেছিল। আলজেরিয়ায় ফরাসিদের দখল এবং ১৮৩০ সালে খ্যাতমান আবদুল কাদিরের প্রতিরোধ যুদ্ধ নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করেছিল। আলজেরিয়া ফরাসিদের প্রতিরোধ করা সহজ ছিল না। কেননা ফরাসিরা দেশের এক তৃতীয়াংশ দখল করে রাজধানীর দরজায় পর্যন্ত কড়া নাড়ছিল।

মিশরে ব্রিটিশদের আধিপত্য, ককেশাসে রাশিয়ানদের আধিপত্য এবং হিন্দুস্তানে ব্রিটিশদের আধিপত্যের চিত্র অনেকটা একই ছিল। আর এসব আধিপত্যের ফলশ্রুতিতে

মুসলিমরা বিপ্লবের মৌলিক দিক বিবেচনায় ‘শুদ্ধি আন্দোলন’ এবং ‘আযাদি আন্দোলন’ ইত্যাদির সুরতে ভয়াবহ প্রতিরোধ করতে হয়েছে। আফগানিস্তান এবং পরবর্তীতে ইরাকে আমেরিকার হামলা ইতোপূর্বের মুজাহিদদের জ্ঞানে ছিল। এজন্য আফগানিস্তান এবং ইরাকে যথাক্রমে তালেবান এবং সাদ্দাম হুসাইনের দ্রুত পরাজয়ের পর আমেরিকান বাহিনীর সমর্থনে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের হাতে খুব দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল।

আফগানিস্তানে ৬০-১০০ জন সম্মিলিত প্রাদেশিক পুনরুদ্ধার বাহিনী লোক দেখানোর মানসে শহুরে অঞ্চলগুলোতে মোতায়েন করা হলো। কিন্তু তারা কেবল স্থানীয় প্রকল্পগুলোতে সীমাবদ্ধ সুরক্ষা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে ইরাকে — বাগদাদ এবং অন্যান্য যুদ্ধাহত শহরগুলোতে আমেরিকান বাহিনী শহরাঞ্চল থেকে সরে এসে নিজেদের সশস্ত্র শিবিরগুলিতে সজ্জিত করলো এবং শহরে তাদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ করলো। আমেরিকা স্থানীয় জনগণের কাছে এই ধারণাটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল যে, তারা বিদেশি দখলদার বাহিনীর অধীনে নয় বরং একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের অধীনে বাস করছে। আফগানিস্তানে সাড়ে তিন বছর এবং ইরাকে মাত্র এক বছর পরেই এ আমেরিকান কৌশলটি ব্যর্থ হয়ে গেল। আর এ দুই দেশেই বিদেশি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব এবং হিন্দুস্তান সহ বিশ্ব সম্প্রদায় আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে এক অনন্য বিরোধ হিসেবে দেখেছিল। যেখানে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো যোদ্ধাগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র, তাও পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, আফগানিস্তানে দ্বিতীয়বার বপন করা সেই যুদ্ধ কেবলই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর একটি জোটের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং বাস্তবতা হলো এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের সোভিয়েত ইউনিয়নে ২০ বছরের দীর্ঘ গোপন-যুদ্ধের পরে কাঁচা যোদ্ধারা আদর্শের দ্বন্দ্ব বুঝতে পেরেছিল।

আফগানিস্তান হলো বৈশ্বিক বহু নাট্যেরই মঞ্চ, যাতে ৯/১১-এর ঘটনাটাও শামিল। যাই হোক, মূল নাটক ঐ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া যার কল্যাণে আল-কায়েদা এক সাধারণ আন্দোলন থেকে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলনে তাদের অবস্থানকে উন্নীত করেছিল। যেই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে প্রতিষ্ঠিত ধারার বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করার মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংসের নিকটবর্তী করে তাদের উপায়-উপকরণ ও যুদ্ধসরঞ্জাম ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০০৯ সালের শুরুর দিকে পাকিস্তান যোদ্ধারা খাইবার পাখতুনখোয়ার বড় একটি অংশ দখল করে নিল। নাগরিক প্রশাসনের পুরো পুলিশ বাহিনী পরাজিত হলো। এবং সেনাবাহিনীর সেনারাও সরে যেতে লাগলো। এটা ছিল ঐ সময়, যখন আল-কায়েদা এই ইচ্ছা করেছিল যে, যদি পাকিস্তান সেনাদের অস্ত্রাগার দখল করা যায়, তাহলে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানে যোদ্ধাদের হাতে যুদ্ধ নির্ধারিত হবে। পরে নতুন সেনাপ্রধান আশফাক পারভেজ কায়ানী এই বিপদ উপলব্ধি করে যোদ্ধাদের বিপক্ষে পূর্ণ শক্তি প্রদর্শন করায় যোদ্ধাদেরকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য করলো।

নিঃসন্দেহে এটা একটি অস্থায়ী পরিকল্পনা ছিল। কেননা পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং সৌদি আরব আল-কায়েদাকে কেবল একটি সাধারণ উপদ্রব মনে করেছিল। তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা সামরিকভাবে যে ব্যবস্থাপনাই চিন্তা করেছিল, তা ঐ নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই করেছিল। তারা স্রেফ বিরোধ দমন করার জন্য সাধারণ কাজ করে গেল। তবে সত্যতা হলো এই যে, আল-কায়েদাকে যেন কেবল আরব্য রজনীর গল্প এবং তাতে উপস্থিত চরিত্র, কারিশমা, আদর্শবাদ এবং বাস্তবতার নিরিখেই বোঝা যায়।

আজ (২০১১) উসামা বিন লাদেন নেপথ্যে আছেন। ডা. আইমান আল জাওয়াহেরি অদৃশ্য আছেন। মুস্তফা আবু ইয়াজিদ এবং আবু ওয়ালিদের মতো আল-কায়েদার বহু নেতা ড্রোন হামলায় শহীদ হয়েছেন। খালিদ শাইখ মুহাম্মাদ এবং আবু জুবায়দা বেশ কয়েকজন কী অপারেটর গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে, আল-কায়েদার আরব্য রজনীর গল্পগুলোর কাহিনী নতুন কৌশল এবং নতুন চরিত্র নিয়ে অব্যাহত আছে।

আল-কায়েদার পক্ষ থেকে এটা পশ্চিমাদের জন্য একটি ফাঁদ, যে ফাঁদে পরে পশ্চিমারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকবে। আর সেসময় আল-কায়েদা তালেবানকে দিয়ে আফগানিস্তানে বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে দিবে। এরপর আল-কায়েদার লক্ষ্য হলো, প্রাচীন খুরাসানের প্রতিশ্রুত ভূমি দখল করা, যার সীমানা মধ্যএশিয়া থেকে খাইবার পাখতুনখোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপরে ভারতে যুদ্ধের ময়দানকে প্রসারিত করা। এবং এরপরে রণাঙ্গনকে ভারত পর্যন্ত প্রসারিত করা।[98]

---

98. ভারতীয় উপমহাদেশে Al-Qaeda in Indian Subcontinent (AQIS) গঠনের মাধ্যমে আল-কায়েদা ইতোমধ্যেই তা সম্পন্ন করেছে।

এরপর প্রতিশ্রুত মাহদী মসীহ মধ্যপ্রাচ্যে প্রকাশ পাবেন। আল-কায়েদা নিজেদের সৈন্যদের খোরাসান থেকে বের করে ফিলিস্তিন মুক্ত করবে। এখানের শেষ যুদ্ধের পরেই বিশ্বব্যাপী ইসলামি খিলাফাত কায়েম হবে। [99]

---

99. আল-কায়েদার খিলাফাত কায়েমের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আগে ইমাম মাহদি আসার ব্যাপার একটি প্রসিদ্ধ মিথ। আদতে আল-কায়েদার আকিদাহ অনুসারে, বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী-দখলদারদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত থাকলে খিলাফাতের ঘোষণা দেওয়া হবে। এর জন্য ইমাম মাহদি আসাকে আল-কায়েদা শর্ত করে না। ডা. আইমান আজ-জাওয়াহিরি তাঁর 'ইসলামি বসন্ত' রিসালায় এই ব্যাপারে বলেন,

"খিলাফাত প্রতিষ্ঠায় আমরা কোন পন্থা অবলম্বন করবো? এর জন্য পন্থা হলো -

প্রথমত, ইমারাতে ইসলাম আফগানিস্তানকে এবং ককেশাসের ইমারাহকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল স্থানে জিহাদরত মুজাহিদদের সমর্থন ও সাহায্য করা। বড় শত্রু এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় হোতাদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে পুরো উম্মাহকে এক করার চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত, যখনই পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে, তখন মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন স্থানে ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া।

চতুর্থত, এরপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে -

১। এখন কি খিলাফাত ঘোষণার সময় হয়েছে এবং তার সকল উপাদান কি প্রস্তুত রয়েছে?

২। এরপর যখন উম্মাহর অধিকাংশ মুজাহিদ, ন্যায়নিষ্ঠ দাঈ এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিমগণ (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) একমত হবেন যে, এখন খিলাফাহ ঘোষণার সময় হয়েছে, তখন একটি প্রশ্নের সমাধানের মাধ্যমে পরামর্শ চূড়ান্ত হবে। আর তা হলো, "কে খলিফাহ হবেন?"

উম্মাহর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেম ও চিন্তানায়কগণ যার ব্যাপারে একমত হবেন যে, "অমুকই খলিফাহ হওয়ার উপযুক্ত।" তাঁকেই খিলাফাতের বাইয়াত দেওয়া হবে।" [ইসলামি বসন্ত, পর্ব ৫]